শিকারের বিচিত্র কাহিনী



শিকারের বিচিত্র কাহিনী

শিকারের বিচিত্র কাহিনী

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম দে'জ সংস্করণ :
—আষাঢ়, ১৩৮৭
—জুলাই, ১৯৮০

তৃতীয় সংস্করণ :
—শ্রাবণ, ১৩৯৫
—আগষ্ট, ১৯৮৮

SIKARER BICHITRA KAHINI Rs. 20
By
DEBIPRASAD BANDOPADHAYA
Dey's Publishing,
13 Bankim Chatterjee Street,
Calcutta-700073

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :
পঞ্চানন জানা
জানা প্রিন্টিং কনসার্ন
৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা ৭০০০১২

দাম : ২০ টাকা

শ্রদ্ধার্ঘ্য

পরম আরাধ্য—পিতৃদেব

যশস্বী শিল্পী

৺ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে

আমাদের প্রকাশিত

এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

বাক্‌লার জঙ্গলে

সুন্দরবনের আতঙ্ক

ডোরাকাটার খোঁজে

বাঘ ও বাঘিনী

সূচীপত্র

ভেডেন-ব্লকের খুনী

ভেডেন-ব্লকটি হ'ল উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। পূর্বে সিংহাসন পর্বত। সেই বিশাল পর্বতমালা বলাঙ্গীর জেলার উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে উঠে সম্বলপুরের বিস্তীর্ণ মালভূমির উপর দিয়ে বারো-পাহাড়ের পাদদেশে নেমে এসেছে। বারো-পাহাড়ের কোলে উড়িষ্যার সুবিখ্যাত হীরা-কুদড্যাম্প। এই বিশাল পর্বতমালার উচ্চতা প্রায় ৬,০০০ ফুট। অরণ্য-সঙ্কুল দুর্গম সিংহাসন-পর্বতের দক্ষিণে প্রবাহিত এই রাজ্যের সবথেকে বড় নদী—'মহানদী'। এই পর্বত-মালা যতই চমৎকার হোক না কেন স্বাস্থ্যাবাস হিসাবে মোটেই গণ্য নয়—প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া তার অন্যতম কারণ। এই পর্বতের ছোট ছোট উপত্যকাতে বস্তী ও গ্রামগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছে। জীবনধারণের জন্য চাষের জমিগুলো যথেষ্ট উর্বর হওয়া সত্বেও এর নিজস্ব কোন আকর্ষণ নেই। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের যেমন সু-বন্দোবস্ত নেই, তেমনি নেই বন্য জীব-জন্তুর হাত থেকে ফসল রক্ষা করা। বিশেষ করে হাতির উৎপাতে কোন চাষী পুরো ফসল ঘরে তুলতে পারে না—তার অর্দ্ধেক খোয়াতে হয়। এমন অনেক জমি পড়ে রয়েছে যেখানে হাতির উপদ্রবে চাষ করা আদৌ সম্ভব হয়নি।

ওপারে সিংহাসন-পর্বত আর এপারে ভেডেন-ব্লকের মাঝখানে শীতের শীর্ণ মহানদী অবিরাম ব'য়ে চলেছে কটক আর ভুবনেশ্বরের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে! ভেডেন্-ব্লকের কাছে মহানদীর সবথেকে চওড়া জায়গাটার দৈর্ঘ্যতা প্রায় এক মাইলের মত। বিস্তীর্ণ বালুকাময় চরে প্রকাণ্ড পাথরগুলো মাথা তুলে রয়েছে—কোনটা বিশাল কোনটা অপেক্ষাকৃত ছোট। বড় বড় মসৃণ কালো পাথরের শ্লেট্গুলো কোন্ অনাদিকাল থেকে মহানদীর গর্ভে মাথা তুলে রয়েছে তার কোন ইতিবৃত্ত নেই। বর্ষার প্রচণ্ড স্রোত যেমন ক্ষুরধারা তেমনি মসৃণ। কত ঝড়-ঝাপ্টা, কত উত্তাল ঢেউ তার উপর দিয়ে ব'য়ে গেছে, প্রকৃতির অদৃশ্য হাতের কত সুখ-দুঃখের কাহিনী তা'তে লেখা রয়েছে, লেখা রয়েছে কতভাঙ্গা-গড়ার মর্মকথা—কে তার হিসাব রাখে! ঢেউ আর ঝঞ্ঝার দাপটে পাথরগুলো কি বিচিত্র রূপ ধারণ করে,—কোথাও শিবের জটা, কোথাও সহস্র নাগ বাসুকী, আবার কোথাও বিদ্রোহের তির্য্যক ভঙ্গিমা।

সেইসব রুক্ষ পাথরের চতুর্দিকে গজিয়ে উঠেছে আগাছার ঝোপ জঙ্গল। সাপ আর বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের আবাস। আমি যখন ভেডেন্-ব্লকের খুনীর সন্ধানে এলাম তখন মহানদীর স্রোত সিকি মাইলের মত। পারাপারের জন্য উড়িষ্যার নিজস্ব ঢঙের তৈরী লম্বা ডোঙ্গার ব্যবস্থা ছিল। পারানী মাত্র চার আনা, স্পেশাল এক টাকা (গুটে টঙ্কা মাত্র)। নদীর ওপারে সিণ্ডোল থানা। বলাঙ্গীর জেলার সীমানা এখান থেকে পত্রপালী, দেও-ঝরণ, খরাপুরা হয়ে সিংহাসন পর্বতে চলে গেছে। নদীর এপারে সম্বলপুরের ভেডেন্-ব্লক, আবার ওপারে লারা-সারা, ধমা, তব্‌লাই পার হয়ে সিংহাসন পর্বতে শেষ হয়েছে। সম্বলপুর ও বলাঙ্গীরের সীমানা চিহ্নিত-করণের কাজ তখনও শেষ হয়নি, জরীপের কাজের জন্য তখনও লারা-সারায় ক্যাম্প ছিল।

প্রকৃতির বুকে কয়েকটা আঁচড় কেটে জেলার সীমানা নির্ধারিত হল, কিন্তু সিংহাসন পর্বতের গভীরে যারা যুগ-যুগ ধরে বসবাস করতো, তারা কিন্তু রইলো বহাল্ তবিয়তে। মানচিত্রের কয়েকটা রেখা বা শালের কয়েকটা খুঁটি তাদের অবাধ বিচরণ নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল। কেমন করে হ'ল এবং তার পরিণাম কি দাঁড়াল – তাই নিয়েই এই কাহিনী।

অক্টোবরের মাঝামাঝি একদিন রাতের অন্ধকারে যেমন নির্বিকারে সীমানা উপেক্ষা করে চাপ্-চাপ ঘনকুয়াশা, সিংহাসন-পর্বত থেকে নেমে এসে মহানদীর দীর্ঘ এক মাইল চরের উপর দিয়ে সম্বলপুরের ভেডেন্-ব্লককে আচ্ছন্ন করেছিল; তেমনি বলাঙ্গীরের সীমানা লঙ্ঘন করে, এমন কি সিণ্ডোল থানার পুলিশ-শাসন পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে এক মদমত্ত খুনী হাতি সম্বলপুরের সীমানায় অবৈধ প্রবেশ করে কুয়াশার যোগসাজসে যে অঘটন ঘটিয়েছিল,—তার তুলনা নেই।

ভেডেন্-ব্লকের মানুষ সে রাতে খুব তাড়াতাড়ি ঘরের দুয়ার বন্ধ করে কাঁথার আড়াল নিয়েছিল। ভেডেন্-ব্লকের মানুষ তখনও জানতো না, কি অশুভ তাদের মাথার উপর নেমে আসছে। ঘন কুয়াশায় ভেডেন্-ব্লকের নদী সংলগ্ন গ্রাম দুটি কামপাটি আর গনটুরুম ঢাকা পড়ে গেল। নিঝুম, নিস্তব্ধ রাত শীতের দীর্ঘ অলস সীসের মত ভারি মুহূর্তগুলো বৈচিত্র্যহীনতায় নিঃশব্দে শুধু ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছিল।

গনটুরুম থেকে কামপাটি গ্রামের দূরত্ব দুই মাইলের মত, থানা সেই ভেডেন্-আঠারো মাইল দূরে। এই আঠারো মাইল পথটায় কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই, আমি পায়ে হেঁটে যখন এই পথটা পার হচ্ছিলাম—তখন পথে একটাও চায়ের দোকান দেখতে পাইনি। সম্বলপুরের সাব-ডিভিসন টাউন 'বড়গড়' থেকে মাত্র একখানা বাস ভেডেন্ থানা পর্যন্ত যাতায়াত করে, বর্ষাকালে তাও আবার

বন্ধ—খুবই অনুন্নত এলাকা।

এ-হেন ভেডেন্-ব্লক সেদিন উত্তেজনায় ফেটে পড়লো, যখন ঘন কুয়াশার আবরণ ভেদ করে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। নিস্তরঙ্গ—গতানুগতিক জীবনের কি নির্মম ছন্দপতন। তখনও সূর্যোদয় হয়নি, কোথাও এতটুকু সাড়া শব্দ নেই, শুধু মহানদীর চড়ায় সরীসৃপের অস্পষ্ট খস্‌খস্ শব্দ আর কালো জলের অস্ফুট ক্ষুব্ধ আলোড়ন। মাঝে মাঝে বুনো হাঁসের গভীর ডাক সে নিস্তব্ধতা ব্যাহত করছিল। গ্রামের কুকুরগুলো কোথায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল কে জানে।

এমন সময় সিংহাসন-পর্বতের পিছনের আকাশটা রক্তিমাভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ভোরের সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালটা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হচ্ছিল। ধীরে ধীরে জেগে উঠলো ভেডেন্-ব্লকের অন্যান্য গ্রামের সঙ্গে কামপাটির ছোট্ট গ্রামখানি। কামপাটির তিনজন যুবক সেই আলো-আঁধারিতে এল মহানদীর চড়ায়। তখনও কুয়াশার জাল ঝুলে রয়েছে ঘরের চালে, পথে-ঘাটে আর ধানের ক্ষেতগুলোর উপর। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে এসেছিল ওরা তিনজন। উন্মুক্ত ধান-ক্ষেতের উপর ভেসে থাকা কুয়াশা তখন ফিকে হতে আরম্ভ করেছে, সরে আসছিল মন্থর-পায়ে নদীর নির্জন চড়ায়। এমন সময় ওদের একজন হঠাৎ আবিষ্কার করলো কুয়াশার রঙে রঙ মিলিয়ে এক প্রকাণ্ড হাতি একেবারে ওদের নাকের ডগায় এসে পড়েছে। মহা আতঙ্কে 'হাতি' বলে চিৎকার করে দু'পাশের দুই সঙ্গী ছিট্‌কে পড়লো। তারপর পড়ি-কি-মরি করে নদীর উঁচু পাড়ের দিকে প্রাণপণে দৌড় দিল—আর উত্তেজনায়, ভয়ে চিৎকার করতে লাগলো। এই আকস্মিকতায় হাতিটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। তৃতীয় সঙ্গী অর্থাৎ মাঝের যুবকটি পালাবার আর পথ পেল না। অত্যধিক ভয়ে অভিভূতের মত উঠে দাঁড়াতেই ক্রুদ্ধ হাতিটা লম্বা শুঁড় বাড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে ওকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর ধোপা যেভাবে কাপড় আছড়ায়, তেমনি সজোরে একটা আছাড় দিতেই বেচারার অর্ধেক জীবন বেরিয়ে গেল। হাতি কিন্তু এত অল্পেই তাকে রেহাই দিল না। ক্ষণে ক্ষণে তার ক্রোধের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। বলাঙ্গীরে আরও দুটো খুনের কথা হয়তো তখন মনে পড়ে থাকবে। যুবকটিকে নিষ্পেষিত করবার জন্য তার যা করণীয়, তা করবার জন্য এবার এগিয়ে গেল। সামনের প্রকাণ্ড একখানা পা সরাসরি তুলে দিল তার বুকের উপর। পাঁজরাগুলো ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার সময় হয়তো কান পেতে ক্ষীণ মরণ আর্তনাদ শুনে সে খুশী হ'ল। তারপর দ্বিতীয় পা-টা নামিয়ে আনলো মাথার উপর। এর বোধহয়

প্রয়োজন ছিল না—তবু শত্রুর শেষ রাখতে নেই। খুলিটা ভেঙ্গে মাটিতে পুঁতে যেতেই তার কর্তব্য শেষ হ'ল। তখন উল্লাসে হাস্যকর ক্ষুদে ল্যাজটা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে চললো হত্যার আনন্দে মহানদী পার হওয়ার জন্য।

হতভম্ব আর হতবুদ্ধি হয়ে সঙ্গীরা সেই ভয়াবহ নৃশংস-কাণ্ড দেখলো, তারপর পরিত্রাহী চিৎকার করতে করতে ছুটলো গ্রামের পথে। তারপরের ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়লো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ভেডেন্-ব্লকের সব মানুষ এসে জড় হ'ল মহানদীর ধারে। কান্না আর উত্তেজনায় ভেডেনের আকাশ থম্‌থম্ করতে লাগলো। থানা-পুলিশ হ'ল, রিপোর্ট লেখা হ'ল কিন্তু খুনীর পিছনে কেউ গেল না। সে তখন হেলে-দুলে নির্বিকার চিত্তে চলেছে সিংহাসন-পর্বতের ঘন অরণ্যের কোলে।

এই ঘটনার কোন প্রতিক্রিয়া হ'ল না হাতিটার উপর। কয়েক দিন পরেই আবার তার আর্বিভাব ঘটলো। বলা বাহুল্য, ধানের লোভ খুনী হাতিটাকে বার বার টেনে আনলো ভেডেন্-ব্লকে। তখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। গ্রামবাসীরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রইলো। চূড়ান্ত সাবধানতা অবলম্বন করায় দুষ্ট হাতিটা আর কোন হতভাগ্যকে যদিও পদতলে নিষ্পেষিত করতে পারলো না, তবুও তার অত্যাচার কিন্তু সমানে চলতে থাকলো। হাতিটার কবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য উচ্চ মহলে আবেদন করা ছাড়া গ্রামবাসীদের করবার আর কিছুই ছিল না। হাতিটাকে মারবার মত কোন অস্ত্র না থাকায় ওদের দুর্দশা চরমে উঠলো। প্রচুর ধানের ক্ষতি হতে লাগলো। সম-বৎসরের খাদ্যের এই অপচয় দেখে ওরা অবশিষ্ট যা ধান মাঠে ছিল কেটে ফেললো, তবুও হাতিটা আরও কয়েকটা দিন ঘোরাফেরা করতে লাগলো। তারপর একদিন একটা ঝোপড়ী সজোরে নাড়া দিয়ে গেল। লম্বা শুঁড় বাড়িয়ে 'খুলি' থেকে ধান চুরি করে খেতে লাগলো। খামারে ধান রাখার জায়গাকে এরা 'খুলি' বলে। হাতিটার দুঃসাহস দেখে ওরা খুলিগুলো কাঁটাগাছ দিয়ে ঢেকে রাখলো। এরপর হাতিটা অন্যত্র যাওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করে কোথায় যেন চলে গেল, কেউ জানলো না—জানার প্রয়োজনও বোধ করলো না। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো ভেডেন্-ব্লক।

এই ঘটনার পর হাতিটাকে "দুষ্ট-হাতি" হিসাবে ঘোষণা করা হ'ল। পুরস্কার মাত্র পাঁচশত টাকা। সম্বলপুরের কালেক্টরের এই ঘোষণার খবরটা সংবাদপত্র মারফৎ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছিল হাতিটা পুরুষ। তবে তার দাঁত সম্বন্ধে দ্বি-মত থাকায়—সে কথা আর উল্লেখ করা

হয়নি প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে একজনের অভিমত—হাতিটার দাঁত নেই, অতএব মাদী। আর দ্বিতীয়জন হাতিটার সামান্য একটু দাঁত দেখতে পেয়েছিল। সুতরাং নিশ্চিতভাবে তখন কিছুই বলা সম্ভব হয়নি। তবে এ বিষয়ে কোন দ্বি-মত ছিল না, যে হাতিটা যেমন বেপরোয়া তেমনি শয়তান। ওর ধূর্তমির অনেক খবর ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। যেমন, কি কৌশলে ও খুলি থেকে ধান খায়, মানুষ দেখলে কেমন করে সামান্য ঝোপে আত্মগোপন করে ইত্যাদি······।

একদিন পত্রপালীর চৌকিদার শঙ্কর মাঝি দু'জন সঙ্গী নিয়ে কোন কাজে খুব ভোরে রওনা দিল। অপর সঙ্গীদের সাইকেল না থাকায় শঙ্কর মাঝিকে সাইকেল নিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হচ্ছিল। এমন সময় হাতিটা কোথা থেকে এসে হাজির হ'ল। ওরা সাইকেল ফেলে প্রাণের দায়ে যে যেদিকে পারলো ছিট্‌কে গেল। এদিকে খুনী হাতিটা বোকা বনে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ওদের পলায়ন দেখলো, তারপর সাইকেলটার দিকে এগিয়ে গেল। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী পা তুলে দিয়ে শুড় দিয়ে সাইকেলটা জড়িয়ে ধরলো। তারপর একটা নালায় সেটা ফেলে দিয়ে গেল। আমার সঙ্গে যখন শঙ্কর মাঝির দেখা-হ'ল, ও খুব স্বাভাবিক কারণেই—হাতিটার বুদ্ধি বিবেচনার খুব প্রশংসা করেছিলো।

আমি মহানদী পার হয়ে সিঙোল থেকে পত্রপালীতে এসে দু'দিন থেকে গেলাম। হাতিটার সন্ধানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বনবাদাড় ভাঙতে লাগলাম। মাইলের পর মাইল অতিক্রম করেও হাতিটার কোন হদিস পেলাম না। বনের মধ্যে তার শুয়ে থাকা, বিচরণ, গাছ-পালা ভাঙ্গা আর তাল তাল নাদী নজরে পড়লো, কিন্তু তখন ঠিক কোথায় যে সে রয়েছে তা অনুমান করতে পারলাম না। একটা শুক-নালা পার হয়ে উপরে উঠতেই একটা শব্দ কানে এল। খুব সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে ঝোপের ফাঁকে চোখ লাগিয়ে একটা কলো জিনিস নজরে পড়লো। হাতিটার পিঠ মনে করে ৪২৩ বোরের রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে এতটুকু শব্দ না তুলে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম। হাতিটার এত কাছে এসে পড়েছিলাম, যে জোরে নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে সাহস হচ্ছিল না। হাতিটার বাঁ-দিকে যাবো স্থির করে অল্প একটু এগিয়ে গিয়ে রাইফেল তুলতেই সেই কালো জিনিসটার পাশ থেকে প্রকাণ্ড একটা বরা হঠাৎ ক্রুদ্ধ গর্জন তুলে তীব্রবেগে বন-বাদাড় ভেঙ্গে বেরিয়ে গেল। আমি রুদ্ধশ্বাসে দেখলাম, কালো জিনিসটা একটা পাথর, হাতি নয়। আমি জানতাম, হাতিটা

ঠিক এমনিভাবেই স্থির হয়ে থাকবে যখনই সে আমার পায়ের শব্দ পাবে। হাতির শ্রবণ-শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বরাটা তেড়ে না এসে সামনের দিকে যাওয়ায় আমি স্বস্তি পেলাম, অযথা রাইফেলের শব্দ করতে হ'ল না। বরাটা তেড়ে এলে অবশ্যই গুলি করতে হোত। যাই হোক, সে যাত্রায় আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এইটা বাইসনও আমায় খুব বিপদে ফেলেছিল।

এমনি আরও অনেকবার এমন সব বিপদজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম যে, মনে হচ্ছিল আমি হাতিটার শুঁড়ের নাগালের মধ্যে রয়েছি। মারাত্মক অবস্থা। টিগারে আঙ্গুল রেখে এক-পা করে সেইসব ভয়াবহ জায়গাগুলো রুদ্ধশ্বাসে পার হয়ে রুমালে মাথার ঘাম মুছতে হয়েছে। চিহ্নগুলো এত টাট্‌কা যে হাতিটাকে যে কোন জায়গায় যে কোন মুহূর্তে হঠাৎ আবিষ্কার করতে পারবো বলে মনে হচ্ছিল। জানি না সেইসব মুহূর্তে হাতিটার মুখোমুখি হলে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হোত। জঙ্গল এত ঘন যে সাপের মত লম্বা শুঁড়টা যে-কোন ঝোপের আড়াল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে গলা জড়িয়ে ধরতে পারে। চরম সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও আমি বহুক্ষেত্রে পরাস্ত হয়েছিলাম—একথা স্বীকার করতে এখন আর লজ্জা নেই। আমার একান্ত সৌভাগ্য এ দুনিয়ায় আমার দানাপানি তখনও ফুরিয়ে যায়নি, তাই দুষ্ট হাতিটা সেইসব মারাত্মক জায়গাগুলোতে সেই মুহূর্ত ছিল না।

সে চলেছে গদাই-লস্কর চালে, আর আমি পাগলের মত দ্রুত মাইলের পর মাইল অতিক্রম করেছি। আমি ১০ই ডিসেম্বর ভেডেন্‌-ব্লক থেকে হাতিটার অনুসরণ শুরু করি এবং ষোল দিনের মাথায় হাতিটা তবলাইয়ের জঙ্গলে মারা পড়ে। এই কয়দিন আমি সত্তর মাইল দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলে তাকে এক নাগাড়ে অনুসরণ করেছিলাম। আমি সারাদিনে যতটুকু পথ হাঁটি, সে কয়েক ঘণ্টায় তা অতিক্রম করে যায়। সমস্ত পত্রপালীর জঙ্গলে হাতিটাকে আমি ধাওয়া করে চল্‌লাম স্যাঁৎ-স্যাঁতে নালা, র‍্যাভাইনস্‌ আর ঘন বাঁশের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে।

কামপাটিতে যে পায়ের ছাপ সংগ্রহ করেছিলাম, এখানেও মিলিয়ে দেখলাম—সেই একই মাপ। হাতিটাকে অনুসরণ করবার সময় পথে যতগুলো থানা ও বন-বিভাগের দপ্তর পেয়েছি সর্বত্র ডায়েরী লিখিয়ে হাতিটার খবর জানবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সঠিক কোন সংবাদ না থাকায় আমার হয়রানি শতগুণ যেমন বেড়ে গেল, জেদও বাড়তে লাগলো ততোধিক। যেমন করেই হোক্‌ নাগাল ওর পেতেই হবে।

এ অঞ্চলে অন্যান্য বন্য হাতিও আসে, যখন ধানের শীষে দুধ জন্মায়। আমি

যখন এই কাজে ব্যাপৃত ছিলাম তখন ডিসেম্বরের প্রায় মাঝা-মাঝি। ক্ষেতের সব ফসল উঠে যাওয়ায় শস্যহালমাকারীরা অন্যত্র সরে গিয়েছিল। হয়তো "বামড়ার জঙ্গলে" তখন আশ্রয় নিয়েছে। খুনী হাতিটা সেই সময় একছত্র সম্রাট হিসেবে সিংহাসন পর্বতে একা বিচরণ করছিল, ওকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। সীমানার কোন শাসন ও মানেনি, যত্র-তত্র খেয়াল-খুশী মত বনের গাছ-পালা আর খেত-খামার ধ্বংস করছিল। হাতিটার শেষ চিহ্ন যখন আবিষ্কার করলাম, তখন সে লারা-সারার পথে পাড়ি দিয়েছে।

আমিও লারা-সারায় এসে পৌঁছলাম। ওখানকার ফরেস্টার জানালেন, হাতিটাকে সম্প্রতি দেও-ঝরণের গ্রামে দেখা গেছে। সেখান থেকে সাত মাইল খাড়াই ভেঙ্গে দেও-ঝরণের গ্রামে এসে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হতে বিশেষ দেরী ছিল না। হাতির উৎপাতে এখানে গত দু'বছর চাষ আবাদ হয়নি। ওরা আমার কাছে অভিযোগ করতে লাগলো, কেন আমি আরও আগে আসিনি। এদের হাতির আতঙ্ক আর খাদ্য-শস্যের অভাব দেখলে যে কোন মানুষ অভিভূত হয়ে পড়বেন। যাই হোক—প্রচণ্ড শীতে সে রাতটা ওদের গ্রামে কাটিয়ে পরদিন প্রাতঃকালে দু'মাইল হেঁটে খরাপুরার গ্রামে এসে পৌঁছলাম, কেননা হাতিটা খরাপুরার দিকে তখন রওনা দিয়েছে। তার বিশাল পায়ের টাট্‌কা ছাপগুলোই সে কথা জানিয়ে দিচ্ছিল।

খরাপুরার গ্রামটি বেশ বড়। আমার মোট-বাহক্‌ গ্রামের বাইরে ওর ডেরায় নিয়ে এল। ওদের তিন ভাইয়ের কয়েকটি ঝোপড়ী ছাড়া বলাঙ্গীর জেলার এক ফরেস্ট-গার্ডও সেখানে বাস করতো। আমার মোট-বাহকের নাম, মালিয়া। আমার জন্য একখানা ঘর ছেড়ে দেওয়ায় সেদিনের মত বিশ্রাম নিলাম। পথশ্রম, ক্লান্তি আর নৈরাশ্যে আমার চোখের পাতা কখন ভারি হয়ে এল, কখন দিন চলে গেল অস্ত সূর্য্যের শেষ গোলাপী আভায় তাও জানি না। ঘুম ভাঙ্গলো যখন রাতের অন্ধকারে সব একাকার হয়ে গেছে। খরাপুরার প্রথম রাতকে স্বাগত জানালাম। তখন কি বুঝতে পেরেছি, এই খরাপুরার পাহাড়ী ম্যালেরিয়ায় আমাকে এমন নাস্তানাবুদ হতে হবে! যাই হোক্‌, পাগলা হাতি অনুসরণ করবার ক্ষমতা তখন হয়তো আবার ফিরে এসেছে। অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে ধূমপান করতে করতে খুনী হাতিটার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর শুরু করলাম।

ওদের খবর হলো কুল-ঝরণের বনে হাতিটার সাড়া পাওয়া গেছে। হাতিটার গাছ ভাঙ্গার একটা অভ্যাস ছিল। আমি ওকে অনুসরণ করবার সময়

পঞ্চাশটার উপর বড় বড় গাছকে স-মূলে উৎপাটিত অবস্থায় দেখেছিলাম। এই রকম এক একটা গাছের বেড় প্রায় পাঁচ ফুটের উপর। এর থেকেই অনুমান করা চলে হাতিটা কত শক্তির অধিকারী। হাতির মাঝে-মাঝে গাছ উপড়ে ফেলে শক্তির পরীক্ষা করে। সেই অমিত শক্তিশালীর ভয়াবহ মূর্তি আমি কল্পনা করতে পারতাম। ওর পায়ের যে মাপ আমার সংগ্রহে ছিল তার পরিধি পাঁচ-ফুট—একে দুই দিয়ে গুণ করলে উচ্চতা দাঁড়ায় প্রায় দশ ফুটের মত। হাতিটার দ্বিতীয় অভ্যাস ছিল ঝরণার স্নান করা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে গা ডুবিয়ে থাকতো। মনের মত ঝরণা পেলে সে অঞ্চল ছেড়ে সহজে যেতে চাইতো না, তবে পাগলা হাতির খেয়াল—বাই চাপলে আর রক্ষা নেই, বড় বড় পা ফেলে কতদূর যে চলে যাবে, তা প্রায় কল্পনার বাইরে।

যাই হোক, হাতিটার এই স্বভাব বা অভ্যাসগুলো কিন্তু শিকারীর পক্ষে খুব অনুকূল। দূর থেকে গাছ ভাঙ্গার শব্দ তার অবস্থান জানিয়ে দেয়, আর ঝরণার জলে গড়াগড়ি আর ভিজে পায়ের ছাপ একেবারে অভ্রান্ত। যখন কোন মানুষের সাড়া পায় প্রকাণ্ড কানদুটো সজোরে নাড়তে নাড়তে ধেয়ে আসে। হাতির সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দেওয়া যথেষ্ট শক্ত। একথা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। খরাপুরার বাসিন্দারা তখনও হাতিটাকে চাক্ষুস দেখেনি, তবু দাঁতের কথা উঠলেই দু'হাত বিস্তার করে প্রত্যক্ষদর্শীর মতই হেসে তার ব্যাখ্যা দেবে। কারণ এত বড় হাতির দাঁত এই রকম হওয়াই তো স্বাভাবিক।

পরদিন সকালে খরাপুরার এক শিকারী শ্যামসুন্দরের সঙ্গে হাতিটার সন্ধানে বের হলাম। শ্যামসুন্দর ভৈ-ফাঁদ পেতে বুনো মুরগী ও খরগোস ধরে, সুতরাং জঙ্গল তার নখদর্পণে। খরাপুরা থেকে কুল-ঝরণের বন প্রায় আড়াই মাইল। ফাঁকা পথটা দ্রুত হেঁটে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম, তারপর শুরু হ'ল পা টিপে-টিপে হাঁটা। ঝরণার কাছে অত্যন্ত সন্তর্পণে এসে দেখলাম, হাতিটা গত রাত্রে স্নান করে তব্‌লাই জঙ্গলের দিকে চলে গেছে, পথে অজস্র নদী। এই হয়রানি আর সহ্য হচ্ছিল না, কুল-ঝরণের বনে আর যে সব জায়গায় হাতিটার থাকার সম্ভাবনা ছিল তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলাম, হাতিটা কোথাও নেই। কুল-ঝরণ বলাঙ্গীরের শেষ সীমানা, একটা পায়ে চলা সরু পথের ও পাশেই সম্বলপুরের তব্‌লাই জঙ্গল,—সম্বলপুরের এলাকা। পথের দু'ধারে কতকগুলো পাথর জড় করে রেখে সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। কুল-ঝরণের বনে হাতিটাকে না পেয়ে গতরাত্রে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম মুহূর্তে তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এত পরিশ্রম, এত হয়রানির এই ফল—ক্রমশ নৈরাশ্যের তিমির অন্ধকারে ডুবে যেতে লাগলাম।

মনে হ'ল আমার দ্বারা হাতি অনুসরণ করা আর সম্ভব নয়……! আমার শরীর ও মন দুই-ই তখন ভেঙ্গে পড়ছে।

একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছি, আমার পারমিটের নম্বর দ্বিতীয়। প্রথম জন দে-গাঁওয়ের অধিবাসী, ভদ্রলোকের ৩৭৫ রাইফেল ছিল। হাতিটাকে দূর থেকে দেখে অনুমান করলেন, (সেই সময় হাতিটাকে প্রায়ই ধান-ক্ষেতের উপর দেখা যেত) হাতিটা এতবড় যে ৩৭৫ ম্যাগনাম সে তুলনায় যেন খেল্না। অযথা খুনী হাতিটাকে বিরক্ত করতে সাহস হ'ল না। শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন—বনের হাতি মারা অপেক্ষা নিজের পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা করার প্রয়োজন অনেক বেশী। সেই বিবেচনা করে বুদ্ধিমানের মত কালেক্টরের অফিসে পারমিট জমা করে দিলেন। এর একমাস পরে আমার নামে পারমিট 'ইস্যু' করা হয়েছিল, যথেষ্ট দেরী হওয়া সত্ত্বেও আমি হাতিটার চিহ্ন অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত তার নাগাল পেলাম। কিন্তু আমার শরীর তখন ভেঙ্গে পড়েছে, সর্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা, পা ফুলে উঠেছে, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত।

শ্যামসুন্দরকে বললাম—আমাকে লারা-সারায় নামিয়ে দিতে, আমি বরদাস্ত করতে পারছিলাম না এত নৈরাশ্য আর দুর্ভোগ! আমার ক্লান্ত, বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সে কি বুঝলো জানি না, শুধু ঘাড় নেড়ে চলে গেল। দীর্ঘ ঢ্যাঙ্গা লোকটার মাথার বাব্‌রী চুল গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে যেতেই একটা জমাট দীর্ঘশ্বাস কেমন করে বুকটাকে হাল্কা করে দিয়ে গেল, তার বর্ণনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। কুল-ঝরণের সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে নেমে এসে যেন সে গ্লানি নীরবে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করলো।

পরদিন যথাসময়ে ভোর হ'ল। অনেক বেলায় আগুনের ধারে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় দু'জন লোক এসে দাঁড়াল। খুব অনীহার সঙ্গে ওদের দিকে তাকাতেই ওরা বলে উঠলো—তব্‌লায়ের জঙ্গলে হাতিটাকে তারা দেখেছে। বিদ্যুৎ—হ্যাঁ, বিদ্যুতের মতই সে শব্দতরঙ্গ কি ঘটিয়ে দিল আমার শরীরে, চোখে জল এসে গেল…! রাইফেলটা নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম। তব্‌লাই এখান থেকে মাইল দুই দূরে, যেন শূন্যে উড়ে গেলাম সেখানে। তব্‌লাই গ্রামের আরও কয়েকজন সঙ্গ নিল, সন্ধ্যা পর্যন্ত তব্‌লাই জঙ্গলে ঘুরে হাতিটাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম। চতুর হাতিটা আমাদের সাড়া পেয়ে এমন একটা দূরত্ব রেখে হাঁটতে শুরু করলো, যে পায়ে হেঁটে সে দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব নয়।

তখন লোকজনদের ডেকে হাতিটাকে ঝরণার দিকে তাড়া দিতে বললাম। এর ফল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল, হাতিটা ক্যাঁক্-ক্যাঁক শব্দ করে সন্ধ্যার

সময় ঝরণার দিকে চলে গেল। পরদিন ভোরে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে ঝরণার ধারে নিঃশব্দে দেখলাম, হাতিটা সারা রাত জলে গা ডুবিয়ে শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সেদিনের মত ফিরে এলাম, জানি হাতিটা এখন সেইখানেইথাকবে। এইখানে আমার সঙ্গী হীরক নন্দীর সঙ্গে আমার ছাড়াছড়ি হয়ে গেল। ছুটী ফুরিয়ে যাওয়ায় সে কোলকাতায় ফিরে গেল। এরপর মনে হ'ল অনেক দিনের একটা প্রতিশ্রুতি হয়তো এবার রক্ষা করতে সক্ষম হব।

ধমা পোষ্ট-অফিস থেকে আমার শিকারী সঙ্গী শিবানী পালচৌধুরীকে যে টেলিফোন করেছিলাম, তার জবাব এল না। এল শিবানী নিজে, হাওড়া থেকে টানা জীপে করে সন্ধ্যার সময় এসে পৌছল —সেদিন ২৪শে ডিসেম্বর। ঝরণার মিষ্টি জলে খুনী-হাতিটাকে ভুলিয়ে রেখেছি—এই কথা শুনে সে খুশী হয়ে খুব জোরে হেসে উঠলো। একান্ত সৌভাগ্য না হলে শিকারে ওর মৃত সঙ্গী পাওয়া যায় না, যেমন ঘনশ্যাম আর ভদ্রেশ্বর তেমনি হীরক নন্দীও। বেচারা এত কষ্ট করলো অথচ হাতি-শিকারের সময় থাকতে পারলো না। শিবানী এসে পড়ায় আমরা সব কষ্টের অবসান হ'ল, পেটভরে খেয়ে সারারাত হাতির গল্প করলাম। আকাশের অসংখ্য তারা ভোরের আলোয় মিলিয়ে যেতেই ২৫শে ডিসেম্বরে যে ভোর হ'ল তার আনন্দ বিশ্বব্যাপী—"বড়দিন"! সেই বহু আকাঙ্খিত শুভ-মুহূর্তটি নিয়ে ভোর হ'ল। মেঘ-মুক্ত নির্মল আকাশ, বনে বনে বনফুলের সুবাস, ঘুমভাঙ্গা পাখীর কাকলিতে সেই মিষ্টি স্পর্শ—বড়দিন! আমরা প্রাতঃরাশ সেরে তৈরী হলাম, শিবানী ওর ৪৫০/৪০০ বোরের দো-নলা রাইফেলটা আর একবার পরিষ্কার করে নিল। তারপর এক শুভক্ষণে ভেডেন্-ব্রকের খুনীর মোকাবিলা করবার জন্য রওনা দিলাম, তখন সময় সকাল ন'টা বেজে বারো মিনিট।

শিবানী, আমি, শ্যামসুন্দর আর একজন—নাম তার বিভীষণ। বিভীষণ শ্যামসুন্দরের শাকরেদ, সেই সুবাদে তাকেও সঙ্গে নেওয়া হ'ল। বিভীষণের হঠাৎ আবির্ভাবে একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। রামায়ণে বিভীষণ না থাকলে হয়তো লক্ষ্মণের 'মেঘনাদ' বধ সম্ভব হোত না। শিবানী ও আমার এই অভিযানে জানি না আমাদের বিভীষণ কতটা সহায় হবে। অত্যন্ত সন্তর্পণে ঝরণার কাছে পৌঁছে দেখলাম, হাতিটা স্নান সেরে উপরে উঠে গেছে। বড় বড় পায়ের গর্তে তখনও জল জমে ছিল, শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়েছে চতুর্দিকে। তারপর বড় বড় পা ফেলে উঠে গেছে উপরের জঙ্গলে। আমরা সেই চিহ্ন ধরে যখন অগ্রসর হচ্ছি, শিবানী তখন ধুলো উড়িয়ে হাওয়ার গতি দেখে নিল।

হাতিটা বড় বড় পাথরগুলোর উপর দিয়ে কিছুক্ষণ আগে একটা খাদে নেমেছে, আবার সেখান থেকে খাড়াই ভেঙ্গে উপরে উঠে গেছে। এই উপরে উঠবার সময় একতাল টাট্‌কা নাদী নজরে পড়লো। নালাটার ঠিক উপরে আসতেই হঠাৎ আমাদের ডানদিকে 'খট্' করে একটা শব্দ হ'ল। শব্দটা একটা ডাল ভাঙ্গার। হাতিটা খুবই কাছে রয়েছে। আমরা হাওয়ার বিপরীত দিকে থাকায়, সে আমাদের গায়ের গন্ধ তখনও পায় নি। আমরা যে অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থাতেই নিশ্চল হয়ে কান পেতে রইলাম, আর কোন শব্দ হয় কি-না শোনবার জন্য। কিন্তু কোন শব্দ হ'ল না, সব চুপ-চাপ। হাতিটার সন্দেহ হয়েছে। তার এই নিঃশব্দতায় আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, এবং সন্দেহ হ'ল নিশ্চয় আমাদের শব্দ সে পেয়েছে। ঘন ঝোপের মধ্যে হাতিটা ঠিক কোন্ জায়গায় রয়েছে সেটা অনুমান করা তখন কঠিন হয়ে পড়লো এবং হাতিটা যদি আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে থাকে, তাহলে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসবে। এবং সে আক্রমণের পরিণতি হবে অত্যন্ত শোচনীয়, খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা করা দরকার। হাতি কোন সুযোগের অপেক্ষায় তখন পাথরের মত স্থির হয়ে কোন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। আমি শিবানীর দিকে তাকালাম, ও তখনও ধুলো উড়িয়ে বাতাসের গতি দেখছে। আর—আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে রাইফেলের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে চিন্তা করতে লাগলাম, যে-কোন ঝোপের আড়াল থেকে যদি সাপের মত লম্বা শুড়টা এগিয়ে আসে তখন আমরা কি করবো!

পরিস্থিতি তখন এত ভয়াবহ হয়ে উঠল, যে খুনী হাতিটার আতঙ্ক তখন ধীরে ধীরে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। এমন এক বিপরীত অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম, যে আমরা পিছু হ'টে আসবো কি-না, সে কথা ভাববারও অবকাশ পেলাম না। সবসময়ই মনে হচ্ছিল—আমরা একটু বেশী ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি এবং হাতিটার এত কাছে এসে পড়েছি যে, এতটুকু শব্দ বা নড়াচড়া করলেই সে সরাসরি আক্রমণ করে বসবে। দ্রুত একটা কিছু করতেই হবে, নইলে বিপদ অবশ্যম্ভাবি।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কয়েক সেকেণ্ড অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম, কি ঘটতে চলেছে আর কি ঘটবে, সে কথা চিন্তা করবারও অবকাশ পেলাম না। যতই সময় চলে যেতে লাগলো ততই হাতিটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে আর সুযোগ বাড়ছে, আর কতক্ষণ সে অপেক্ষা করবে—সে কথা ওর থেকে ভাল আর কেউ জানে না। এমন সময় কোন দ্বিধা না করে সামনের নালাটায় নেমে গেলাম, নালাটা পার

হতেই দৈবক্রমে পেয়ে গেলাম একটা ঘাস-জমি। হাতি কোন কারণে আমাদের এই নড়াচড়া বুঝতে পারে নি। পুরু গালিচার মত নরম ঘাসের উপর এসে পড়লাম, তারপর এতটুকু শব্দ না তুলে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এক-পা করে উদ্যত রাইফেল হাতে অগ্রসর হতে লাগলাম।

এমন সময় বিভীষণ কান পেতে কি শুনলো, তারপর সে আমাদের ডানদিকের একটা ঝোপ লক্ষ্য করে আঙ্গুল বাড়িয়ে কি দেখাবার চেষ্টা করলো। আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না, এমন সময় পিছন ফিরে দেখি বিভীষণ নেই, একটা মোটা শালগাছের আড়ালে নিঃশব্দে লুকিয়ে পড়েছে। শ্যামসুন্দরও অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়লো কিন্তু আমাদের সঙ্গ ছাড়লো না, দৌড়বার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আমাদের পিছু পিছু আসছিল।

এইভাবে মাত্র দশ-পনেরো কদম অগ্রসর হয়েছি, অমনি শ্যামসুন্দর তীব্রবেগে পালিয়ে গেল। সামনের ঝোপটার উপর মুখ তুলেই দেখি হাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চল পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রকাণ্ড হাতিটা। সেই নালার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে, আমরা যে ওর পিছনদিকে এসে পড়েছি মোটেই টের পায়নি। আমাদের পায়ের শেষ-শব্দ যেখানে সে পেয়েছিল, সেইদিকে তাকিয়ে রয়েছে। দূরত্ব মাত্র পনেরো-ষোল হাত। ভাঙ্গা ডালটা তখনও শুঁড়ে জড়ান এবং লম্বা শুঁড়টা মাথার কাছে গুটিয়ে জড় করা, আক্রমণের পরিপূর্ণ ভঙ্গী।

শিরানী ও আমি মুহূর্তের মধ্যে নিঃশব্দে রাইফেল তুলে ধরলাম। শিবানী আমার আগে থাকায় হাতির মাথাটা দেখতে পাচ্ছিল, আর আমার সামনে একটা ঝোপের আড়াল পড়ায় দেখছিলাম তার পিঠের উপর প্রকাণ্ড শিরদাঁড়াটা। হাতিটার মাথাটা ভালভাবে দেখবার জন্য যেই এক-পা বাড়িয়েছি, অমনি হাতিটা মুহূর্তের মধ্যে গুটানো শুঁড়টা সামনের দিকে প্রসারিত করলো এবং মাথাটা সবেগে ঘুরিয়ে আমাদের আক্রমণ করবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শিবানীর ৪৫০/৪০০ থেকে একটা চারশো গ্রেনের সলিড-গুলি ওর কানের ফুটোয় ঢুকে গেল। গুলিটা লাগতেই প্রচণ্ড শব্দ করে গাছপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে হাতিটা তীব্রবেগে তবলাইয়ের এলাকা থেকে ছুটে গেল কুল-ঝরণের বনে, তারপর স-শব্দে পড়ে গেল! যেন বিশাল একটা পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। ভাঙ্গা ডালটা তখনও শুঁড়ে জড়ান এবং সাপের মত কুণ্ডলি পাকিয়ে রয়েছে শুঁড়টা। সময় তখন বেলা দশটা বেজে সেই বারো মিনিট। ভেডেন-ব্রক থেকে সত্তর মাইল হাতি অনুসরণ করা শেষ পর্যন্ত তবলাইয়ের জঙ্গলে এসে

শেষ হ'ল। হাতিটা মাত্র দু' ফার্লং দৌড়তে পেরেছিল, তারপর তার দম ফুরিয়ে গেল। পিছনের একটা পা আর ছোট্ট ল্যাজখানা শূন্যে তুলে ধরলো প্রায় আধ-মিনিট, তারপর ধীরে ধীরে নেমে এল মাটিতে। কানের ফুটো দিয়ে রক্তের একটা সরু-ধারা নেমে এল, হাতিটার পিছনে—ঠিক কোমরের নীচে বারো-বোর বন্দুকের একটা বুলেটের দাগ রয়েছে। হাতিটা 'মাখ্‌না'। বাইরে যেটুকু দাঁত বেরিয়েছিল তার দৈর্ঘ্যতা মাত্র চার ইঞ্চি, পায়ের পরিধি সেই পাঁচ-ফুট, উচ্চতা যথারীতি দশ ফুটের মত। ভেডেন-ব্লকের খুনী মাখ্‌না হাতিটার অভিশপ্ত নিঃসঙ্গ জীবনের এইভাবে অবসান হ'ল—তারিখ ২৫শে ডিসেম্বর, উনিশ-শো বাহাত্তর সাল!

আহত বাঘ

শিকারীর গুলি খেয়ে যখন কোন বাঘ যন্ত্রণা ও রাগে গর্জন করতে করতে শূন্যে লাফিয়ে উঠে আছাড় খেয়ে পড়ে, তখন শিকারীর আর নড়বার ক্ষমতা থাকে না ; আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড় হয়।

সেই সত্যকে—স্বীকার করে লিখে গেছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ বাঘশিকারী স্বর্গত জিম করবেট। 'পাওয়ালগড়ের কুমার বাহাদুরের চোখের একইঞ্চি নীচে লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টানার পর আধঘণ্টা ধরে যা চলল, তাতে আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড়। বাঘটা একলাফে ঝোপের উপর দিয়ে সোজা শূন্যে উঠে ঝড়ে ওপড়ানোএকফুট মোটা একটা গাছের গুঁড়ির ওপর চিত হয়ে আছড়ে পড়ল। তারপর রাগে আত্মহারা হয়ে সে গাছটাকে ফালাফালা করে ছিঁড়তে লাগলো। আর এমন এক রক্ত-হিম-করা আওয়াজ করতে লাগলো, যা শুনে মনে হচ্ছিল সে যেন তার সবচেয়ে বড় শত্রুকে পায়ের তলায় পিষে মারছে। গাছেরডালপালাগুলো এমন নড়ছিল, যে মনে হচ্ছিল যেন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে।

বাঘটা আছড়া-আছড়ি করে রাগে-দিশেহারা হয়েগিয়েছিল, কেন না গাছটা থেকে ডালপালা এবং বড় বড় কঠোর চটা খসানো ছাড়াও সে অনেকগুলো ঝোপের গোড়াশুদ্ধ উপরে ফেলেছিল, কতকগুলো ঝোপ দাঁত দিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলেছিল। চারিদিকে প্রচুর রক্তপাতের চিহ্ন! দু'জায়গায় আবার চাপ-চাপ রক্ত দেখা গেল। কাছাকাছি ছোট একটুকরো হাড় পড়েছিল—পরীক্ষা করে দেখলাম সেটা বাঘের খুলির একটা অংশ।' এই হ'ল—পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম জন্তু সদ্য আহত বাঘ!

আর এক শিকারী লিখেছেন—'বাঘটা যেখানে মড়ি এনে রেখেছিল, তার অনতিদূরেই মাচা বাঁধা হ'ল। মাচার গাছের একটা ডাল উঁচু জমিটার দিকে ঝুলে ছিল, কিন্তু বাঘটা কাছে পিঠে কোথাও আছে সন্দেহে, ডালটা কাটার ঝুঁকি নেওয়া হ'ল না।

অন্ধকার পক্ষের নিস্তব্ধ রাত, কোথাও এতটুকু শব্দ নেই,—এমন কি পোকা-মাকড়রাও সাড়া দেয়নি। রাত্রি যখন গভীর হ'ল, তখন অস্পষ্ট একটা খস্‌খসানি কানে এল। অল্প একটু পরেই শুকনো ডাল ভাঙ্গার হাল্কা শব্দ, তারপর সব

চুপচাপ। বাঘটা মড়িতে এসেছে, কিন্তু কী কারণে খাওয়া আরম্ভ করলো না। দীর্ঘ সময় কেটে যেতে লাগলো, বাঘটার আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। বাঘটা তখনও সেখানে আছে কি না তারও সন্দেহ দেখা দিতে লাগলো। অথচ রাইফেলের ভারে হাত টনটন করছিল, ধৈর্যও তখন শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে।

অস্বস্তি আর সন্দেহ মুক্ত হওয়ার জন্য সিগারেট মুখে দিয়ে যেই দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়েছি, অমনি বাঘটা মাচা আক্রমণ করে বসলো। ঝুলে পড়া ডালটা আঁকড়ে গজরাতে গজরাতে মাচার ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে নিচে পড়ে গেল। তারপর অন্ধকারে বাঘটা কোথায় গেল বুঝতে পারা গেল না। বাঘটারও সন্দেহ হয়েছিল, মড়ি সামনে রেখে পাতার আড়াল থেকে দেখছিল—মাচা। আর খাওয়ার ব্যাঘাত ঘটায় ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছিল। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলা দেখে মাচা আক্রমণ করে তছনছ করে রাগ প্রকাশ করে গেল। অল্পের জন্য সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গিয়ে ভাঙ্গা মাচায় আড়ষ্ট হয়ে রইলুম। ভোর না হওয়া পর্যন্ত আর নড়াচড়া করিনি।'

পূরণাগড়ের বাঘটাকে আহত করে আমারও সেই দশা হ'ল, ভয়ে আমি ঘামতে লাগলাম। বাঘটাকে অনুসরণ করে শেষ করে দেওয়ার সাহস উবে গেল। পাথরের যে ফাটলটায় বাঘটা তখন আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানে পায়ে-হেঁটে যাওয়ার শক্তি আমার ছিল না। আতঙ্কে গলা-বুক শুকিয়ে আসছিল, বাঘটার পিছনে না গিয়ে পূরণাগড়ের বাংলোয় ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

উড়িষ্যা রাজ্যের মহকুমা শহর—আঙ্গুল থেকে পূরণাগড়ের দূরত্ব পঁয়ত্রিশ মাইল। পূর্বে কোর্লাপৎ পাহাড়, পশ্চিমে পূরণাগড়ের পাহাড় ঘেঁসে ঐ এলাকার একমাত্র সড়কটি উত্তর-পশ্চিমে বেঁকে পূরণাকোটে গিয়ে মিশেছে। পূরণাগড়ে তখন প্রচুর শিকারের জন্তু পাওয়া যেত, আর কোর্লাপৎ ছিল বাইসনের জন্য বিখ্যাত।

পশ্চিমের পাহাড়ের ঠিক নিচেই পূরণাগড়ের P. W. D. বাংলো। আমি যখন সেখানে এসে পৌঁছলাম, প্রথম যে দুটি লোক তখন দেখা করতে এল, তাদের মধ্যে প্রথমটি হ'ল গ্রামসেবক আর দ্বিতীয়জন ফরেষ্ট-গার্ড। বাংলোর মালীর ঘরে আর একটি লোক থাকতো, সে ডাক-বিভাগের রানার। এই রানারের সঙ্গে আমি একবার মানিকজুড়িতে ভালুক মারতে গিয়েছিলাম। পূরণাগড়ের অধিবাসীরা খুব লাজুক প্রকৃতির, উপরোক্ত মানুষগুলি ছাড়া আর কেউ আমার বাংলোয় আসতো না। তখন রানার ওর এক আত্মীয়কে নিয়ে এল আমার

সাহায্যের জন্য—লোকটির নাম গঙ্গা। সেই থেকে গঙ্গা আমার বন্ধু হয়ে গেল গঙ্গাও শিকারী।

খুব ভোরবেলা পূরণাগড়ের রাস্তায় নেমে এলে প্রায়ই চোখে পড়তো একটা বাঘের পায়ের ছাপ! বাঘটা কখনও এপার থেকে ওপারে গেছে, আবার কখনও ওপার থেকে এপারের পাহাড়ে উঠেছে, ধুলোর উপর ছাপটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠতো। আমি গঙ্গার সঙ্গে বাঘটার সন্ধান করতাম, পাথর আর ঘাসবনে বাঘটার ছাপ হারিয়ে গেলেই আমাদের সন্ধান শেষ হতো। তখন আমরা মুরগী বা তিতির মারবার জন্য নিচের হাল্কা জঙ্গলে নেমে আসতাম বাঘটাকে দেওয়ার জন্য পূরণাগড়ের গ্রাম থেকে টোপ সংগ্রহ করা দুরূহ হয়ে উঠলো, কেননা—এরা ভাবে সব শিকারীই রাজা-মহারাজা।

বাঘটা যেখানে রাস্তা পারাপার হতো—তার অল্পদূরেই একটা সাঁকো, সাঁকোটা পার হয়েই রাস্তাটা পূরণাকোটের দিকে বেঁকে গেছে। আর ডানদিকের সরু পথটা গ্রামের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। রাস্তাটা যেখানে গিয়ে দু'ভাগ হয়েছে, তার সামনের নিচু জমিটা একটা ধানক্ষেত। বাঘটাকে মারবার যখন আর কোন উপায় নেই, তখন গঙ্গার সঙ্গে পরামর্শ করলাম, রাস্তার ধারে কোন গাছে বসে বাঘটার জন্যে অপেক্ষা করবো। সাঁকোর ধারে একটা আমগাছে মাচা বাঁধা হ'ল, এখানে-বসলে রাস্তার তিনটে কোণই দেখা যায়—বাঘটা যে-কোন রাস্তা ধরে এলেও আমাদের নজর এড়াতে পারবে না।

পূরণাগড়ে তখন কোন মানুষখেকো বাঘ ছিল না যে বাঘটার জন্য সেদিন সন্ধ্যার সময় আমি ও গঙ্গা মাচায় এসে বসলাম, সে বাঘটা তখন পর্যন্ত পূরণাগড়ে কোন গরু-বাছুর ধরেনি। সুতরাং বাঘটাকে মারতে পারবো বলে আশা হ'ল, কেন না—বাঘটা মানুষ সম্বন্ধে তেমন সতর্ক নয়, আর কোন শিকারী ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছে বলেও শুনিনি।

গঙ্গা পাঁচ-সেলের একটা টর্চ নিয়ে আমার পিছনে বসেছিল, আর আমি ৪৫০/৪০০ বোরের রাইফেলটায় দুটো গুলি ভরে পথটার উপর তাকিয়ে ছিলাম। অন্ধকার হতে হুড়মুড় করে একটা মাদী সম্বর রাস্তা পার হয়ে গেল, তারপর অনেকক্ষণ আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। সমস্ত বন নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। রাত তখন কত হবে জানি না, চাঁদ পশ্চিমের পাহাড়ের মাথায় নেমে আসতে লম্বা লম্বা গাছের ছায়ায় রাস্তাটা অন্ধকার হয়ে গেল। ফলে গুলি করার সম্ভাবনা অনেক কমে যাওয়ায় পরিস্থিতিটা আমি গঙ্গাকে আকারে ইঙ্গিত বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম—।

এমন সময়ে পশ্চিমের পাহাড় থেকে একটা কোট্‌রা-হরিণ চিৎকার করে ডেকে

উঠলো। হরিণটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সঙ্কেতের ধ্বনি ছড়াতে লাগলো প্রায় আধমিনিট ধরে, তারপর থামলো। অরণ্যের প্রহরীর এই হুঁশিয়ারী সঙ্কেত শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি রাইফেল তুলে নিলাম। তারপর দীর্ঘ সময় রাস্তাটার উপর তাকিয়ে থাকলাম। ভূতুড়ে ডাকটা শোনার পর যথেষ্ট উত্তেজনা অনুভব করছিলাম, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছিল—কিন্তু ক্রমে আবার সব মিলিয়ে গেল। ভারি রাইফেলটা নামিয়ে রাখলাম। আমি মনে মনে এক হাজার গোনবার পর স্থির করলাম, বাঘটা এ-রাস্তায় আজ আর আসবে না। কেন না, হরিণটা খুব কাছ থেকেই ডেকেছিল এবং বাঘটা যদি খুব ধীর গতিতে হাঁটে, তাহলেও রাস্তাটা পার হতে তার আট-নয় মিনিটের বেশী লাগা উচিত নয়।

এমন সময় গঙ্গা আমাকে ধান-ক্ষেতের দিকে ইশারা করলো। তাকিয়ে দেখি কোট্‌রা-হরিণটা ধান-ক্ষেতের উপর দিয়ে ওধারের জঙ্গলে চলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে চাঁদ পাহাড়ের আড়ালে চলে যাওয়ায়, সব অন্ধকার হয়ে গেল। তখন বাঘ কেন—একটা হাতি যদি নিঃশব্দে রাস্তাটা পার হোত—তাহলেও আমরা বুঝতে পারতাম না। তারপর অন্ধকার ফিকে হয়ে আসায় বন্য মোরগের ডাক ভেসে আসতে লাগলো। তখন সেই ডাক শুনতে শুনতে সিগারেট ধরালাম আর খুব আগ্রহের সঙ্গে ধোঁয়া গিলতে লাগলাম। তারপর ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ময়ূর ডেকে উঠতেই অন্যান্য পাখিরা ডানা ঝট্‌ফট্‌ করতে করতে আকাশে উঠে পড়লো। এইভাবে আমাদের প্রথম প্রহরার শেষ হলো, তখন গঙ্গাকে বললাম—মাচায় একটা রাত কাটিয়ে তবে পশ্চিমের পাহাড়ে উঠবো।

অনেকে মাচান্ স্যুটিং বিশেষ পছন্দ করেন না, বলতে শুনেছি মাচান্ স্যুটিং বোরিং বিশেষ। কেননা—মাচায় বসে কথা বলা যাবে না, ধুমপান নিষিদ্ধ, নড়াচড়া করলে বাঘ দেখে ফেলবে, একভাবে বসে থাকার দরুণ পায়ে খিল্ ধরে যাবে—তার উপর মশার কামড় ইত্যাদি···। আমার কিন্তু মাচান স্যুটিং খুব ভাল লাগে। গভীর জঙ্গলে একাকী চুপ করে বসে থাকা, দিনের ঝলমলে আলোয় কত বিচিত্র রঙের পাখীর নিকট থেকে মধুর সুরেলা ডাক শোনা, তাদের চঞ্চল ছটফটে শিশুর মত মাতামাতি দেখতে দেখতে কখন যে পশ্চিমের আকাশটা লাল হয়ে সূর্য ডুবে যায় বোঝা যায় না। তখন নীল আকাশ থেকে আঁধারের পর্দাগুলো নেমে আসতে থাকে এক এক করে। বনের পাখীরা গাছের শীর্ষ ডালে বসে দিনের শেষ গান গেয়ে ঘুমুতে যায়, আর আত্মপ্রকাশ করে রাতের কীট পতঙ্গেরা। রাত-চরা পাখীর মধ্যে প্যাঁচার ডাকে গা ছম্‌ছম্ করে, কতরকমের প্যাঁচা আছে ; যেমন—ভূতুরে-প্যাঁচা, ভুঁই-প্যাঁচা, হুতুম-প্যাঁচা

ইত্যাদি। পূর্ণিমার রাতে টি-টি-হ'টের ডাক শুনে মনে হয় ওর পিছনে পিছনে চলে যাই। রূপোলী আলোয় নৈশ্য-অরণ্যের রূপ বর্ণনাতীত! বনের পশুরা সেই আলো এড়িয়ে বনের ছায়ায় ছায়ায় নিঃশব্দে হাঁটে।

আবার অমাবস্যার মসীলিপ্ত অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায় সত্ব নির্বাক অরণ্য-শাসনে! পূর্ণিমার রাত যেন উচ্ছ্বাস-আলস্য, হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্ত; আর অমাবস্যার অন্ধকার তেমনি শাসন, সংযম, আত্মবিশ্বাসের মুহূর্ত।

নির্ভেজাল আনন্দ উপভোগ করা যায়—যদি শিকারী গুলি ভরা রাইফেল পাশে রেখে আত্মবিশ্বাসে নির্ভর হয়ে উপলব্ধি করতে পারেন অরণ্যের সেই দুর্লভ মুহূর্তগুলোকে।

যথারীতি সূর্য্য অস্ত গেল। পূরণাগড়ের পাহাড়ের কোন গাছের উঁচু ডাল থেকে উচ্চৈস্বরে ডেকে উঠল ময়ুর, মাও—মাও; ডাকটা শেষ হতেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সাঁকোর ধারে আমাদের দ্বিতীয় রাতের প্রহরা শুরু হয়ে গেল। ৪৫০/৪০০ বো'রের রাইফেলটা রাস্তা পারাপারের জায়গা বরাবর রেখে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে ছিলাম, আর গঙ্গা যথারীতি পাঁচ সেলের টর্চটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে পিছনে বসেছিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘন হচ্ছিল।

এমন সময় একটা শিয়াল সাঁকোটার কাছে এসে মুখ তুলে একবার ডান-দিকের জঙ্গল আর বাঁ-দিকের জঙ্গলের গন্ধ শুঁকলো, তারপর আমাদের গাছতলা পেরিয়ে ধানক্ষেতে অদৃশ্য হয়ে গেল। শিয়ালটা চলে যাওয়ার পর পশ্চিমের পাহাড় থেকে কোট্‌রা হরিণটা আবার ডেকে উঠলো।

পূরণাগড়ের গ্রাম তখন নীরব—নিস্তব্ধ। সেই নৈশ অন্ধকারে গা-আড়াল দিয়ে শুরু হয়ে গেল বন্য পশুদের সন্তর্পণে চলাফেরা, একটা হরিণ পূরণাকোটের রাস্তা ধরে নেমে এল ধানক্ষেতটায়। একটা বরা আমাদের পিছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সোজা ধানক্ষেতের দিকে চললো, সে কোনদিকে তাকাল না। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ওদের কালো কালো চেহারাগুলো দেখা দিয়েই ঝোপঝাড়ের আড়ালে মিলিয়ে যেতে লাগলো। আমরা নিঃশব্দে মাচায় বসে দেখতে লাগলুম ওদের আহার-বিহার। ওরা কেউ সদা সতর্ক—কেউ নিঃশঙ্ক। একটা পাখী আমাদের গাছটার মাথায় বসে কুক-কুক করে ডাকতে লাগলো, ডাকটা দূরাগত ধান-ভাঙ্গা কলের মত। গঙ্গা নিঃশব্দে হেসে আমায় পাখিটা দেখিয়ে দিল। ছোট্ট পাখীটা আরও বার-কয়েক ডেকে উড়ে গেল।

এক মিনিট দু'মিনিট করে সময় এগিয়ে চলল। হঠাৎ অনেক দূর থেকে একটা সম্বরের ভয়ার্ত চিৎকার ভেসে এল। সম্বরটা পশ্চিমের পাহাড় থেকে

ডাকতে ডাকতে পূরণাকোটের রাস্তায় নেমে গেল। চারদিক নীরব নিস্পন্দ, কবল পলায়মান সম্বরটার শেষ চিৎকার দূর থেকে আমার কানে এল। এক অদ্ভুত অনুভূতি তখন আমায় পেয়ে বসলো, মনে হচ্ছিল বাঘটা খুব কাছকাছি কোথাও রয়েছে। চাঁদের আলোয় তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম। কোথাও বাঘটার নড়াচড়া চোখে পড়লো না, এমন কি এতটুকু শব্দ বা এতটুকু খস্‌খসানি পর্যন্ত সেই নৈশ স্তব্ধতা ব্যাহত করছিল না।

পশ্চিমের পাহাড়ে আমি দু-বার হুটোপাটির শব্দ শুনেছিলাম। প্রথমবার যখন কোট্‌রা-হরিণটা তীব্র আওয়াজ করে পালিয়ে যায়, আর দ্বিতীয়বার ভয়ার্ত সম্বরটা ডাকতে ডাকতে পূরণাকোটের রাস্তায় নেমে আসে। এ থেকেই অনুমান করেছিলাম—বাঘটা দু-বার শিকার ফস্‌কে গেছে। তৃতীয় শিকারের আশায় বাঘটা তখনও ওৎ পেতে রয়েছে, না—দীর্ঘ টহল দিতে দিতে অন্য কোন অঞ্চলে চলে গেছে, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বাঘটার জন্য কোন টোপ সংগ্রহ করতে না পারায় তখন গভীর নৈরাশ্য বোধ করছিলাম, জন্তু চলাচলের পথের-উপর বসে থাকা মানেই অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করে ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়া।

যাই হোক বাঘটার মর্জির উপর নির্ভর করে বাকি রাতটা মাচায় কাটিয়ে দিলাম। সেই সময়ের মধ্যে আর কোন ঘটনা ঘটলো না, সম্বরের ভয়ার্ত চিৎকারটাই শেষ শব্দ। তারপর ভোরের আলো ফুটে উঠতেই আমাদের ক্লান্তিকর রাত-জাগার অবসান হলো। নৈরাশ্য ও একঘেঁয়েমির একটু বদ-বদলের জন্য গাছের গুঁড়িতে ঠেস্ দিয়ে একটা সিগারেট ধরলাম, আর চোখ বুজে মনের সুখে টান দিতে লাগলাম।

বাঘটা পশ্চিমের পাহাড়েই আছে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রাতঃরাশের পর আমি ও গঙ্গা চড়াই ভাঙ্গতে শুরু করলাম। গ্রামবাসীরা জ্বালানী সংগ্রহের জন্য পাহাড়ের এ-দিকটার ঝোপ-ঝাড় কেটে নিয়ে যাওয়ার ফলে পথের দু'ধার ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। পায়ে-চলা পথটা ধরে কিছুদূর ওঠার পর পথটা ফুরিয়ে গেল। তখন গঙ্গা কতকগুলো বড় বড় পাথরের চাঁই টপকে আমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে এল, যেখানে পৌঁছে ফুসফুসে আর হাওয়া টানতে পারছিলাম না। দম বন্ধ হয়ে মারা যাই আর কী। যাই হোক, একটু সুস্থ হয়ে আবার পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম।

গঙ্গা সেই সময় ফিস্‌ফিস্ করে বললো, এটা জন্তু চলাচলের পথ। কিছুদূর ওঠার পরই সম্বরের নাদি চোখে পড়লো, তারপর ভালুকের পায়খানা। এই

চিহ্নগুলো দেখে আমি আবার উৎসাহিত হয়ে পড়লাম। তখন নূতন উদ্যমে পাহাড়ের আগাছাগুলো শক্ত করে ধরে খাড়াই বেয়ে উঠতে লাগলাম। পায়ের উপর বিশেষ জোর পাচ্ছিলাম না, মসৃণ পাথর আর কাঁকরে পা হড়্‌কে যাচ্ছিল। ভারী রাইফেলটা নিয়ে আমার কষ্ট হচ্ছিল দেখে গঙ্গা সেটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। তবুও আমি গঙ্গার মতন অমন সহজে খাড়াই বেয়ে উঠতে পারছিলাম না, আমার সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছিল; গঙ্গার মজবুত কালো চেহারাও ঘামে চক্‌চক্ করছিল।

পাহাড়টার মাথায় প্রায় পৌঁছে গেছি, সামনের প্রকাণ্ড পাথরটার উপর হাত রেখে গঙ্গা স্প্রীং-এর মত উঠে আমার বাঁ-হাতটা ধরে উঠতে সাহায্য করলো। আমি তখন প্রকাণ্ড পাথরটা ধরে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে অর্ধেকটা উঠে পড়েছি, আমাকে টেনে রাখার জন্য ওর শরীরের কালো কালো পেশীগুলো শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছিল। এমন সময়ে গঙ্গা আমাকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল যেখানে বাঘটা শুয়েছিল।

প্রকাণ্ড পাথরটার ওপাশে আরও এমনি একটা পাথর, সেখান থেকেই জমিটা ঢালু হয়ে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরের আর একটা পাথরের গায়ে এসে মিশেছে। বড় বড় পাথরগুলোর আড়াল পড়ায় ঢালু মতন জায়গাটায় ছায়া এসে পড়েছিল। বাঘটা সেই ছায়ায় পাশ ফিরে শুয়েছিল। বাঘটা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, কারণ—বাঘটার মুখ ও চারটে পা আমাদের দিকে ছড়ান ছিল এবং তার পেটের ওঠানামা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম।

ঘুমন্ত বাঘটা যখন আমার দৃষ্টিগোচর হলো, তমন আমার শরীরের অর্ধেকটা পাথরের উপর আর বাকি অংশটা কোমর থেকে পা পর্যন্ত পাথরের ওপাশে ঝুলছিল। সেই অবস্থায় গঙ্গা রাইফেলটা ওর কাঁধ থেকে নামিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিল, তারপর হাত ছেড়ে কোমরের বেল্টটা ধরে রইলো। আর আমি রাইফেলটা হাতে পেটের উপর ভর করে হাঁপাতে-হাঁপাতে বাঘটাকে দেখতে লাগলাম। কুড়ি-পঁচিশ গজ দূরের একটা বাঘকে ওই অবস্থায় গুলি করার সাহস আমার ছিল না। নির্ভুল নিশানায় একটা গুলি ছুঁড়তে হলে শরীরের যে ব্যালান্স থাকার প্রয়োজন, আমার তখন তা ছিল না। বাঘটা তেড়ে এলে একমাত্র পনেরো-ষোল ফুট নিচের পাথরটার উপর আছড়ে পড়া ছাড়া যখন আর কোন পথ খোলা নেই, তখন নিজের অবস্থটা ঠিক করে না নিয়ে বাঘটাকে ঘাঁটাতে সাহস হলো না।

গভীর উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায় বুকের ভিতরটা তখন ধড়ফড় করছিল।

তাড়াতাড়ি পাথরটার উপর উঠতে গিয়ে রাইফেলের নলটা পাথরে ঠুকে গেল। খুব সামান্যই শব্দ হলো, কিন্তু মাটিতে কান পেতে শুয়ে থাকা বাঘটার কাছে সেই সামান্য শব্দটুকুই যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ফলে বাঘটা ঘুম-চোখে মাথা তুলে দেখতে লাগলো। আমাদের সঙ্গে সেই ওর দৃষ্টি বিনিময় হলো, আমি পরিণামের কথা না ভেবে মুহূর্তের মধ্যে ট্রিগার চেপে দিলাম। রাইফেলটার ধাক্কা কোনদিন অনুভব করিনি, প্রচণ্ড শব্দ করে গুলিটা বেরিয়ে যেতেই আমার কাঁধে এমন জোরে ধাক্কা লাগলো যে আমি নিচে পড়েই যেতুম—যদি না গঙ্গা শক্ত-হাতে আমায় ধরে থাকতো।

সদ্য ঘুম-ভাঙ্গা বাঘটার শরীরের মাঝখানে ৪০০ গ্রেনের নাইট্রো-এক্সপ্রেস গুলিটা ফেটে পড়তেই বাঘটা বিকট গর্জন করে শূন্যে লাফিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো ঢালু জমিটায়; তারপর পাথরের আড়ালে গড়িয়ে গেল। পাথরের আড়াল থেকে শুকনো পাতা গুঁড়ো করার আওয়াজ করতে করতে বাঘটা দু'বার ডেকে উঠলো—তারপর সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। গঙ্গার মুখ বেয়ে টস্‌টস্ করে ঘাম গড়াচ্ছিল, আমি ফ্যাকাশে মুখে একবার গঙ্গাকে দেখে বাঘটার গমন-পথে তাকিয়ে রইলুম। আমার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, হাতের আঙুল কাঁপছিল আর গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। বাঘটা তেড়ে এলে দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়তে পারতুম কিনা সন্দেহ। আমার হাতের কনুই ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো।

পাহাড়টায় ওঠবার সময় যত কষ্ট হয়েছিল, নামবার সময় তার সিকিও অনুভব করলাম না। তরতর করে নেমে এলাম পায়ে চলা পথটায়। তারপর বাংলোয় এসে ঢকঢক করে জল খেয়ে একটা সিগারেট ধরালাম ও গঙ্গাকে একটা দিলাম। গঙ্গার ঘর্মাক্ত কালো মুখে সাদা দাঁতের হাসি যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো, আমার হৃদপিণ্ডটা তখনও ধ্বক্-ধ্বক্ করছিল। আমাদের ধারণা হয়েছিল বাঘটার আঘাত মারাত্মক হয়েছে এবং আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় তার মৃত্যু ঘটবে। মরা বাঘটাকে গঙ্গা ঠিক খুঁজে বার করতে পারবে। ওর বলিষ্ঠ দেহটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, গুলি খেয়ে বাঘটা যখন গর্জন করে শূন্যে লাফিয়ে উঠলো, তখন যদি গঙ্গা ভয়ে আমার কোমরের বেল্ট ছেড়ে দিত, তা'হলে আমার পরিণাম কী হতো…।

আমরা ভেবেছিলাম বাঘটাকে মরা অবস্থায় দেখবো, বাঘটাকে গুলি করা হয়েছিল সকাল দশটায়—চব্বিশ ঘণ্টা পরে যখন সেই পাথরটার কাছে আবার এসে পৌঁছলাম, তখন আমার মনে সন্দেহ দেখা দিল। পাথরটার আড়াল থেকে

দেখলাম, বাঘটাকে যেখানে গুলি করা হয়েছিল সেখানে, কোন রক্ত পড়ে নেই। রক্তের কোন চিহ্ন নেই দেখেই আমার মুখ শুকিয়ে গেল, তাড়াহুড়ো করায় হয়তো গুলিটা ফসকে গেছে। পরক্ষণেই মনে পড়লো—বাঘটা পাথরের ওধারে আছাড়-আছড়ি করে শুকনো পাতা গুঁড়ো করছিল।

মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা দেখা দিলেও যথেষ্ট উদ্বেগ নিয়ে ধীরে ধীরে পাথটার উপর উঠে পড়লাম—তারপর লম্বা পা বাড়িয়ে দ্বিতীয় পাথরটার উপর এসে দাঁড়ালাম। ওখান থেকে কুড়ি গজ দূরে বাঘটাকে গুলি করা হয়েছিল, ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে সেই দূরত্বটুকু অতিক্রম করে দেখলাম, বাঘটা শূন্যে লাফবার সময় নখ দিয়ে কতকগুলো আঁচড় কেটেছে। তখন গঙ্গাকে একটা ছোট গাছে তুলে দিয়ে দেখতে বললাম—পাথরটার ওপাশে যেখানে বাঘটা শুকনো পাতা গুঁড়ো করছিল সেখানে বাঘটা আছে কি-না। গঙ্গা চারিদিক তন্ন-তন্ন করে দেখে যখন বললো বাঘটাকে দেখা যাচ্ছে না, তখন আমি পাথরটার পিছনে এলাম। বাঘটা প্রথম যেখানে আছড়ে পড়েছিল সেখানকার মাটি চ'টে গিয়েছিল আর তা'তে রক্তের ছিটে দেখতে পেলুম। তারপর বাঘটা যেখানে পড়ে আছড়া-আছড়ি করেছিল, সেখানে দেখলাম শুকনো পাতা রক্তে মাখা-মাখি এবং দু'তিন জায়গায় রক্তের দলা শুকিয়ে রয়েছে, বাঘটা নেই।

দিশেহারা বাঘটা আঘাতের প্রথম ধাক্কা এইভাবে সামলে নিচের সমতল জমিটার উপর দিয়ে টলতে টলতে প্রায় দু'শো গজ দূরের পাথরের কুণ্ডে জল খেয়ে কুণ্ডের ওপাশের একটা ফাটলে ঢুকে পড়েছে। সম্ভবতঃ ওটাই ওর আস্তানা। কুণ্ডের ধারে বাঘটা যেখানে শুয়ে জল খেয়েছে, সেখানেও একদলা রক্ত পড়েছিল। রক্তের চিহ্ন ধরে আমরা কুণ্ড পর্যন্ত গেলাম, তারপর আর অগ্রসর হতে সাহস হলো না। নিঃশব্দে সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, বাঘটা তখনও ফাটলটার মধ্যে আছে না বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে যাওয়ার কোন চিহ্ন চোখে পড়লো না, তখন আমরা ফাটলটার উপর চোখ রেখে ধীরে ধীরে পিছু হটে এলাম। ফাটলটা থেকে তিরিশ-চল্লিশ হাত দূরে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে গঙ্গাকে বললাম—বাঘটার উপর লক্ষ্য রাখতে হলে এই গাছটার উপর থাকতে হবে। মাচা বাঁধবার সরঞ্জাম, খাদ্য ও পানীয় জল কিছুই সঙ্গে ছিল না বলে তখনকার মত আমরা ফিরে এলাম। বিকাল তিনটের সময় এসে মাচার ব্যবস্থা করে বাঘটার জন্য অপেক্ষা করবো, প্রয়োজন হলে সারারাতই মাচায় কাটাব স্থির হলো। বাঘটার যদি উত্থান-শক্তি থাকে, তা'হলে তাকে ফাটলের বাইরে এসে কুণ্ডের জল খেতেই হবে।

বেলা তিনটের সময় নির্দিষ্ট গাছতলায় পৌঁছতেই গঙ্গা মাচা বাঁধতে শুরু করলো, আর আমি গুলি-ভরা রাইফেল হাতে নিচে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগলাম। গঙ্গা একটা বাঁশের পাটা এনেছিল, কোন শব্দ না করে চট্‌পট্‌ মাচা বাঁধবার পক্ষে জিনিসটা ভারি কাজের। চার হাত লম্বা আর দু'হাত চওড়া পাটাটা তৈরী করা হয়েছিল চার হাতলম্বা কতকগুলো মজবুত বাঁকারি দড়ি দিয়ে বনে। মাদুরের মত পাঠ করে বগল-দাবা করে আনা যায়। দুটো ডালের উপর পাটাটা বিছিয়ে মাচা বাঁধা শেষ হতেই আমি উঠে পড়লাম।

রাইফেলটা গাছের একটা ডালে ঝুলিয়ে আমরা যখন বসবার জায়গাটা ঠিক করে নিচ্ছি, ঠিক সেই সময় বাঘটা অতর্কিতে এসে হাজির হলো। ফাটল থেকে বেরিয়ে কখন কুণ্ডের জল পার হয়ে মাচার গাছটায় সামনের দুটো থাবা তুলে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল বুঝতেই পারিনি। আচম্‌কা বাঘটা গর্জন করে উঠতেই জলের বোতলটা নিচে পড়ে গেল। অসম্ভব ভয়ে হতভম্ব হয়ে সামনের মোটা ডালটা আঁকড়ে ধরে দেখলাম, বাঘের প্রকাণ্ড মাথাটা মাত্র চার-পাঁচ ফুট নিচে। তরোয়ালের মত বাঁকা মোটা চারটে দাঁত বার করে গজরাচ্ছে। আড়ষ্ট কাঠ হয়ে গেলাম, রাইফেলটার কথা ভুলে গেলাম, আতঙ্কে শুধু হাত-পা কাঁপতে লাগলো।

কয়েকটা রক্ত-হিম-করা গর্জন ছেড়ে বাঘটা ফিরে গেল, যাওয়ার সময় দেখলাম বাঘটা টেনে টেনে হাঁটছে। কুণ্ডের জলটা লাফাতে পর্যন্ত পারলো না, তার উপর দিয়েই হেঁটে ফাটলে ঢুকে পড়লো। বাঘটা অদৃশ্য হওয়ার পূর্বেই পাশ থেকে রাইফেলটা টেনে নিয়ে দ্রুত একটা গুলি করলাম। তখনও ঘোর কাটেনি, হতভম্বের মত ফাটলটার দিকে তাকিয়ে রইলাম—এর ফলে বাঘটা অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করলো মাত্র—আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

তারপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হলো, গভীর উত্তেজনা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলো। চারিদিক নীরব, নিস্পন্দ। কোন পশু-পক্ষীর ডাক নেই। পোকা-মাকড়রাও নীরব—নিস্তব্ধ। এতটুকু শব্দ বা এতটুকু খস্‌খসানি শোনবার জন্য কান পেতে সেই ঘোর অন্ধকারে দৃষ্টি মেলেছিলাম, যদি কোন ছায়ামূর্তি বা একটু নড়া-চড়া দৃষ্টিগোচর হয়।

এমন সময় চাঁদ উঠলো। পাহাড়ের মাথায় বড় গাছপালা বিশেষ না থাকায় আলো কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হলো না। বাঘটা আহত হয়ে যে ফাটলটায় আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানে চাঁদের আলো এসে পড়ায় অনেক দুর্ভাবনার অবসান হলো। কুণ্ডের জল চিক্‌চিক্ করছিল। তখন রাত কত হবে জানিনা,

এমন সময় একটা গোঙানির শব্দ হলো। দ্বিতীয়বার শব্দটা শোনার পরই বুঝতে পারলাম—বাঘটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কান্নার মত আওয়াজটা কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে গেল।

এরপর শূন্যে চাবুক মারলে যে রকম শব্দ হয়, সেই রকম ফটাস্-ফটাস্ শব্দ দু'বার হলো, আর সেই সঙ্গে কান্নার অস্পষ্ট একটা সুর। শব্দগুলো যে বাঘটাই করছিল, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। মাচায় ওঠার সময় বাঘটা তেড়ে এসে যখন গজরাচ্ছিল, তা শোনার পর আর কোন প্রাণী যে সে তল্লাটে ছিল না; তা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। সমস্ত রাতের মধ্যে এক বাঘটা ছাড়া আর কোন প্রাণীর শব্দ আমরা পাইনি। ফাটলটা যদি বাঘটার আস্তানা হয় তাহলে তো কথাই নেই।

ভয়ঙ্কর বাঘটার ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখার পর রাত্রে মধ্যে মধ্যে তার ভেসে আসা কান্নার শব্দ শুনে মনটা কেমন ছোট হয়ে যেতে লাগলো, নিজেকে অপরাধী বলে বোধ হলো। বাঘটা যখন তেড়ে এল তখন গভীর আতঙ্কের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল যেন-তেন-প্রকারেণ তাকে খতম করার সঙ্কল্প, কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে থেকে থেকে তার যন্ত্রণা-মিশ্রিত অসহায় কান্না সহ্য করতে পারছিলাম না। চুপি চুপি ফাটলটার মুখে গিয়ে পর পর কয়েক রাউণ্ড গুলি ছোঁড়বার বাসনা মনেই রয়ে গেল। কামনা করতে লাগলাম বাঘটা যদি তৃষ্ণার্ত হয়ে কুণ্ডের জল খেতে আসে, তা'হলেই আমি ওর যন্ত্রণার লাঘব করতে পারি। যদি ও সারারাত কাঁদে তবুও আমি ফাটলটার মুখে যেতে পারবো না। মাত্র চার-পাঁচ ফুট নিচে অতর্কিতে যে ভয়াবহ গর্জন শুনেছি, সেই বিকট চেহারার প্রতিচ্ছবি আমার মনে এত গভীর দাগ কেটেছিল, যে আমি ভুলতে পারছিলাম না। আমার মমত্ববোধ, সৎ-সাহস বলতে কিছু আর তখন ছিল না। ফাটলটার মধ্যে আহত বাঘ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, আর আমি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় নিঃশব্দে নিষ্ক্রিয় হয়ে মাচায় বসে রইলুম।

দুর্বলেরা তো চিরকালই কাঁদে, কিন্তু কোন দুর্জয়, দুঃসাহসী, শক্তিমান যখন কাঁদে—সে কান্না বড় হৃদয়বিদারক। মাচার নিরাপত্তার মধ্যে বসে আমি মাত্র কয়েকবার দাঁতে দাঁত দিয়ে সেই নিষ্পেষিত যন্ত্রণার অস্ফুট গোঙানি শুনেছিলাম। কী ভাবে এর প্রায়শ্চিত্ত করবো তার কুল-কিনারা খুঁজে না পেয়ে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলাম সারারাত…।

ভোর হয়ে গেল। বাঘটা সেই যে চুপ হয়ে গিয়েছিল আর কোন সাড়া দেয়নি। ধীরে ধীরে সূর্যের আলো পাহাড়ের মাথায় ছড়িয়ে পড়লো। আমি

আরও এক ঘণ্টা মাচায় অপেক্ষা করে তারপর নেমে পড়লাম।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে আবার ফিরে এলাম মাচায়, যদি বাঘটা তৃষ্ণার্ত হয়ে জল খেতে বেরোয়। সারারাত বসে বসে কাটিয়েছিলাম, বাঘটা এল না। কোন শব্দ নেই, কান্নাও আর শোনা গেল না। তারপর পরপর আরও দুটি রাত মাচায় এসে বসলাম, বাঘটার আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। জানিনা বাঘটার কী হলো…!

ফিরে আসবার সময় গঙ্গার হাতে আমার ঠিকানা লেখা একখানা পোষ্টকার্ড দিয়ে বলেছিলাম—বাঘটার যদি কোন খবর পাওয়া যায়, তাহলে আমায় যেন তৎক্ষণাৎ জানাতে ভুল না হয়। তারপর অনেকদিন হয়ে গেল, গঙ্গার কোন খবর আসেনি। বাঘটা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে হয়তো তিল্‌-তিল্‌ করে মরে রয়েছে ফাটলটার মধ্যে। নিরস্ত্র গঙ্গার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

৪৫০।৪০০ রাইফেলের প্রচণ্ড মার খেয়েও যদি বাঘটার জখম সেরে ওঠে, তাহলে ওকে মানুষখেকো হতেই হবে। বন্য পশু ধরবার ক্ষমতা যে ওর ছিল না, সেটা বোঝা গিয়েছিল যখন ও আমাকে কয়েকটা গর্জন শুনিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফাটলটায় আবার ফিরে যাচ্ছিল। একটা শান্তনিরীহ গ্রামে একটা মানুষখেকোর আবির্ভাব ঘটলে যে নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা হতো সেকথা চিন্তা করতেও ভয় পায়। অথচ আহত বাঘটা তো আর উপোস্‌ করতে পারে না! সেই দুশ্চিন্তায় একমাস আমি যথেষ্ট উদ্বেগ নিয়ে কাটিয়েছিলাম। গঙ্গার চিঠি না পেয়ে, আর পূরণাগড়ে মানুষখেকোর উৎপাত হয়নি শুনে নিশ্চিত হওয়া গেল। বাঘটা যে ভাবেই মারা যাক্‌ মানুষখেকো হয়নি, সেইটুকুই আমার সান্ত্বনা। তবু আমি অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে লিখছি—বাঘটা যন্ত্রণা নিয়েই ফাটলটার মধ্যে মারা পড়েছে, কারণ শিকারীর অমোঘ-বিধান আমি পালন করতে পারিনি —Shoot to kill!

বালিমেলার-নরখাদক

উড়িষ্যা রাজ্যের কোরাপুট জেলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমানার শেষ অংশ— যেখানে অন্ধ্রপ্রদেশের সীমানা এসে মিশেছে, সেই সংযোগস্থলের বিস্তৃত পাহাড়ী এলাকা গভীর বনে আচ্ছন্ন। কোরাপুটের রাজধানী জে'পুর থেকে এই বনের দূরত্ব প্রায় আশি-নব্বই মাইল। রাজধানী থেকে মাল্কান্-গিরি পর্যন্ত যানবাহন চলাচলের উপযোগী একটা রাস্তা আছে। পূর্ব-পাকিস্থান (বাংলাদেশ) থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য মালকান্-গিরিতে একটা শিবির খোলা হচ্ছিল এবং তাদের তদ্বির-তদারকের জন্য যেসব সরকারী অফিস ও কনট্রাক্টরদের চেষ্টায় যেভাবে দোকান-পসার বৃদ্ধি পাচ্ছিল, সেই সুবাদে মালকান্-গিরির পুরনো পরিত্যক্ত পথটা আবার সরগম্ হয়ে উঠেছিল। ঘন-ঘন জীপ ও মালবাহী লরীগুলো গোঁ-গোঁ করে পথের ধুলো উড়িয়ে ছুটতো মালকানগিরি অভিমুখে।

মালকান্-গিরির বন-জঙ্গল সাফ করে উদ্বাস্তুদের জন্য যে কলোনী করা হয়েছিল, তার পঁচিশ মাইল দূরে এক পাহাড়ী নদী বোধয়ের জংলা উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বালিমেলার জঙ্গল পাশে রেখে নিম্ন উপত্যকায় নেমে এসেছে। সারা বছর—এমন কি গ্রীষ্মের প্রখরতম দিনেও এই স্রোতস্বিনীর জল বরফের মত ঠাণ্ডা। ঐ অঞ্চলের বনে-পাহাড়ে যেসব ছোট ছোট নদী আর ঝরণা আছে, প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে তার তীরে অসংখ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ আকাশে মাথা তুলে রয়েছে। লম্বা লম্বা গাছগুলোর নিচের আবহাওয়া সাঁৎ-সাঁ্যাতে, আলো সেখানে বিশেষ প্রবেশ করে না। নিবিড় বনাঞ্চল প্রায় মানুষের অগম্য, কারণ—বর্ষার প্রাচুর্যে ঘনসন্নিবদ্ধ ঝোপ-ঝাড়ে বছরের প্রায় সব সময়ই ওই এলাকা ভরাট হয়ে থাকে।

কথিত আছে—বানর-রাজ বালির একটি রম্যকানন ছিল এই এলাকায়— সম্ভবতঃ শ্বাপদসঙ্কুল বালিমেলার অরণ্যই সেই রম্য-কানন। বালিমেলার জঙ্গল যেমন ভয়াবহ—তেমনি মনোরম। পনেরো বছর আগে আমি যখন এখানে আসি, তখন বালিমেলার জঙ্গলে ঢুকতে কেউ সাহস পেত না। এখানকার পাহাড়ে বাস করে ভয়ঙ্কর শঙ্খচূড় সাপ। দৈর্ঘ্যে এরা পনেরো-ষোল-ফুটেরও বেশী লম্বা হয়। গায়ের রং শ্যাওলা-সবুজ তার উপর হালকা হলুদ রং-এর চাকা-

চাকা দাগ। অত্যন্ত দ্রুতগতি। ছোটখাট কুলোর মত ফণা বিস্তার করে যখন উঠে দাঁড়ায়—তার উচ্চতা চার-পাঁচ ফুটের মত। এর বিষের তীব্রতা এত বেশী, যে দংশন করলে হাতির মত প্রাণীও আধ-ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

গভীর রাত্রে এরা দলবদ্ধ হয়ে জল পান করতে যায়, অন্য জাতের সাপ এদের ভক্ষ্য। শোনা যায় শঙ্খচূড় এত হিংস্র—দেখা মাত্রই আক্রমন করে বসে। বালিমেলার দ্বিতীয় ভয়াবহ প্রাণী হলো—বন্য-মহিষ। এক 'খরিয়া-ষ্টেট' ছাড়া এ অঞ্চলের আর কোথাও বন্য মহিষের সন্ধান পাওয়া যায় না। যেমন বিশাল, তেমনি ভয়ঙ্কর এদের আকৃতি। স্বভাব অত্যন্ত উগ্র। শোনা যায়—দেখা মাত্রই এরা বিস্ময়কর বেগে তেড়ে আসে, অতবড় শরীর সত্ত্বেও এদের আক্রমণে বিদ্যুতের গতি। এ-ছাড়া তৃণভূমিতে প্রচুর চিতল-হরিণ চরে বেড়াত, ছোট ছোট কোট্রা হরিণ নদীর ধারে হালকা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, বুনো-শুয়োর মাটি খুঁড়ে বেড়াত সারারাত। সম্বরের গভীর শব্দ শোনা যেত যখন তারা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নেমে আসতো সমতল ভূমিতে খাদ্যের সন্ধানে। এখানে সর্বত্র কালো ভালুক দেখা যেত, এমন কি মালকান্-গিরির আশেপাশেও তাদের পায়ের ছাপ পাওয়া যেত যখন আম পাক্‌তো। বাঘ বা চিতাবাঘের দেখাও মিলত। তাছাড়া—বন-মুরগী, তিতির আর ময়ুরের ডাক নিয়মিত শোনা যেত।

এহেন অরণ্য এলাকায় ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি এক চিতাবাঘের আবির্ভাব হয়। বাঘটা জঙ্গলের সাধারণ মাপের মত নয়—ঘন জঙ্গলের বিরাটাকৃতির এক প্যান্থার। ওর শারীরিক অক্ষততার মধ্যে ছিল—ক্ষয়ে যাওয়া চারটে কুকুরের দাঁত, উপর আর নীচের একটা করে দাঁত ভাঙ্গা, আর বাকি দুটো ক্ষয়ে অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে—বনের জীবজন্তু ধরা কঠিন হয়ে পড়েছিল। শারীরিক এই অক্ষমতার জন্যই বোধহয় নর-মাংসের প্রতি তার আসক্তি জন্মায়। হঠাৎ কোথা থেকে বাঘটা এসে হাজির হলো, কেউ বুঝতে পারলো না। কাছে-পিঠে কোথাও বাঘের উপদ্রব শুরু হয়েছে—এমন গুজবও শোনা যায় নি। বালিমেলায় নরখাদক বাঘের উপদ্রব এই প্রথম, সুতরাং গ্রামবাসীরা নরখাদক সম্বন্ধে মোটেই সতর্ক ছিল না।

বালিমেলার জঙ্গলে তখন কোন ঠিকাদার আসতো না, ফলে ঘন বাঁশ-ঝাড়ে এলাকাটা প্রায় ছেয়ে গিয়েছিল। বিকাল পাঁচটার সময় একজন নদীর ধারে বাঁশ কেটে ফিরছিল, এমন সময় বাঘটা তাকে আক্রমণ করে। লম্বা বাঁশটার পত্রবহুল ডাল-পালার জন্য বাঘটা তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলতে পারলো না। লোকটি মারাত্মক জখম নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে এপারে পালিয়ে এল। তারপর

ছ'মাস পরে তার অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হয়। এর একহপ্তা পরে বাঘটা মালকান্-গিরির জঙ্গল সংলগ্ন এক গ্রামে হানা দিয়ে একজনকে হত্যা করে, এবং এক বছরের মধ্যে মোট সাত জনকে আক্রমণ করে। এদের মধ্যে মোট তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। ছ'জনকে সম্পূর্ণ উদরস্থ করে, আর বাকি ছ'জন জখমের দাগ নিয়ে তখনও বেঁচে ছিল।

বালিমেলার ছোট ছোট গ্রামগুলিতে তখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো, জঙ্গলের পথে কেউ আর একা যেতে সাহস করতো না। মর্মান্তিক ঘটনাগুলো কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মালকান্-গিরির বন-বিভাগের কয়েকজন সাহসী লোক কনট্রাক্টরদের গাড়ী নিয়ে বাঘটাকে মারবার জন্য বালিমেলায় উপস্থিত হন। পাহাড়ী নদীটা পার হওয়ার জায়গায়, বড় বড় নুড়ি বিছানো ছিল। জল সেখানে এক হাঁটুর মত। ভারী ট্রাক্‌টা নদী পার হওয়ার জন্য যখন নুড়িগুলোর উপর দিয়ে ধীরে ধীরে যাচ্ছিল, তখন দৈবাৎ পিছনের একটা চাকা পিছলে নদীগর্ভে পড়ে যায় ফলে ট্রাকটা ওখানেই আটকে রইলো, যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ট্রাকটাকে তোলা গেল না। বেলা যখন পাঁচটা বন-বিভাগের কর্মচারীরা মালকান্-গিরিতে ফিরে আসবার মতলব করলেন। এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়লো বাঘটা একটা ঝোপের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছে। লোকটি তৎক্ষণাৎ 'বাঘ' বলে চিৎকার করে উঠতেই বাঘটা সরে গেল। লোকগুলি তখন ভয় পেয়ে গন্তব্যস্থলে লক্ষ্য করে দ্রুতবেগে পা চালিয়ে দিলেন। ট্রাকটা ওই-ভাবেই পড়ে রইলো। যে বাঘটাকে মারতে এসে ওদের অভিযানে বাধা পড়লো—ট্রাকটা নদীগর্ভে পড়ে যাওয়ায়, বাঘটার দেখা পেয়েও আসন্ন-সন্ধ্যায় বালিমেলার মত জঙ্গলে প্রবেশ করতে কেউ সাহস পেল না। মালকান্-গিরির পথে দ্রুত হাঁটা দিলেন। ট্রাকটা সারা রাতের মত ওখানেই পড়ে রইলো।

পরের দিন আর একটা ট্রাকে চেপে শিকারীরা নদীর ধারে উপস্থিত হলেন। প্রথম ট্রাকটাকে দড়ি বেঁধে যখন টেনে তোলা হলো, তখন বেলা ছ'টো। ট্রাক দুটোকে পথের উপর রেখে ওরা বিশ্রাম করতে করতে স্থির করলেন, ছোট ছোট বীট করে বাঘটাকে মারবেন। আধ-ঘন্টার মধ্যেই নদীর ধারের জঙ্গল ঘিরে বীট্ শুরু হলো—প্রথম ছ'টি বীট্ যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও বাঘটার সন্ধান পাওয়া গেল না। একটা প্রকাণ্ড মাদী-সম্বর বীটে ধরা পড়ে দিশেহারার মত ছোটাছুটি করে শেষ পর্যন্ত পিছনের পাহাড়টায় পালাতে সক্ষম হয়েছিল। তৃতীয় বা শেষ বীট্‌টা শেষ হতে অনেক দেরী হয়ে গেল। বীট্ যখন শেষ হলো, তখন বেলা পাঁচটা বেজে গেছে। এ বীটেও বাঘটাকে পাওয়া যায়নি, তবে একটা হরিণ

মারা পড়েছিল।

হরিণটা বাঁশে ঝুলিয়ে শিকারীরা যখন নদীর ধারে এসে পৌঁছলেন, তখন সূর্য পাহাড়ের আড়ালে নেমে গেছে। ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখী বাসায় ফিরে এসে উচ্চ কলরব করছিল। এমন সময় শিকারীরা নদী পার হতে লাগলেন। অবশেষে যারা মরা হরিণটা কাঁধে ঝুলিয়ে আসছিল, তাদের পিছনে ছিল একজন গ্রামবাসী। তার একহাতে একটা টাঙ্গি, আর অপর হাতে ছিল কাগজের একটা প্যাকেট। লোকটা নদীর ধারে এসে একটা শব্দ শুনলো, তখন সেখান থেকে পিছন ফিরে দেখতে গেল শব্দটা কিসের।

লোকটি যেই পিছন ফিরেছে, অমনি বাঘটা বিদ্যুৎগতিতে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো। যারা হরিণ নিয়ে আসছিল—চিৎকার করে উঠতেই শিকারীরা দেখলেন, বাঘটা মানুষটাকে মুখে তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলে ঢুকে গেল। তখন খুব তাড়াতাড়ি ট্রাকদুটি ঘুরিয়ে মালকান্-গিরির দিকে চালিয়ে নেওয়া হলো। পরের দিন সকালের আগে আর দলবল নিয়ে লোকটির সন্ধানে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্থল থেকে প্রায় একশো গজ দূরের একটা গাছতলায় হতভাগ্যের ভুক্তাবশেষ পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে রক্তমাখা একখানা মোটা, আধ ময়লা ধুতি ও লাল রংয়ের গামছা। টাঙ্গিটা পাওয়া গিয়েছিল নদীর ধারে, যেখানে বাঘটা ওকে আক্রমণ করেছিল। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর নদীর ধারে এসে বন্দুক থেকে প্রায় গুলি ছোঁড়া হতো, ফলে কিছু কালের জন্য বাঘটাকে আর ও অঞ্চলে দেখা যায়নি। হত্যাকাণ্ডের নতুন খবর আর না আসায় গ্রাম-বাসীদের আশঙ্কাও দূরীভূত হলো।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যায় থালার মত বড় চাঁদ উঠলো। পূর্ণিমার আলোয় দেখা গেল, এক স্ফূর্তিবাজ ছোকরা মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে গরুর গাড়ী হাঁকিয়ে আসছে। তার গন্তব্যস্থান মালকান্-গিরি—সেখান থেকে দু'মাইলের মধ্যে। বিস্তৃত মাঠ আর ঝোপ-ঝাড়গুলোর উপর চাঁদের আলো ছড়িয়ে ছিল, ছোকরা-গাড়োয়ানের গানের সুর তার উপর দিয়ে ভেসে ভেসে যাচ্ছিল গ্রামের দিকে।

এ হেন সময় গাড়োয়ানের গান হঠাৎ থেমে গেল। গাড়ীর পিছন দিকে কি একটা ভারি জিনিস ধপ্ করে পড়ায় গাড়োয়ান গান থামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে সবিস্ময়ে দেখলো, একটা বাঘ তার পিছনে গাড়ীর উপর বসে আছে। বলদদুটো তখনও কিছু টের পায়নি। বাঘটা বিনি পয়সার সওয়ার হয়ে কিছুটা পথ এল।

তারপর গুঁড়ি মেরে এগুতে লাগলো গাড়োয়ানের দিকে। ছোক্‌রার সব স্ফূর্তি তখন উবে গেছে, নিদারুণ ভয়ে হাঁ হয়ে সেই আশ্চর্য ব্যাপার দেখছিল। বাঘটা বীভৎস মুখ ব্যাদনকরে এগিয়েআসতেই গাড়োয়ানভয়ে গোঁ গোঁ করে উঠলো, আর কাঁপা হাতে চাবুকটা শূন্যে আছড়াতে লাগলো।

চাবুকটার সপাং-সপাং আওয়াজটা হতেই বাঘটা যেন ক্ষেপে গেল, তারপর ভয়ঙ্কর গর্‌-গর্‌ শব্দকরতে করতেসামান্য ব্যবধানটুকু দ্রুত পার হয়ে গলা কামড়ে ধরলো। বাঘটা শব্দ করতেই বলদ দুটো খুব ভয় পেয়ে গাড়ীটা নিয়ে ঘটাং ঘটাং শব্দ করতে করতে এলোপাথাড়ি ছুটতে লাগলো। শেষে রাস্তা ছেড়ে একটা মাঠে নেমে পড়লো, ছোট ছোট কয়েকটা 'আল্‌' পার হয়ে একটা বড় আল্‌ আর পার হতে পারলো না—সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

সমস্ত ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত আরএমন আকস্মিকভাবে ঘটে গেল,যে পাশের গ্রামের লোকেরা পর্যন্ত কিছু টের পেল না। গরুর গাড়ীর টেনে-হিঁচড়ে ছোটার শব্দ অবশ্য কেউ কেউ শুনতে পেয়েছিল। তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। কারণ এমন চমৎকার জ্যোৎস্না-রাতে ছোক্‌রা যে খুব মেজাজে গাড়ী চালাচ্ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। গাড়ীটা সারারাত মাঠে দাঁড়িয়ে রইলো। সকালবেলায় গ্রামবাসীরা গাড়ীটাকে ওইভাবে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারলো, এ সেই বেহেড্‌ ছোকরার কীর্তি—গতরাত্রে যে চাঁদের আলোয় গান গেয়ে যাচ্ছিল। ওদের মধ্যে একজন গাড়ীটাকে রাস্তার ধারে একটা গাছতলায় রেখে বলদ দু'টোর কাঁধ থেকে জোয়ালটা খুলে দিল।

ছোকরা গাড়োয়ানের অনুপস্থিতি কারুর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলো না। পরের দিন সকালেও গাড়ীটার সন্ধানে কেউ এল না। বলদদুটো একভাবে বাঁধা আছে দেখে ব্যাপরেটা ওদের কাছে কিছু অস্বাভাবিক বলে মনে হলো। তখন খোঁজ-খবর করা হলো। ছোকরার দাদা এসে বলদদুটো ও গাড়ীটাকে সনাক্ত করলো। কিন্তু ছোকরা গাড়োয়ানের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না।

এরপর ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করা হলো, তখন একদল লোক স্বেচ্ছায় অনুসন্ধানে বেরুলো। গাড়ীটা যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে প্রায় এক ফার্লং পিছনে পথের ধারে একটা পরিষ্কার ঘষড়ানো দাগ সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হলো। সেই সূত্র ধরে বনের ধারে এক জায়গায় রক্তের মত একটা দাগ দেখা গেল। ঐ দাগ ধরে এগুতেই পাওয়া গেল গাড়োয়ানের পরণের কাপড়ের একটা অংশ। এমন সময় একটা দুর্গন্ধ নাকে আসতেই গ্রামবাসীরা এগিয়ে গিয়ে দেখলো—রক্তমাখা নাড়ি-ভুঁড়ির একটা দ'লা পড়ে রয়েছে, আর তার সঙ্গে

কাপড়ের ছেঁড়া-ছেঁড়া কতকগুলো টুকরো।

এতেই প্রমাণ হয় যে, হারানো গাড়োয়ানকে বাঘেই খেয়েছে। তবু শক্ত মাটিতে বাঘের পায়ের ছাপ কোথাও পাওয়া গেল না। তাছাড়া বাঘটা অনেকদিন এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়ায় অনেকের মনে সন্দেহ হলো—নাড়ি-ভুঁড়ির শুকনো দলাটা গাড়োয়ানের নয়। যাই হোক—গাড়োয়ানের অন্তর্ধান নিয়ে অনেক দ্বিমত হলেও, তার সন্ধান তখনও পাওয়া যায়নি।

যারা বাঘটাকে দায়ী করলো—তাদের অভিমত, বাঘটা এখান থেকে পালিয়ে বৌধয়ের পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর সেখানকার শিকারীদের তাড়া খেয়ে আবার ফিরে এসেছে। নির্জন রাস্তায় গাড়োয়ানের গান শুনে মাঠ পেরিয়ে এসে ওকে আক্রমণ করে হত্যা করে। তারপর জঙ্গলে টেনে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে। আর যারা এটা বাঘের কীর্তি নয় বলে সন্দেহ করেছে, তাদের বক্তব্য—কাক্-জ্যোৎস্নার রাত্রে বনের ধারে পরীরা এসে খেলা করে, তখন যদি কেউ সেখানে দৈবাৎ এসে পড়ে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যদি সেই ব্যক্তি সুন্দর আর জোয়ান মরদ হয়, তাহলে পরীরা কখনওকখনও তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। ছোক্‌রা গাড়োয়ানের গানের গলাটি বেশ চমৎকার—পরীরা ওর গান শুনে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। ও আর কোনদিনই ফিরবে না। যদি ফেরে—বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে, কাউকে বলতে পারবে না পরীদের কথা। বলতে ভুলে গেছি, গাড়োয়ানের দেহাবশেষের কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি, সে উন্মাদ হয়েও ফিরে আসেনি, কোন জ্যোৎস্নারাতে গান গেয়ে মালকান্-গিরির পথে আর গাড়ীও হাঁকায়নি……। জানিনা কবে তার পরীদের গান শোনান শেষ হবে। আমি যখন মালকান্-গিরিতে এসে বাঘটার খোঁজখবর করছিলাম, সেই সময় গাড়োয়ানের দাদা চুপি-চুপি 'একদিন' জিজ্ঞাসা করেছিল—পরীদের কথা আমি কিছু জানি কিনা!

আমার বন্ধু বলরামবাবুর ভাই শ্যামবাবু আর হাবুলবাবু তখন দণ্ডকারণ্যে কাজ করছিলেন। আমি, প্রবীর ও বলরামবাবুর সঙ্গে জে'পুরে ওদের কোয়ার্টারে এসে উঠলাম, এবং সেখান থেকেই মালকান্-গিরিতে আসা-যাওয়া করছিলাম। যে বাঘটার গল্প আমি এতক্ষণ ধরে শোনাচ্ছি, জে'পুরের ফরেষ্ট অফিসে গিয়ে বাঘটাকে মারবার অনুমতি চাইলাম। ফরেষ্ট অফিস থেকে নরখাদকটার সম্বন্ধে কোন তথ্যই সংগ্রহ করা গেল না। জনৈক কর্মচারী দয়া করে জানালেন—অনেকদিন আগে অবশ্য এক বাঘের উপদ্রবের কথা শোনা গিয়েছিল, বাঘটাকে তো তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের এই

নমুনা দেখে আমি সুযোগ পেলেই মালকান্-গিরিতে এসে হাজির হতাম, এবং ঘুরে ঘুরে বাঘটার গল্প শুনতাম। আর বাঘটাকে কিভাবে মারা যায় তার ফন্দী খুঁজতাম।

আমার ধারণা হলো—বালিমেলার জঙ্গলে জীপ নিয়ে ঘুরলেই বাঘটার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। নদী পেরিয়ে বাঘটা সব সময় এপারে থাকে না, গাড়োয়ানকে বাঘেই ধরুক বা পরীতেই ধরুক—মোট কথা তার হঠাৎ অন্তর্ধানের পর একটা সন্ত্রাসের ভাব দেখা দিয়েছিল। সূর্যাস্তের পর থেকেই গ্রামবাসীরা একটু বেশী সতর্ক সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো, গ্রামের মাঝে বা বাড়ীর উঠানে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে রাখা হত।

বাঘটা ঘন জঙ্গলের প্যান্থার বলেই হোক বা বুড়ো হওয়ার দরুণই হোক, মোটেই দুঃসাহসী নয়; বরং চিতার স্বাভাবিক ভীরুতা নিয়েই অন্ধকারের আড়ালে আত্মগোপন করে বেড়াত। গ্রামবাসীরা সতর্ক হওয়ায় শিকার ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলো। তখন বুড়ো বাঘটা বালিমেলা-জঙ্গলের কোট্‌রা আর খরগোস্ ধরে খেতে লাগলো।

নদীর ধারে একটা পরিত্যক্ত পাতার ঘরে বসেছিলাম। সূর্যাস্ত থেকেই প্রচুর উদ্বেগের সঙ্গে সময় কাটতে লাগলো। পাখীর ডাক থেমে যেতেই দিনের শেষ শব্দ মিলিয়ে গেল, তখন ধূসর অন্ধকার আর মৃত্যুর স্তব্ধতা যেন এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল নির্জন নদী তীরে। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, আবছাভাবেও কিছু দেখা যাচ্ছিল না, রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে নদীর ওপারে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। সময় এগিয়ে চললো, একে একে তারার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদের আলোয় ওপারের বন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠলো।

সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত প্রতীক্ষার কোন ফল পেলুল না। বাঘটা খিদের তাড়নায় নদী সাঁতরে এপারে মানুষ ধরতে এল না, বনের অন্য কোন জীবজন্তু ডাকলো না, এমন কি বনের মধ্যে জন্তু চলাচলের এতটুকু আভাস পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অত্যন্ত একঘেঁয়ে বোধ হতে লাগলো। সময় যেন আর কাটতে চায় না। এমন সময় সম্পূর্ণ নিঃশব্দে, খুব সন্তর্পণে, সতর্ক পা ফেলে ফেলে একটা কোট্‌রা হরিণ নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড হরিণটা মুখ ফিরিয়ে পিছনের বনটাকে লক্ষ্য করলো, তারপর তড়বড় করে নদী পেরিয়ে এপারে এসে উঠলো। পাতাঘরের দেওয়ালটা আড়াল পড়ায় ভয়ার্ত হরিণটাকে আর দেখতে পেলুম না। হরিণটা নিশ্চয়ই কোন মাংসাশী

প্রাণী দেখেছে, তা না হলে এভাবে নদী পেরিয়ে আসতো না। এখন সেই মাংসাশী প্রাণীটা নরখাদক বাঘটাও হতে পারে ভেবে আমি রাইফেলটা তুলে ধরলাম।

আধ ঘণ্টার উপর আমি রাইফেলটা তুলে বসেছিলাম, বাঘটা পাতার আড়াল থেকে ফাঁকায় বেরিয়ে এল না। বাঘটা তখন কোথায় ছিল তারও কোন হদিস পেলাম না, তবুও আমি নিশ্চিত হতে পারলাম না। হরিণটার চাল-চলন দেখে বুঝেছিলাম—বাঘটা কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে বসে রয়েছে। বুড়ো বাঘটার দিনকাল ভাল যাচ্ছিল না. দাঁতের তীক্ষ্ণতা হারিয়ে বনের পশু হত্যা করবার ক্ষমতা বিশেষ ছিল না। বেচারা নরখাদক হয়েও সাহসের অভাবে অনশনে দিন কাটাচ্ছিল। কোটরা হরিণটা ওর নাগাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় হয়তো আর কোন শিকার ধরবার আশায় নিঃশব্দে ওৎ পেতে রয়েছে।

এমন সময় একটা খরগোস লাফাতে লাফাতে নদীর ধারে এসে ঘাসের ডগা শুঁকতে লাগলো। খরগোসটা নাক কুঁচ্‌কে ঘাসের ডগাগুলো শুঁকে-শুঁকে পরীক্ষা করছিল—সেগুলো খাওয়া চলবে কি-না। তখন কি কারণে জানি না, হঠাৎ ভয় পেয়ে খরগোসটা কয়েকটা দ্রুত লাফে জঙ্গলের একেবারে কিনারায় চলে গেল। তারপর সেখানে মিনিট খানেক অপেক্ষা করে জঙ্গলের মধ্যে যেই ঢুকেছে—অমনি একটা খস্‌খসানির শব্দ হলো। ঝুপ্‌-ঝুপ্‌ করে কী যেন একটা ছুটে গেল, তারপরেই 'চ্যাক' করে খরগোসটার একটা আর্ত চীৎকার ভেসে এল। খরগোসটা ছটফট করে ঝোপটার ডাল-পালার উপর হাত-পা ছুঁড়তেই বনটা দুলে উঠলো। সামান্য একটু হুটোপাটীর পর আবার সব স্তব্ধ হয়ে গেল। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় জঙ্গলের সেই ক্ষুদ্র বিয়োগান্ত নাটকটি নিঃশব্দে বসে বসে দেখে অনুমান করতে পারলাম, ক্ষুধার্ত বুড়ো বাঘটা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সামান্য কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করতে পেরেছে।

এরপর যা আশা করে আমি রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে উন্মুখ হয়ে রইলুম, সে কি আমার একান্ত দুরাশা! আমার মত যাঁরা রাইফেল ঘাড়ে নিয়ে খেয়ালের বশেই বলুন, বা সখ মেটাবার জন্যই বলুন—বনে জঙ্গলে দিন-রাত ঘুরে বেড়ান, নাওয়া-খাওয়ার কথা মনে থাকে না, জঙ্গলই ধ্যান-জ্ঞান হয়ে পড়ে; তাঁদের নিশ্চয়ই জানা আছে—মাংসাশী প্রাণীরা শিকার ধরবার পর জল খেতে আসে। খাওয়া গুরুপাক হলে ঘন ঘন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলাশয়ে ছুটে যায়।

আমিও আশা করলাম—খরগোসের সামান্য মাংসটুকু উদরস্থ করে বাঘটা নিশ্চয়ই নদীতে জল খেতে আসবে। তখন জঙ্গলের প্রতিটি শব্দ আমি কান পেতে শুনতে লাগলাম, এমন কি নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দেও চমকে চমকে উঠতে লাগলুম। জানি—নরম ঘাসের উপর দিয়ে বাঘটা যখন আসবে এতটুকুও শব্দ উঠবে না।

এমন সময় এক মহা-মুস্কিলে পড়লাম। নদীতে কতকগুলো ব্যাঙ-এর ঠিক তখনই খেলা করবার সময় হলো। ছলাৎ-ছলাৎ চক্‌চক্ প্রভৃতি শব্দ করে ব্যাঙ-গুলো জলের উপর ভেসে ভেসে খেলতে লাগলো। বাঘটা শব্দ করে জল খাচ্ছে ভেবে, যতদূর দৃষ্টি যায় তন্ন-তন্ন করে খুঁজে চোখ ব্যথা করে ফেললাম—তবুও বাঘটাকে দেখতে পেলুম না। খরগোসের মাংসটুকু খাওয়ার কত পরে বাঘটার তৃষ্ণার উদ্রেক হবে, সেই আশায় অপেক্ষা করতে করতে মধ্য-রাত পার হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ বাতাস উঠলো। কোথা থেকে কালো-কালো মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেললো। চাঁদ আর আকাশের তারাগুলো ঢাকা পড়ায় অন্ধকার অত্যন্ত গাঢ় হয়ে উঠলো। অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে উঠলো যে, বাঘটা তখন যদি একবার সামনে এসেও জল খেত, তবুও দেখতে পেতুম না। অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে বাঘটার আশা ত্যাগ করলাম। তারপর চালাঘরটার এককোণে সরে গিয়ে এতক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরালাম।

এরপর বাঘটার জন্য এক নতুন মতলব ঠিক করলাম, যার ফলে পূর্বের অস্বস্তির কিছুটা লাঘব হবে। রাত এগারটার সময় খাওয়াদাওয়া সেরে আমি, বলরামবাবু ও প্রবীরকে নিয়ে মালকানগিরির রাস্তায় নেমে এলাম। গ্রাম তখন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, কোথাও তখন এতটুকু আলো দেখা যাচ্ছিল না—সাড়াশব্দহীন নিশুতি রাত। গ্রামের কুকুরগুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে ঘুম-চোখে মুখ তুললো, তারপর 'ভুক্' করে একটা মৃদু আপত্তি তুলে আবার গুছিয়ে শুয়ে পড়লো। আমরা তিন মূর্তি চাঁদের আলোয় রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। প্রবীরের কাছে একটা মাউসারের ম্যাগাজিন রাইফেল ছিল—সেটাতে গুলি ভরা হলো। আমার দো-নলা বন্দুকটায় এল্. জি. গুলি ভরে বলরামবাবুর কাঁধে ঝুলিয়ে পাঁচ-সেলের টর্চটা ঠিক করে নিলেন। ৪৫০/৪০০ রাইফেলটা লোড্ করে আমি ওদের পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলাম। গাড়োয়ানকে যেখানে বাঘে ধরেছিল, সেখান থেকে এক মাইল রাস্তা আমরা কথা বলতে বলতে আনা-গোনা করে বাঘটার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। মতলবটা যদিও খুব বেয়াড়া ধরণের, তবুও সে ঝুঁকি নিতে আমার

সঙ্গীরা আপত্তি করেন নি। এছাড়া বাঘটাকে পাওয়ার আর কোন উপায় খুঁজে পেলুম না।

এমন ফুট্‌ফুটে চাঁদনী রাতে আমাদের নৈশবিহার অনেকেরই ঈর্ষার উদ্রেক করতো—যদি না মানুষখেকোটার প্রশ্ন থাকতো। তখন আর লুকোচুরির প্রশ্ন ছিল না, কেন না—আমরা খোলা রাস্তায় নেমে এসেছিলাম। অতএব মনের সুখে সিগারেট টানা আরম্ভ হয়ে গেল। আমরা বক্‌-বক্‌ করলে কী হবে, নজর ছিল মাঠের আল্‌ আর গ্রামের ধারের ইতস্ততঃ ছড়ান আগাছার উপর।

বাঘটা যদি গ্রামের দিক থেকে আসবার চেষ্টা করে, তাহলে আগাছাগুলোর আড়াল নেবে। আর মাঠের ওপাশ থেকে এলে, 'আলের' আড়ালে আড়ালে আসবে। যাই হোক—আমরা তিনমূর্তি সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে আর গল্প করতে করতে এক মাইল পথ অতিক্রম করে গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলাম। কিছুই ঘটলো না। পথের ধারে বসে অল্প একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার ফিরে চললুম। একটু একটু এগুচ্ছি আর টর্চের আলো ইতস্ততঃ ফেলছি। আমি সবার পিছনে ছিলাম বলে পিছনে দেখার দায়িত্ব আমার উপরই ছিল। এইভাবে দু'বার যাতায়াত করবার পর পথটা সংক্ষেপ করে আধ-মাইলে দাঁড় করান হলো। রাত-দুপুরে তিন মূর্তির ওইভাবে সিগারেট ফোঁকা আর গল্প করে বেড়ানর বাহার দেখলে, যে-কেউ আমাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করতো। ভাগ্যে গ্রামের কেউ আমাদের এই মতলবের কথাটা জানতো না, গ্রামবাসীরা তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

আগাছার ঝোপগুলো যেখানে পথের ধারে নেমে এসেছিল, সেইসব জায়গায় রাইফেলের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে আমরা খুব সন্তর্পণে পার হয়েই রাইফেল তুলে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াতাম। তারপর কয়েক পা পিছু হেঁটে আবার সোজা হয়ে অগ্রসর হতাম। মানুষখেকো খুব ধূর্ত হয়। পথের ধারে অনেক আগে থাকতে এসে ওৎপেতে থাকে। যদি পথিকের সংখ্যা একাধিক হয়—তাহলে দলটাকে নির্বিবাদে পার হতে দেয়। দলটি যখন বিপদের জায়গাটা পার হয়ে নিশ্চিন্ত মনে আবার হাঁটা আরম্ভ করে, তখন ধূর্ত বাঘ বিদ্যুৎ-বেগে পিছনের লোকটির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাত-আট বার পায়চারি করা সত্ত্বেও আমাদের সে রকম কিছু ঘটেনি। টর্চের আলোয় মাঠের উপর একবার একটা শিয়াল দেখেছিলাম মাত্র। রাত তিনটের পর সেই ভুতুড়ে নৈশ-বিহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বাঘটা নদী পেরিয়ে সে রাত্রেও গ্রামের দিকে

আসেনি।

মালকান্-গিরির অধিবাসীরা অত্যন্ত গরীব। ওদের কাছে এমন একটা বাড়তি ছাগলও ছিল না যে, বাঘটাকে টোপ্ দিই। বালিমেলার জঙ্গলে পায়ে হেঁটে ঢুকতেও সাহস হলো না—কী সংঘাতিক দুর্ভেদ্য জঙ্গল! ল্যাণ্টানার ঘন-ঝোপের আড়ালে বাঘের সন্ধান করা, বা গুলি করার আশা যে কত সুদূরপরাহত—তাও বুঝতে পারছিলাম। এ হেন পরিস্থিতিতে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। শেষ উপায় হলো—জীপ নিয়ে যদি সারারাত বালিমেলার জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান যায়।

জে'পুরে পৌঁছবার পরের দিন থেকেই জীপের চেষ্টা চলছিল। কিন্তু সে আশা ফলবতী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই তখন পর্যন্ত দেখা দেয়নি। হতাশ হয়ে ভাবছিলাম, বাঘটার জন্য আর কি করা যেতে পারে। এমন সময় হাবুলবাবু এলেন। সঙ্গে এক সর্দারজী। জে'পুর টাউনে সর্দারজীর একটা সোডা-ওয়াটারের ফ্যাক্টরী আছে। সর্দারজী পরিষ্কার বাংলায় বললেন—আপনাদের জীপের সমস্যা মিটিয়ে দেব, চলুন আমার সঙ্গে। আমরা তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে প্যালেসে এসে উঠলাম। সর্দারজী, কুমার সাহেবকে আমাদের কথা বলতে, কুমার সাহেব জানালেন—আমাদের কথা তিনি শুনেছেন। তবে কাজের চাপে আলাপ করা হয়ে ওঠেনি ইত্যাদি। যাই হোক—সেই সন্ধ্যায় বালিমেলার জঙ্গলে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত জীপে চেপে যাওয়া হবে শুনে—আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে ফিরে এলাম। সারাদিন কত যে টুকি-টাকি কাজ সারলাম, তার ইয়ত্তা নেই। বন্দুক-রাইফেলগুলোকেই বার-তিনেক পরিষ্কার করে ফেললাম।

সন্ধ্যার মুখে কুমার সাহেবের জীপ এসে গেল। ড্রাইভারের পাশে কুমার সাহেব বসে আছেন, আর পিছনের সীটে স্পট্-লাইটের সরঞ্জাম নিয়ে হাসি-মুখে বসেছিলেন সর্দারজী। আমরা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম, দশ মিনিটের মধ্যেই জীপ ষ্টার্ট করলো। মালকান্-গিরির পথের যে অংশটা গতরাত্রে আমরা তিন-মূর্তি টহল দিয়েছিলাম, সেখানে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত্রি পৌনে-আটটা। এখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে লাগলাম। সর্দারজীর স্পট্-লাইটের আলো কখনও ফাঁকা-মাঠের আল্‌গুলোর উপর দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিল, আবার কখনও বাঁ-দিকের আগাছার ঝোপগুলোর উপর দিয়ে ইতস্তত ঘুরছিল। আর গাড়ীর হেড-লাইটের আলো সামনের পথের বুক চিরে চলছে বালিমেলার দিকে। এইভাবে বাঘটার

সন্ধান করতে করতে আধ-ঘণ্টার পর নদীর তীরে এসে পৌঁছনো গেল। এক কাপ করে চা আর সিগারেট খেয়ে, দশ মিনিটের মধ্যে নদী পেরিয়ে বালিমেলার জঙ্গলে প্রবেশ করলাম।

জঙ্গলের মধ্যে অল্প একটু প্রবেশ করতেই, একটা ঝোপের নীচে সাদা মতন কী একটা চোখে পড়লো। কাছে এগিয়ে এসে আমরা গাড়ী থামাচ্ছি—এমন সময় একটা কোট্‌রা হরিণ ডেকে উঠলো। কোট্‌রাটা তিনবার ডেকেই থেমে গেল। সাদা মতন জিনিসটা খবরের কাগজে মোড়া একটা ছেঁড়া প্যাকেট। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া খানকয়েক রুটি ভাঁজ করা রয়েছে তাতে।

বন-বিভাগের কর্মচারীরা বীট্ করে ফেরবার সময় যে লোকটি বাঘটার কব্জলে পড়ে—রুটীর এই প্যাকেটটি তার সম্পত্তি। বাঘটা যখন তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল—রুটীর প্যাকেটটা তখনও তার শক্ত মুঠিতে ধরা ছিল। কোট্‌রাটা যেদিক থেকে ডেকেছিল, সেই দিকে গাড়ী ঘোরান হলো। খুব আস্তে আস্তে গাড়ীটা গড়িয়ে যেতে লাগলো। দু'পাশে দুর্ভেদ্য বন। বড় বড় গাছ থেকে অসংখ্য লতা-পাতার ঝুরি নেমে এসেছে। পথ কোন কোন জায়গায় এত সঙ্কীর্ণ যে, গাড়ীর চাকা গাছপালার উপর উঠে পড়ছিল। ফলে—ঘন পত্র-বহুল ডালপালায় গাড়ীটা ঢেকে যাচ্ছিল, আর কাঁটায় আমাদের জামা ছিঁড়ে যেতে লাগলো। গাড়ীর ওপর চেপে আসা ঘন-ঝোপগুলোর দুর্ভেদ্য বাধা কাটিয়ে স্পট্-লাইটের আলো এতটুকুও এগোচ্ছিল না। চোখের মসৃণ পাতাগুলো ঝক্‌মক্ করে ওঠায় আমাদের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ ব্যাহত হতে লাগলো। ফলে আমরা পরস্পরকে ছাড়া আর কিছুই তখন দেখতে পাচ্ছিলাম না।

শঙ্খচূড় সাপ, বুনো-মহিষ আর একটা মানুষখেকোর জঙ্গলে শিকারীর এ-হেন পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়! গাড়ীটা ধীরে ধীরে সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো, আর আমরা পরিণাম যাহাই হোক—পয়েন্ট-ব্ল্যাক ফায়ারের জন্য তৈরী হয়ে রইলুম। প্রায় চোদ্দ-পনেরো মিনিট সেই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করার পর গাড়ীটা একটু ফাঁকা মতন জায়গায় বেরিয়ে এসে দাঁড়াতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

খুব বোকার মত আমরা ক্ষুধার্ত মানুষখেকোটার শিকার হতে পারতুম, শঙ্খচূড় সাপ চার-পাঁচ ফুট উঁচুতে ফণা তুলে আমাদের মুখে খুব সহজেই ছোবল্ মারতে পারতো, আর বালিমেলার উগ্র-মেজাজের যে-কোন বন্য-মহিষ শিংয়ের

ঝট্‌কায় জীপ উল্টে দিয়ে পিষে মারতে পারতো। স্বীকার করতে কোন বাধা নেই, যে কাজটা খুব অর্বাচীনের মত করা হয়েছিল। কিন্তু বালিমেলার জঙ্গলে ঢুকতে হলে দুর্ভেদ্য এই আগাছার বনটা পার হতেই হবে। এর পরে বন যতই ভয়াবহ হোক, অমন দুর্ভেদ্য নয়। বড় বড় গাছপালার তলা দিয়ে আমাদের জীপ এঁকেবেঁকে চললো। স্পট্‌ করতে আর তেমন অসুবিধা দেখা দিল না।

জঙ্গলের প্রবেশের মুখে একটা কোট্‌রা হরিণের ডাক শুনেছিলাম। ফাঁকা মতন জায়গাটায় দেখলুম—তিনটে খরগোস লাফিয়ে লাফিয়ে স্পটের আলোর বাইরে চলে যাচ্ছে। বড বড় গাছগুলো পিছনে ফেলে একটা বড় টিলার ধারে আসতেই দশ বারোটা চিতল হরিণের চোখ জ্বলে উঠলো। এক ঝাঁক উজ্জ্বল তারার মত ওরা স্থির হয়ে ছিল। আমাদের জীপ যখন খুব কাছে এসে পড়লো তখন হতভম্ব হরিণগুলো লাইন দিয়ে চলা শুরু করলো। তারপর দ্রুত লাফ দিতে দিতে বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বালিমেলার জঙ্গলেই বাঘটাকে পাবো আশা করেছিলাম, কিন্তু জঙ্গলের রূপ দেখে সে আশা নির্মূল হয়ে গেল। পাহাড় আর গভীর জঙ্গলে কোথায় বাঘটা বসে আছে, স্পটের আলোয় খুঁজে বার করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ বলে মনে হলো। গাড়ীটা চলতে চলতে পাহাড়ের ধারে ঘাসে ছাওয়া একটা জমির উপর এসে পড়লো। আর সেখান থেকেই একটা কলধ্বনির শব্দে বুঝতে পারলাম—কোন পাহাড়ী নদীর ধারে এসে পড়েছি। রাত তখন দু'টো। ঘাসে ছাওয়া জমিটার দু'ধারেই বিরাটাকার বাঁশ-ঝাড় রয়েছে। রাশি-রাশি শুকনো বাঁশ পড়ে ছিল, পাতলা ছুঁচলো পাতাগুলো বাতাসে দুলে দুলে খস্ খস্ শব্দ করছিল। সেই বাঁশ-বন ভেদ করে যাওয়া অসম্ভব, তেমনি ঘাস বনটার উপর দিয়ে যাওয়াও সমান বিপদ-জনক—কোথায় গর্ত বা চোরা-পাথর রয়েছে বা শঙ্খচূড় ওৎপেতে রয়েছে কে জানে।

এ-হেন পরিস্থিতিতে আমরা গাড়ী ঘুরিয়ে পাহাডটার পিছন দিকে যাওয়ার মতলব করলাম। নদীর ধারে এই বনটায় কোন জীব-জন্তু চোখে পড়লো না। নদী আর বাঁশ-পাতার শব্দ ছাড়া আর অন্য কোন শব্দ নেই। শঙ্খচূড় সাপ আর বন্য-মহিষ এই অঞ্চলে থাকতে পারে—এই আশঙ্কা করে যথাসম্ভব দ্রুত অগ্রসর হতে হতে আমরা পাহাড়টার পিছনে এসে পড়লাম। বড় বড় পাথর আর বিক্ষিপ্ত ঝোপ-ঝাপে ভরা ঢালু মতন জায়গাটায় এসে স্পট্‌ ও গাড়ীর আলো নিভিয়ে আমরা পারামর্শ করতে বসলাম, এরপর কোন দিকে যাওয়া হবে।

তখন চাঁদের আলোয় এলাকাটা দিনের মত ঝক্ঝক্ করছিল। পাশের কালো পাহাড়ের গায়ে যেখানে যেখানে জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল—সেই জায়গাগুলোকে সাদা কুয়াশার মত দেখাচ্ছিল। বড় বড় পাথর আর ঝোপগুলোর যে ছায়া পড়েছিল, সেগুলোও অস্পষ্ট দেখা যেতে লাগলো। পাহাড়ের নীচে ঢালু জায়গাটায় বড় গাছ বিশেষ ছিল না। বুনো ফুল আর বন্‌জ লতা-পাতার মিশ্রিত সৌরভ নিয়ে যে মৃদু-মন্দ বাতাস পাহাড়ে এসে প্রতিহত হচ্ছিল, তাতে বাঁশ-পাতার সরসরানি ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না।

এ হেন শান্ত-সুন্দর পরিবেশে হঠাৎ বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল। একটা সম্বর ডাকতে ডাকতে তীব্রবেগে আমাদের জীপের পাশ দিয়ে চলে গেল। বন্দুক-রাইফেল তাড়াতাড়ি বাগিয়ে ধরতেই, একটা হরিণ প্রায় দুশো গজ দূরে হঠাৎ বিপদ-সূচক ডাক ডাকতে লাগলো। হরিণটা প্রায় এক মিনিট ধরে সেই ডাক ডেকে বনের আর সব প্রাণীদের হয়তো-বা আমাদেরও সতর্ক করে দিয়ে ফাঁকা মাঠটার উপর দিয়ে দৌড়তে লাগলো। চাঁদের আলোয় হরিণটাকে এক পলকের জন্য দেখা গেল—বনের অন্তরালে মিলিয়ে যাচ্ছে।

বিপদ সঙ্কেতগুলো শোনার পর উত্তেজনা চরমে উঠলো। চাঁদের আলোয় যে-কোন মুহূর্তে বাঘটার এগিয়ে আসা চোখে পড়বে ভেবে আমরা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে রইলাম। প্রায় দশ-বারো মিনিট ওইভাবে থাকার পর সর্দারজী উঠে দাঁড়িয়ে স্পট্-লাইটের আলো জ্বেলে দিল। পাহাড়ের কোল্ থেকে আলোটা সরাতে সরাতে যেই রাস্তা বরাবর ফেলা হয়েছে, অমনি কী একটা জানোয়ার সট্ করে একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

জন্তুটা যে বাঘ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না। ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করলাম—গাড়ীটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যেতে। গাড়ীটার স্টার্ট বন্ধ করা ছিল। নতুন করে স্টার্ট দিতে গিয়ে বেশ খানিকটা শব্দ হলো, দেরীও হলো। তারপর সামনের বড় বড় পাথর আর ঝোপগুলোর পাশ কাটিয়ে প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে বাঘটা যে পাথরের আড়ালে লুকিয়েছিল, তার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। এমন সময় স্পট্-লাইটের কানেক্শন খুলে যাওয়ায় হঠাৎ আলো নিভে গেল।

গাড়ীর হেড-লাইট দুটো জ্বলা সত্ত্বেও এক স্পটের অভাবে সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল। আমি ছিলাম বাঁ-দিকে ড্রাইভারের ঠিক পিছনের সীটে, বলরামবাবু ছিলেন কুমার সাহেব আর ড্রাইভারের মাঝখানে, আর প্রবীর পিছনের সীটের

ডানদিকে বসেছিল। আমার আর প্রবীরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সর্দারজী স্পট্ করছিল। আলো নিভে যেতেই 'সত্তানাশ হুয়া' বলে ধপ্ করে বসে পড়লো। আমি পাথরটার উপর থেকে চোখ না সরিয়েই বলতে গেলাম—পাঁচ সেল টর্চ— তার পূর্বেই বাঘটা হঠাৎ পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ীর মুখোমুখি দাঁড়াল। হেডলাইটে ওর চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করে উঠলো। তাড়াতাড়ি রাইফেলটা তুলতেই নলটা ড্রাইভারের মাথায় ঠুকে যাওয়ায়, ড্রাইভার উঃ করে শব্দ করার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা ওখান থেকে একলাফে ড্রাইভারের বাঁ-পাশে এসে পড়লো।

পাথরটা থেকে মাত্র দশ-হাত দূরে জীপটা তখন দাঁড়িয়েছিল। বাঘটা একলাফে আলো থেকে বাঁ দিকের অন্ধকারে মুহূর্তের মধ্যে এসে পড়লো। আমি রাইফেলের নলটা সঙ্গে সঙ্গে নীচু করতেই বাঘের কাঁধে ঠুকে গেল— অমনি দড়াম্ করে আওয়াজ হয়ে গেল। ৪৫০।৪০০ গুলিটা কাঁধের ভিতর ঢুকে যাওয়া সত্ত্বেও বাঘটা গর্জন করলো না, গাড়ীর পিছনের চাকাটা সামনের থাবা দুটো দিয়ে জোরে আঁকড়ে ধরে হিস্টিরিয়া রোগীর মত থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো। একবার হাঁ করে মুখ বন্ধ করলো, তারপর দাঁতে-দাঁত দিয়ে মাড়ী কুঁচকে উপর দিকে তুলে ধরলো। ল্যাজ দিয়ে দু'বার মাটি আছড়াল। গাড়ীর চাকাটা তেমনি আঁকড়ে ধরে বাঘটা ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে গেল। যখন ওর শরীরের সব আক্ষেপ থেমে গেল, কোন স্পন্দন আর রইলো না—তখন পাঁচ সেলের টর্চটা আমার হাতে এসে পৌঁছল।

বোতাম টিপে দেখলাম, প্রকাণ্ড প্যান্থারটা চোখ উল্টে মরে পড়ে রয়েছে, আর ক'ষের পাশ দিয়ে জীভটা ঝুলে বেরিয়ে এসেছে। এরপর সকলেই গাড়ী থেকে নেমে বালিমেলার নরখাদকটাকে ভাল করে দেখলাম। সর্দারজী ওর মুখটা হাঁ করে মেলে ধরতেই দেখা গেল, বাঘটার উপরের আর নীচের একটা করে দাঁত ভাঙ্গা, আর বাকি দুটি দাঁত অর্ধেকেরও বেশী খ'য়ে গেছে। বাঘটাকে জীপের পিছনে পায়ের কাছে শুইয়ে রাখা হলো, তারপর ফ্লাস্কের গরম চা আর কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করে খুব আরামে সিগারেট খেতে খেতে ফেরার পথ ধরা হলো। গাড়ীর ঝাঁকানি, দু'পাশের আছড়ে পড়া ঝোপ-জঙ্গলের কাঁটা কিছুই আর গ্রাহ্য করলাম না। নুড়ির উপর দিয়ে নদী পার হয়ে মালকান্-গিরির পথে এসে যখন পৌঁছলাম—তখন স'বে ভোর হচ্ছে। প্যান্থারটার মাপ লম্বায় আট ফুট। মানুষখেকো হওয়ার কারণ—খ'য়ে যাওয়া দাঁত আর বার্ধক্য।

বাঁকা অরণ্যের মানুষখেকো চিতা

১৯৫৮ সালের শেষের দিকে ভাগলপুর জেলার বাঁকা মহকুমার ভিথিয়া অঞ্চলে নরখাদক চিতাবাঘের আবির্ভাব হয়। ফলে সাঁওতাল অধ্যুষিত সেই অরণ্য এলাকার শান্তি বিঘ্নিত হলো, অন্ধকার রাতগুলো আতঙ্কময় হয়ে উঠলো, ও গবাদি পশুর সঙ্গে মানুষের প্রাণনাশের সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

ভাগলপুর শহর তিরিশ মাইল দূরে। গরম গরম খবরগুলো সামান্য তিরিশ মাইল পথ পাড়ি দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হয়ে সরকারি ফাইলের তলায় চাপা পড়ে গেল। তদন্ত অবশ্য একটা হলো, সচরাচর যা হয়—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। কিন্তু তাতে ভিথিয়া অঞ্চলের কোন হে'র-ফের হলো না, বাঁকা অরণ্যের মানুষখেকো চিতাবাঘ অপরাধ স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত-ও করলো না। প্রায়শ্চিত্ত শুরু হলো দরিদ্র অসহায় বস্তিবাসীদের। ওদের ঘরগুলো মজবুত নয় বলে ওরা প্রায়শ্চিত্ত করলো, জীবন ধারণের জন্য ওদের বনে-জঙ্গলে যেতে হয় বলে ওরা প্রায়শ্চিত্ত করলো, ওরা নিরস্ত্র গরীব—নরখাদকের কবল থেকে আত্মরক্ষায় অসমর্থ বলে শুরু হয়েছিল ওদের প্রায়শ্চিত্ত।

ভাগলপুর শহরে অনেক বন্দুক আছে। বাঁকা অরণ্যের নরখাদক সংঘটিত ভয়াবহ সংবাদগুলো সমর্থিত বা অসমর্থিতভাবে শহরাঞ্চলে যখন সমালোচনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, বে-সরকারী শিকারীরা তখন সরকারের অনুমোদন নিয়ে ভিথিয়া অঞ্চলে এসে নরখাদক চিতাবাঘের অনুসন্ধানে লিপ্ত হলেন। শিকারীরা ব্যাপক সন্ধান চালিয়ে একমত হলেন যে—নরখাদকের সংখ্যা একাধিক। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করলেন, নরখাদকের সংখ্যা চারটি—অর্থাৎ দু'জোড়া, আবার কোন কোন শিকারী জানালেন—অন্তত তিন-চার জোড়া নরখাদক চিতাবাঘ এ অঞ্চলে আছে।

সংখ্যাটা যাই হোক—বাঁকা অরণ্যের নরখাদক চিতারা বিখ্যাত হয়ে পড়লো এবং যথেষ্ট প্রচার লাভ করলো। ভারতের প্রায় সব দৈনিক পত্রিকায় ভাগলপুরে চিতাবাঘের উৎপাতের কথা লেখা হলো, তাতে শিকারীদের

তৎপরতা বৃদ্ধি পেল অনেক গুণ। সেই বছরেই একটি চিতা মারা পড়লো আর একটি মারাত্মক জখম হয়ে পালাতে সক্ষম হলেও, ধরে নেওয়া হলো—আহত চিতাটার আয়ু আর বেশীদিন নেই।

ভারতের নানা স্থান থেকে শিকারীদের আনাগোনার ফলে বাঁকা অরণ্যের চিতার তাড়া খেয়ে বেড়াতে লাগলো। শিকারীদের সংস্পর্শে আসার ফলে চিতারা আত্মরক্ষায় যেমন পটু হয়ে উঠলো, তেমনি হলো ধূর্ত। এদের ধূর্ত প্রকৃতির জন্য শিকারীদের কৌশল ক্রমে ব্যর্থ হতে লাগলো। সেই সময় কোন সাঁওতালের তীরে আরও একটি চিতাবাঘের মৃত্যু ঘটলেও, তখন পর্যন্ত এদের সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি।

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ সালের মে মাস পর্যন্ত নরখাদকরা বিরাশি জনকে হত্যা করেছিল, এছাড়া বহু অসমর্থিত প্রাণনাশের সংবাদও ছিল। এই চার বৎসরে চিতাবাঘ মারা পড়েছিল দু'টি আর মারাত্মক জখম হয়েছিল একটি। যদিও সেটিকে মৃত বলেই ধরা হয়েছে। দীর্ঘ চার বৎসর নরখাদকের সঙ্গে একই এলাকায় বাস করে ভিথিয়া অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে নরখাদকের ভীতি ক্রমেই সহনীয় হয়ে এসেছিল। তখন পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল, নিহতদের মধ্যে সাঁওতাল শ্রেণীর লোকের সংখ্যা শতকরা পাঁচও নয়, যদিও ঐ এলাকায় তাদের সংখ্যাই অধিক। তদানীন্তন জেলা শাসক শ্রীকৃষ্ণকুমার শ্রীবাস্তব বাঁকা অরণ্যের চিতাদের নিধন করবার জন্য শিকারীদের নিকট অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

ধূর্ত চিতাবাঘগুলো মানুষের সান্নিধ্যে এসে সময় সময় এমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিত, যা শুনলে দস্তুর মত অবাক হয়ে যেতে হয়। আমি একবার বাঁকার অরণ্যে দশ দিন কাটিয়েছিলাম। আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টা করেও আমার গুলির আওতায় একটা চিতাকেও আনতে পারিনি। চিতাগুলোর বুদ্ধি মানুষের থেকে কোন অংশেই কম নয়। খোঁয়াড় থেকে কষ্ট করে ছাগল ধরবে—তবু জঙ্গলে বাঁধা ছাগলের ধারে কাছেও আসবে না। আমি ছাগলের টোপ দিয়েছিলাম, কিন্তু চিতাগুলোর এমন অরুচি যে তার ধার দিয়েও হাঁটেনি।

১৯৪৬ সালে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিন'শ। সেই সময় ইষ্টার্ন রেঞ্জের পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল শ্রীরবি রায়, বিহারের খ্যাতনামা শিকারী শ্রীআক্তার হোসেন ও শ্রীচন্দ্র প্রতাপ সিংহকে নিয়ে শিকারের একটি বন্দোবস্ত করেছিলেন। খুব সুষ্ঠ অভিযান হওয়া সত্ত্বেও ধূর্ত

চিতাদের চিরতরে উৎখাত করা সম্ভব হয়নি। কারণ—এরপরও চিতার কবলে প্রাণনাশের সংবাদ পাওয়া যায়। সেই অভিযানেও দু'টি চিতা নিহত ও একটি আহত হয়।

শ্রীআক্তার হোসেন বলেন—চিতারা এমন দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে যে, তাদের গায়ে একটা গুলি বসানো অসম্ভব বললেই হয়! কারণ—চিতাগুলো মানুষের হাল-চাল এমন নিপুণভাবে র'প্ত করে নিয়েছে যে, তার তুলনা হয় না। অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার…!

একটি ঘটনা—বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে ছোট ভাইয়ের জরুরী চিঠি পেয়ে বড় ভাই দেশে এল। যে ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ দেখা দিয়েছে, তার সঙ্গে দেখা করে বললো—যে তার ছুটি একদম নেই, তা'ছাড়া সামান্য ব্যাপারে মাম্‌লা-মোকদ্দমা করে অর্থ নষ্ট করে কোন ফল হবে না—উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হবে। তার চেয়ে মুখিয়া যে রায় দিচ্ছে সেটা মেনে নেওয়াই মঙ্গল। অনেক অনুনয়-বিনয় করবার পর বিবাদী পক্ষ রাজী হলো। তখন বড় ভাই বললো—এখন তো গ্রীষ্মকাল, রৌদ্রে দু'মাইল হেঁটে মুখিয়ার বাড়ি যেতে কষ্ট হবে, ভোরবেলা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়াই ভাল। বড় ভাই আরও জানাল, ভোরবেলা সে তাকে ডেকে নেবে। বিষয়-সংক্রান্ত জটিল ব্যাপারটা এইভাবে নিষ্পত্তি হচ্ছে ভেবে তার আনন্দ হলো। ছোট ভাইকে ডেকে আদ্যান্ত শুনিয়ে বললো, ভোরবেলা তাকে মুখিয়ার বাড়ি যেতে হবে।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই ছোট ভাইয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্ত্রীকে ডেকে বললো—সে এখুনি মুখিয়ার বাড়ি যাবে। এমন সময় দু'য়ারে মৃদু ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হলো। বড়-ভাই ভাবলো—ছোট-ভাই তার ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। তখন বড়-ভাই দরজা খুলতেই, একটা চিতা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। চিতাটা তার বাঁ-হাতের কনুইয়ের কাছে কামড়ে ধরে বাইরে আনবার চেষ্টা করতেই, বড়-ভাই ডান্-হাতে কপাটটা ধরে দু'পা দিয়ে চৌকাঠটা চেপে ধরলো। বড়-ভাইয়ের স্ত্রী এই ব্যাপার দেখে, ভয়ে কি করবে ঠিক করতে পারছিল না। স্বামীর গোঙানী কানে আসতেই বিছানা থেকে পাশ-বালিসটা তুলে কাঁদতে কাঁদতে চিতাটার মাথায় পিটতে শুরু করলো, আর চীৎকার করতে লাগলো। তখন চিতাটা বেগতিক দেখে খুব অনিচ্ছায় বড়-ভাইকে ছেড়ে বেড়া ডিঙ্গিয়ে পালিয়ে গেল।

ও-দিকে বিবাদী-পক্ষের লোকটিরও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। স্ত্রীলোকের চিৎকার শুনে যেই দরজা খুলে মুখ বাড়িয়েছে, অমনি একটা চিতা লাফিয়ে

তার গলা কামড়ে ধরলো। চিতাটা লোকটিকে নিয়ে উঠোনে লাফিয়ে পড়তেই, তার স্ত্রী দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে পরিত্রাহী চীৎকার শুরু করে দিল।

শ্রীআক্তার হোসেন বললেন—তাজ্জব ব্যাপার। বাঁকার চিতারা কী হাত গুনতে পারে? কী করে ওরা জানলো, এই লোকদু'টি ভোরবেলা মুখিয়ার বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিল···! এমন আজগুবী, অসম্ভব কাণ্ড কখনও শুনিনি!

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা,—এ-ক্ষেত্রে চিতার শিকার—একজন সাঁওতাল রমণী। খুব সাহসী ও পরোপকারী বলে স্ত্রীলোকটির খ্যাতি ছিল। ওর এক বান্ধবীর সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত হয়েছে শুনে, সে তাড়াতাড়ি দেখতে গেল। নবজাত শিশুটি অনেক টাল-বাহানা করে শেষ পর্যন্ত ভূমিষ্ঠ হলো—তখন সন্ধ্যা হতে বিশেষ দেরী নেই। স্ত্রীলোকটি তার বান্ধবীকে যথাযথ সাহায্য করে যখন বাড়ি ফিরলো, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। পথ জনশূন্য বললেই হয়। মানুষখেকোর সম্বন্ধে স্ত্রীলোকটি খুব সাবধানী ছিল। স্বামী ও পুত্রকে সর্ব-সময় সে চিতাদের কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে দিত।

বাড়ি ফেরার পথে চিতার কথা ভেবে সে খুব হুঁসিয়ার হয়ে হাঁটছিল। চিতারা কী ভাবে মানুষ ধরে সে খবর শোনা ছিল বলে স্ত্রীলোকটি ঝুলে-পড়া ঘরের চাল, ঘরের কোণ, পথের বাঁক, এমনকি সামান্য ঝোপ-ঝাড়গুলো পর্যন্ত সযত্নে পাশ কাটিয়ে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে দ্রুত হেঁটে বাড়ি পৌঁছে গেল। চিতার বিপদ কাটিয়ে বাড়ির সামনে এসে সে হাঁফ ছাড়লো। স্বামী-পুত্রকে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাসিতে মুখ ভ'রে উঠলো—তখন স্বামীকে বান্ধবীর নির্বিঘ্নে সন্তান-প্রসবের খবরটা দিয়ে ঘরে ঢুকলো।

স্ত্রীলোকটিকে এবার হাত-পা-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। ওর স্বামী তখন ঘরের-কোলে দাওয়ায় কাঠের উনুনে জ্বাল দিয়ে ভাতের হাঁড়ি বসিয়ে জল ঢেলে স্ত্রীকে সাহায্য করতে লাগলো। স্ত্রীলোকটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে দেখলো—হাঁড়িতে জল ফুট্ছে, আরস্বামী আঁচটাকে জোর করার জন্য উনুনটা খুঁচিয়ে দিচ্ছে। তখন চাল বার করবার জন্য সে ঘরে ঢুকলো। ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকটির স্বামী প্রস্রাব করবার জন্য উঠোনে নেমে বেড়ার ধারে বসে দেখতে পেল, একটা বেড়াল বেড়া টপ্‌কে ঘরের দাওয়ায় উঠলো। এর ঠিক এক মিনিট পরেই উনুনের আলোয় দেখা গেল, তার স্ত্রী চাল নিয়ে ঘর থেকে বেরুচ্ছে এবং স্বামী মনে করে যার হাতে চালের পাত্রটি এগিয়ে

দিচ্ছে—সেটা একটা মানুষখেকো চিতা !

হতবুদ্ধি স্বামীর মুখ দিয়ে একটা আওয়াজও বের হয়নি। চিতাটা যখন তার স্ত্রীকে ধরলো—তখন চালের পাত্রটা পড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন শব্দ সে শুনতে পায়নি। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই চিতাটা তার স্ত্রীকে মুখে নিয়ে বেড়ার উপর লাফিয়ে উঠলো। চিতাটা পার হয়ে গেল, কিন্তু স্ত্রীর দেহটা বেড়ার উপর আটকে গিয়ে অর্দ্ধেক ওপাশে আর অর্দ্ধেক এপাশে ঝুলে রইলো। তার স্বামী চীৎকার করে ছেলেকে ডাকতেই ঝুলন্ত দেহটা হুড়মুড় করে বেড়া ভেঙ্গে ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর আলো আর লাঠি নিয়ে বাপ-বেটা চীৎকার করতে লাগলো, আর পাগলের মত অন্ধকারে বেড়ার এপাশ আর ওপাশ বৃথাই ছুটাছুটি করলো,—স্ত্রীলোকটিকে আর উদ্ধার করা গেল না !

বাঁকা-অরণ্যের মানুষখেকো চিতার সন্ধানে দ্বিতীয়বার যাওয়ার বন্দোবস্ত করে ফেললাম। সাজ-সরঞ্জাম সব তৈরী—এমন সময় পারিবারিক কারণে যাওয়া স্থগিত রাখা হলো। আমার শিকারের সঙ্গী বলরাম সরকার, সেই সময় ওর অফিসের এক বন্ধুর সঙ্গে মান্দার-হিল্-এ বেড়াতে গেলেন। আমি বলরামবাবুকে বাঁকার খবর আনতে বললাম।

বলরামবাবু বাঁকার এমন খবর আনলেন, তা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি বিস্ময়কর ! মানুষখেকোর ইতিহাস এমন আর কোথাও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। বাঁকার অধিবাসিরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করায় মানুষখেকোরা পূর্বের মত সহজে শিকার সংগ্রহ করতে পারছিল না, ফলে নিহতের সংখ্যাও অনেক কমে গিয়েছিল। ধূর্ত চিতারা বর্তমানে যে পদ্ধতিতে মানুষ মারা শুরু করেছে, তা যেমন ভয়াবহ—তেমনি চমক্প্রদও বটে ! ভোরবেলা গৃহস্থের ঘরে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ও গলা খ্যাকারি দিয়ে ধূর্ত চিতারা অদ্ভুত উপায়ে মানুষকে ডাকে, নিয়তির বিধানে যারা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দরজা খোলে—তারাই মানুষখেকোর খপ্পরে পড়ে প্রাণ হারায়।

এক বৃদ্ধ অধিবাসী বলেছিল— শয়তানগুলো যা দেখে তাই শিখে নেয়। অনেকদিন পূর্বে এ গ্রামে এক বোষ্টমের আখড়া ছিল। গোঁসাইয়ের নাম—মহানন্দ। ভোরবেলা গেরিমাটি রঙের ছাপ-কাটা নামাবলী জড়িয়ে কপালে ফোঁটা কেটে গোঁসাই খঞ্জনি বাজিয়ে ভিক্ষা করতে বেরুতো। গোঁসাইয়ের কেউ ছিল না, তাকে সবাই ভালবাসত। রঙ্গ-তামাসা করতে গোঁসাই ছিল পটু। যাদের নূতন বিয়ে-সাদী হতো, তাদের সঙ্গেই ছিল ওর ভাব-ভালবাসা

বেশী। তারপর বুড়ো গোঁসাই মরে গেল, আখড়াটা সাপ আর বাদুড়ের আড্ডা হয়ে উঠলো। গ্রামের মানুষ সব ভুলে গেল, কিন্তু শয়তানগুলো ভুললো না…!

মানুষ বনে-জঙ্গলে যাওয়া বন্ধ করলো, সন্ধ্যার পর কেউ আর পথে বের হয় না, ঘরের জানালা কপাটগুলো মজবুত করা হলো—তবু মরণ কেউ ঠেকাতে পারলো না। শয়তানগুলো শেষ পর্যন্ত গোঁসাইয়ের মত "প্রভাত ফেরি" করতে বেরুলো, সেই একই পদ্ধতি—নামাবলীর মত ছাপ-কাটা চামড়া, কপাল থেকে সর্বাঙ্গে ফোঁটা-কাটা, আর সামনের ভয়ানক থাবাদুটো বুকের কাছে জড় করে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ধাক্কা দেওয়া। গলায় অস্পষ্ট ঘড়-ঘড়ে এক রকম অদ্ভুত আওয়াজ—পরে কাশির শব্দ নকল করা, কানে না শুনলে বিশ্বাস হবে না…!

১৯৬৪ সালের ১৬ই নভেম্বর 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' সংবাদ বেরিয়েছিল, "এইসব ধূর্ত প্রকৃতির মানুষখেকো চিতা বাঘেরা ভোরের দিকে গৃহস্থের দরজায় ধাক্কা দিয়ে থাকে। এই আওয়াজ শুনিয়া দরজা খুলিয়া কেহ বাহিরে আসিলেই, উহারা তাহাকে আক্রমণ করে। গত সপ্তাহে এইভাবে উহারা দুইজন তরুণ গ্রামবাসীকে হত্যা করিয়াছে।"

বলরামবাবু যখন বাঁকায় ছিলেন, মিঃ ত্রিবেদীর সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎ হয়। মিঃ ত্রিবেদী ভাগলপুরের বাসিন্দা। সেই সময় শিকারের পারমিট নিয়ে কী গণ্ডগোল চলছিল। মিঃ ত্রিবেদী বিনা অনুমতিতেই চিতা মারবার জন্য বাঁকায় এসে উপস্থিত হলেন, এবং কয়েক দিনের চেষ্টায় একটা চিতাবাঘ মারলেনও। কিন্তু সরকারের নিকট কোন স্বীকৃতি পেলেন না। কোলকাতার মেসার্স এম্. এল্. ভঞ্জের বন্দুকের দোকানে মিঃ ত্রিবেদীর সঙ্গে আমারও পরিচয় হয়েছিল, এবং ঘটনাটি সেইখানেই শুনেছিলাম। বলরামবাবুও সেই একই বিবরণ শোনালেন। এই ঘটনাটির পর বাঁকা-অরণ্যের আর কোন নতুন সংবাদ পাইনি, ঘটনাটি এইরূপ—

বিচক্ষণ শিকারী মিঃ ত্রিবেদী বুঝেছিলেন, বনে-জঙ্গলে ঘুরে কোন লাভ হবে না। এ অঞ্চলের সব চিতাই মানুষখেকো, সন্ধ্যার অন্ধকার হলেই গ্রামের মধ্যে শিকার খুঁজতে আসে। অতএব গ্রামের ধারে ওৎ পেতে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেই মতলবে গ্রামের প্রধান সড়কটার ধারে একটা জলাশয়ের পাড়ে মাচা বাঁধলেন। প্রথম দু'রাত ব্যর্থ হলো, কোন চিতাই সে পথ মাড়ালো না। সন্ধ্যার পর গ্রামের কুকুরগুলো সেই যে একবার ডেকে

উঠেই থেমে গিয়েছিল, সারারাতের মধ্যে আর একবারও ডাকেনি। সময়টা ছিল শুক্লপক্ষ, সুতরাং দেখার কোন অসুবিধা ছিল না। সারা রাত্রির মধ্যে একটা ইঁদুরও সেই পথ অতিক্রম করেনি। টোপ দেওয়া বৃথা ভেবে মিঃ ত্রিবেদী কোন ছাগল বাঁধেননি, বাঁকার চিতাদের টোপের উপর ভীষণ অরুচি!

দুটো রাত ব্যর্থ হওয়াতে মিঃ ত্রিবেদী ঠিক করলেন—বাইরে ফাঁকায় থেকে কোন লাভ হবে না, কোন বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে। গ্রামের ধারে ধারে ঘুরে একটা নিরিবিলি বাড়িই তাঁর পছন্দ হলো। অন্যান্য বাড়ির মত এ বাড়ির কপাটেও চিতার আঁচড়ের দাগ ছিল। ক্ষেতু সিং বলে একটি লোক সেই বাড়িটার তালা খুলে ওর থাকবার ব্যবস্থা করে দিল। বাড়িটা ক্ষেতু সিংয়ের চাচাতো ভায়ের, চাচাতো ভাই সপরিবারে কোলকাতায় বাসা ভাড়া নিয়ে চাকরী করছে।

মাটির ঘরটার একটি মাত্র দরজা ও জানালা, ছোট জানালাটায় কোন গরাদ ছিল না—রাত্রে খুলে শোয়া যাবে না। দাওয়ায় কাঠের জ্বালের উনুন। চৌহদ্দী এক সময় বেড়া দেওয়া ছিল, বর্তমানে গ্রামবাসীদের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ঘরের জানালাটি খুললেই যে বাড়িটা নজরে পড়তো, তার বাসিন্দা মাত্র চারজন। একটি মধ্যবয়স্ক পুরুষ, তার তরুণী স্ত্রী ও বৃদ্ধা মা; শেষেরটি একটি লাল রঙের গরু। চক্‌চকে বন্দুকটা দেখে ক্ষেতু সিং বললো, এ-হী তো রাস্তা—তেন্দুয়ারা এই রাস্তা ধরেই গ্রামে ঢোকে। ঠিকমত নিশানা নিয়ে যদি মারতে পারেন, জরুর গির যাবে।

মিঃ ত্রিবেদী দরজায় ভাল করে খিল্ তুলে খোলা জানালার ধারে গুলিভরা বন্দুক হাতে রাত জাগা শুরু করলেন। এখানেও তিন-রাত্রি ব্যর্থ হলো। রাত্রি জাগরণের কষ্টটা দিনেরবেলায় পুষিয়ে নিয়ে খবরদারি করতেন—চিতা রাত্রে কোন বাড়ির দরজা আঁচড়েছে কি-না, চিতার পায়ের টাটকা দাগ গ্রামের কোন্ দিকে দেখা গেছে ইত্যাদি।

ক্ষেতু সিংয়ের চাচাতো ভাইয়ের ঘরে রাত জাগবার সময় তিনটি রাত ব্যর্থ হয়েছে বললে একটু ভুল হবে। যদিও প্রথম রাতটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, একটা ছায়া পর্যন্ত দেখা যায়নি, কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রে যা দেখেছিলেন, তাতে জানালার সামনের বাড়িটার সেই মধ্যবয়স্ক পুরুষ মানুষটার জন্য তার দুঃখ হয়েছিল। মানুষখেকোর ভয় উপেক্ষা করে চোরের মত যে লোকটা রাত-দুপুরে চুপি চুপি ওর বাড়িতে এসেছিল, সে আর যাই হোক ঘটি চোর নয়। তৃতীয় রাত্রে চিতাটা আসতে আসতে হঠাৎ পথ পরিবর্তন করে অন্য

দিকে চলে যায়। তিন রাতের তিন রকম অভিজ্ঞতা নিয়ে মিঃ ত্রিবেদী চতুর্থ রাতের জন্য তৈরী হলেন।

চিতারা শিকার সংগ্রহের সময় দু'বার বেশী তৎপর হয়ে ওঠে। প্রথমবার রাত্রির প্রথম প্রহরে, আর দ্বিতীয়বার—রাত্রির শেষ প্রহরে। মিঃ ত্রিবেদী ফ্লাস্ক খুলে একটু কফি গলায় ঢাললেন, শুক্ল-পক্ষের চাঁদ আলোর বাণ ডেকেছে—খোলা জানালা দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া ঘরে ঢুকছিল। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই—নিস্তব্ধ রাত্রি, নৈশ স্তব্ধতা চাঁদের আলোয় যেন স্তবকে স্তবকে বনের আনাচে কানাচে থমকে থেমে ছিল।

রাত্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত। চিতারা কী এখন আলস্যে হাত পা ছড়িয়ে চাঁদের শোভা দেখছে, না-গৃহস্থ বাড়ির খড়ের চালে বসে বাচ্চাদের কান্না শুনছে! ঘুমন্ত মানুষের বক্-বকানি বা দ্রুত শ্বাস ফেলার গভীর শব্দে চমকে চমকে উঠছে! এমন সময় খুস খুস শব্দ হলো। মিঃ ত্রিবেদী বন্দুকটা তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখলেন, কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ দেখতে পেলেন—তাঁর জানালার ধারে একটা পোকা খুব সন্তর্পণে আর একটা পোকার দিকে এগুচ্ছে, যেমন আর এক রাত্রে দেখেছিলেন—এক তরুণ খুব সন্তর্পণে এক তরুণীর জানালার ধারে এগুচ্ছিল।

এমন সময় রাত্রির সেই অখণ্ড স্তব্ধতা খান্ খান্ করে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠলো একটা প্যাঁচা। প্যাঁচাটা আর একবার ডেকে উড়ে গেল কোথায়। তারপর আর কোন সাড়া শব্দ নেই, কোন পরিবর্তন নেই সেই একঘেয়েমির। ক্লান্তি আর নিরুত্তাপে কেটে যেত লাগলো রাত্রি। অনেকদূর থেকে মোরগের ডাক ভেসে এল, কাছে-পিঠের কোন গাছ থেকে পাখীর ডানা ঝাপটানোর শব্দ হলো। এ সবই ভোরের লক্ষণ। পূর্ব দিকের আকাশে আলোর আভা। মিঃ ত্রিবেদীর হাই উঠতে লাগলো—এ রাতও ব্যর্থ হলো!

ফ্লাস্ক খুলে একটু কফি খেতে যাবেন, এমন সময় দেখলেন—কুকুরের মত একটা জন্তু নিঃশব্দে এসে সামনের সেই বাড়িটার দাওয়ায় এসে উঠলো। অন্ধকার আর বাঁশের খুঁটিগুলোর জন্য জন্তুটা কোথায় গেল বুঝতে পারলেন না। বন্দুকটা তুলে সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন, জন্তুটাকে আর দেখা গেল না। ওটাইথ চিতা—সে বিষয়ে তখন আর কোন সন্দেহ ছিল না।

ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। তখন সেই বদ্ধ দরজায় ধাক্কা দেওয়ার মত শব্দ হলো। মিঃ ত্রিবেদী বন্দুকে নিশানা নিয়ে তৈরী হয়ে

রইলেন, কিন্তু চিতাটাকে তখন দেখা যাচ্ছিল না। এমন সময় দেখলেন—জঙ্গলের ধারে আর একটা চিতা বসে আছে, তাঁর জানালা থেকে মাত্র ত্রিশ-গজ দূরে। কোনটাকে আগে গুলি করবেন স্থির করবার আগেই, ঘরের খিল খোলার আওয়াজ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ত্রিবেদী জঙ্গলের ধারের চিতাটাকে লক্ষ্য করে গুলি করলেন। দাওয়ার চিতাটা তীর-বেগে পালিয়ে গেল।

মিঃ ত্রিবেদী বন্দুকে গুলি ভরতে ভরতে ছুটে ঘরের খিল খুলে বেরিয়ে এলেন। প্রথমেই তাঁর নজরে পড়লো, জঙ্গলের ধারের চিতাটার উপর। চিতাটা উঠবার চেষ্টা করছিল। দ্বিতীয় গুলিতে স্থির হয়ে গেল। তখন দাওয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তরুণী স্ত্রী আর রুগ্ন স্বামী দরজার কপাট ধরে তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে।

তখন মিঃ ত্রিবেদী এগিয়ে গিয়ে বললেন, আপনাদের দাওয়ায় আর একটা চিতা এসেছিল। দাওয়ার উপর উঠে তিনি চিতার পায়ের ছাপ দেখিয়ে দিলেন। তরুণী স্ত্রীটি তখন জিজ্ঞাসা করলো—দরজায় আপনিই কি ধাক্কা দিয়েছিলেন ?

মিঃ ত্রিবেদী মুচকে হেসে জবাব দিয়েছিলেন—না, যার পায়ের ছাপ রয়েছে আপনার দাওয়ায়, সেই ধাক্কা দিয়েছিল। ভবিষ্যতে আবার দেবে, দয়া করে আর দরজা খুলবেন না—বলে মরা চিতাটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

বাঁকা অরণ্যের কাহিনী এখানেই শেষ করলাম, মানুষখেকো চিতার দৌরাত্ম্য আজও সেখানে আছে। নৈশ স্তব্ধতা ব্যাহত করে আজও শোনা যায় বুকফাটা আর্তনাদ। জানিনা সে করুণ কান্না তরুণ শিকারীদের কানে পৌঁছবে কি-না…!

ডিভোরের-চিতা

বিন্ধ্যাচল পর্বতমালার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিন্দুবাসিনী। প্রাচীন ও জাগ্রত পীঠস্থান। অনেক কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে দেবী বিন্দুবাসিনীকে নিয়ে। মন্দিরের পাণ্ডাদের কাছে শুনবেন কত অলৌকিক কাহিনী, যা আপনার

ধারণাতীত। বিন্ধ্যাচলের অপরিসীম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য স্তব্ধ করে দেবে আপনাকে, চোখ ফেরাতে পারবেন না। উত্তরপ্রদেশের প্রাচীন সহর মিরজাপুর—ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত। বিস্তৃত অধিত্যকার মধ্যে অবস্থিত, চারিদিকে সু-উচ্চ পর্বতমালা।

সহরের ঘিঞ্জী এলাকাটুকু পার হয়েই বুক ভ'রে মুক্ত বাতাস নেবেন খোলা প্রান্তরে। পথের দু'পাশে অড়হর ও কলাইয়ের ক্ষেত। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজের সমারোহ। হু-হু করে ছুটে চলবে আপনার টাঙ্গা বা ট্যাক্সি, অনাবিল আনন্দে ভরে উঠবে আপনার যাত্রাপথ। গতি মন্থর হয়ে পড়বে চড়াই ভাঙ্গবার সময়, নীচের ঘর-বাড়ি তখন কত ছোট বলে মনে হবে—দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবেন দেবীর মন্দিরের দোর-গোড়ায়।

তীর্থ দর্শন সেরে তখনকার মত আশ্রয় নেবেন ধর্মশালায়, ধর্মশালায় তিন দিনের বেশী থাকতে পারবেন না। এই সময়ের মধ্যেই, আপনাকে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে ফেলতে হবে। পাহাড়ের নীচে গঙ্গার বিস্তীর্ণ চর আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, পাথর আর পলিমাটি ভরা ধূ-ধূ করছে বিস্তৃত নদী তীর—আপনার দৃষ্টিশক্তি ফুরিয়ে যাবে অপর প্রান্ত খুঁজতে।

পুণ্যের ফলটা এবার পুরোপুরি ভোগ করতে হলে নজর রাখতে হবে স্বাস্থ্যের প্রতি, তখন নেবে আসবেন—চুনারে। অমন স্বাস্থ্যকর জায়গা এ তল্লাটে আর পাবেন না। যদি গর-হজমে ভোগেন—চুনারের কূয়োর জল আপনার পক্ষে অপরিহার্য।

মিরজাপুরের প্রসিদ্ধ কারপেট কিনে ফেরবার পথে যে রাস্তাটা পার হয়ে ষ্টেশনে আসবেন, আপনার হয়তো জানা নেই—সেই চওড়া পিচ্ বাঁধানো পথটা এসে মিশেছে একশো দশ মাইল দূরে রেঁওয়ার পাহাড়ে। সত্তর মাইলের মাথায় পথটা দু'ভাগ হয়েছে। মূল পথটা গেছে রেঁওয়ার—আর শাখা পথটি হালিয়া রেঞ্জের ভিতর দিয়ে পৌঁছেছে ডিভোরে। রেঁওয়ার সাদা বাঘের কথা যদি মনে থাকে আপনার, তা'হলে পাহাড়টা ঘুরে অপর-প্রান্তে যেতে হবে।

সত্তর মাইল থেকে যে পথটা হালিয়া-রেঞ্জ হয়ে ডিভোর পৌঁছেছে, সেই পথে তখন একটা চিতা-বাঘ ক্ষেপে গিয়ে তন্ন-তন্ন করে তার হারানো সঙ্গীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। চিতাটা মাত্র ক'দিন পূর্বে তার সঙ্গীকে আবিষ্কার করেছিল। পুরুষ চিতাটা হঠাৎ রেললাইনে কাটা পড়ায়, স্ত্রী চিতাটা ক্ষেপে পাগল হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত দিন চিতাটা কোথায় থাকত, কেউ জানতো

না। সন্ধ্যার অন্ধকার হলেই চিতাটার উপস্থিতি টের পাওয়া যেত। সমস্ত এলাকাটা সে ঘুরে বেড়াত, আর থেকে থেকে ডেকে উঠত। চিতাটার ডাক শুনে চরতে আসা হরিণ—সম্বর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাত, আর গ্রামবাসীরা দরজার অর্গল বন্ধ করে ভয়ে সেই অশুভ ডাকটা শুনতো যে ডাকটা ওদের রুজি-রোজগার বন্ধ করে দিয়েছিল।

আমিও আপনার মত দেবী বিন্দুবাসিনীকে দর্শন করে তীর্থের ফল চাইলাম। কি চাইলাম জানি না। নৈসর্গিক শোভায় মন তখন কাণায় কাণায় পূর্ণ···। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য আপনার মত চুনারে যাওয়া আমার হলো না, ফেরা হলো না কারপেট কিনে কোলকাতাতেও। ডিভোরের জঙ্গলের সেই সঙ্গীহারা চিতাটা আকর্ষণ করতে লাগলো আমায়। চিতাটা ইতিমধ্যেই তিনটি ছাগল ও একটা বাছুর মেরেছে, আর ত্রাসের সৃষ্টি করেছে সমস্ত এলাকা জুড়ে।

মিরজাপুরের জঙ্গল বিড়ির পাতার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রতিবছর প্রচুর টাকার বিনিময়ে ডাক হয় এইসব জঙ্গলের। বিড়ি ব্যবসায়ীরা এইসব জঙ্গলে কোনদিন লোকসানের মুখ দেখেননি। কিন্তু সে বছর চিতাটার দাপটে জঙ্গলে পাতা কাটা বন্ধ হয়ে গেল। কুলিকামিনরা জঙ্গলে যেতে ভয় পেতে লাগলো। ছাউনি হলো না—ঘের হলো না, অথচ পাতা কাটার সময় চলে যেতে লাগলো। গ্রামবাসীরা টিন পিটিয়ে আর স্থানীয় শিকারীরা বন্দুকের শব্দ করেও চিতাটাকে জঙ্গল থেকে তাড়াতে পারলো না। ডিভোরের পাহাড় আর জঙ্গলে চিতাটাকে খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়লো।

আমার বন্ধু নিমাই, চিতাটাকে মারবার জন্য আমাকে হালিয়ায় নিয়ে এল। ওর সম্বন্ধী নীরুবাবু জীপ চালাচ্ছিল, আর ওদের ষ্টেটের মুন্সী সরযূলালা আমাকে চিতাটার গল্প শোনাচ্ছিল। সরযূলালা বললো—চিতাটা একরাত্রে তিনটে চিংকারা হরিণ মেরেছে। তার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টিকে স্পর্শও করেনি, তৃতীয়টার খানিকটা মাংস খেয়েছে। এর থেকেই বোঝা যায়—চিতাটা খাওয়ার জন্য প্রাণী তিনটে হত্যা করেনি, করেছে আক্রোশে। সরযুলালা হাসতে হাসতে জানাল, চিতাটার কৃপায় ক'দিন ধরে আমরা পেটভরে চিংকারার মাংস খেয়েছি।

চিতার সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প শুনলাম।

হালিয়ায় সরযূলালার একটা খামার বাড়ি ছিল। একটি চাকর ওর ক্ষেত-খামার ও বাড়িটা দেখাশুনা করতো। চিতার ভয়ে চাকরটা মিরজাপুরে

পালিয়ে যাওয়ায়, খামার বাড়িটা তখন খুব অপরিষ্কার অবস্থায় পড়েছিল। সন্ধ্যার সময় আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন গ্রামের কোন লোকের সঙ্গেই দেখা হলো না। আমাদের জীপের আওয়াজ শুনে আশপাশের বাড়ির ছোট ছোট জানালাগুলো খুলে গেল, এবং পরিচিত স্বর শুনে পড়শীরা সরযূলালার সঙ্গে কথা-বার্তা বললো। চিতাটার খবর কেউ জানে না, তবে যে কোন জায়গায় যে কোন সময়ে চিতাটা এসে হাজির হতে পারে, এই মন্তব্যগুলো সব জানালা থেকেই শোনা গেল।

চিতাটা মানুষখেকো না হলেও—ওকে খোঁচা দিলে বা হঠাৎ একাকী সামনে পড়ে গেলে, বদ্‌-মেজাজী জানোয়ারটা ভয় পেয়ে আক্রমণ করে বসতে পারে। ওর সঙ্গীর হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে মানুষের কারসাজি বলে ভাবেনি, তাই ক্রুদ্ধ চিতাটা কয়েকটা বন্য ও গৃহপালিত পশু হত্যা করে বেড়াচ্ছিল। আমরা সে-রাতটা সরযূলালার খামার বাড়িতে কাটালাম, মধ্যরাত পর্যন্ত আমরা জেগেছিলাম—সেই সময়ের মধ্যে চিতাটা একবারও ডাকেনি বা চিতাটার উপস্থিতি, কোন বন্য বা গৃহপালিত পশুর কাছ থেকেও পাওয়া যায়নি।

সকালে উঠেই আমাদের প্রথম কাজ হলো, চিতাটার খোঁজ খবর করা। নীরুবাবু ও সরযূলালা গ্রামের পথগুলো দেখতে গেল। আমি নিমাইকে নিয়ে জঙ্গলে উঠলাম। ঘণ্টাখানেক খোঁজার ফলে আমরা চিংকারা, চিতল-হরিণ, সম্বর ও শুয়োরের পায়ের দাগ দেখতে পেলুম। চিতাটা সে-রাতে এধারের জঙ্গলে হাঁটেনি। ফেরার পথে দেখলাম, একটা ভালুকের চলার দাগ গ্রামের দিকে গেছে। খামার-বাড়ি থেকে 'ঘোঘোয়া' গ্রামের দূরত্ব প্রায় দু'মাইলের মতো। প্রাতঃরাশের পর আমরা ঘোঘায়া গ্রামে এসে শুনলাম—চিতাটা গতরাত্রে এখানে এসেছিল, এবং রাত্রি দশটা নাগাদ দু'বার তার ডাক শোনা গিয়েছিল।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে বড় মহুয়া গাছটার তলায় বসে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। গ্রামবাসীরা বললো—চিতাটা ক্ষেপে যাওয়ার তিনদিন পরে ওদের গ্রামে বাছুর মারে আর ছাগলটা মারে দিনের আলোয়। মহুয়া গাছের নীচে বসেই ওরা আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলো—কোথায় বাছুরটা মারা পড়েছিল, আর কোথায় দিনের আলো থাকতে থাকতেই চিতা ছাগলটাকে নিয়ে যায়। চিতাটাকে যারা দেখেছিল, হাত লম্বা করে মাটি থেকে চিতার উচ্চতা দেখিয়ে দিল। চিতাটা যেখানে বাছুর ধরেছিল, মহুয়াগাছ থেকে

তার দূরত্ব একশো গজের কিছু বেশী। আমি সেখানে একটা মাচা বাঁধবার প্রস্তাব করলাম। সরযূলালা প্রশ্ন করলো—টোপ কি দেবেন? এখানে কোন টোপ পাওয়া যাবে না, মিরজাপুর থেকে কিনে আনতে হবে।

নীরুবাবু বা নিমাই কেউই মিরজাপুর যেতে রাজী হলো না। তখন উপর দিকে মুখ তুলে মহুয়া গাছটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। মহুয়া গাছটা একটা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে, তার তিনদিকে জঙ্গল আর একদিকে গ্রাম। আমি গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করলাম, এই মহুয়া গাছটায় রাত কাটালে চিতাটাকে দেখবার সম্ভাবনা আছে কি-না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল—হ্যাঁ হুজুর। নিশ্চয় আছে—চিতাটা তো এই জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। কখনও এধার থেকে ওধারে যায়—আবার ওপাশের জঙ্গল থেকে এপাশের জঙ্গলে ফিরে আসে। জঙ্গলের জানোয়ার কোথায় কখন থাকে তার কিছু ঠিক নেই। তবে মহুয়াগাছে রাত কাটাতে পারলে চিতাটাকে একদিন-না-একদিন জরুর দেখা যাবে। তখন দু'জন লোক গাছে উঠে আমার বসার একটা জায়গা করে দিল, ওপাশের কতকগুলো ডালপালা ছেঁটে দিল—ঝাঁকড়া গাছটার পাতার আড়ালে বসে যাতে আমার দেখার অসুবিধা না হয়।

কথা হলো—আমি মহুয়াগাছে বসে চিতাটার জন্য অপেক্ষা করবো, আর আমার সঙ্গীরা জীপ নিয়ে ঘুরবে—চিতাটাকে যদি কোথাও স্পটের আলোয় ধরা যায়। বিকালবেলা যখন ওদের গ্রামে এসে পৌঁছলাম, তখন দুজন গ্রামবাসী আমায় মহুয়াগাছটায় তুলে দিয়ে গেল। তখনও সূর্য অস্ত যায়নি, পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছিল। এমন সময় কাঠের ঘণ্টার ঘট্-ঘট্ আওয়াজ আসতে লাগলো। পিছন ফিরে দেখি—রাখালরা জঙ্গলের ভিতর থেকে গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। প্রায় বার-চৌদ্দটা গরু কাঠের ঘণ্টা দুলিয়ে আমার গাছতলা দিয়ে গ্রামে ঢুকলো। রাখালরা জানতো আমি বসে আছি। ওরা আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্-ফিক্ করে হাসতে হাসতে চলে গেল। আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

গ্রামের মানুষ ও গরু-বাছুর ঘরে ফিরে এল, যারা কাজে-কর্মে ভিন্-গ্রামে গিয়েছিল, তারাও ফিরে এল। শুধু বাইরে রইলাম আমি একা। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হলো—পাখীর কাকলি থেমে গেল, গ্রামের কয়েকটা আলোর নড়া-চড়া চোখে পড়লো, আর সেই নিস্তব্ধতার মাঝে ভেসে আসতে লাগলো গ্রামবাসীদের কথা-বার্তার অস্পষ্ট শব্দ। মহুয়া গাছটার পিছন দিক থেকে চাঁদের আলো এসে খোলা মাঠটায় ছড়িয়ে পড়লো। চিতাটার যে

পথ দিয়ে আসার সম্ভাবনা বেশী বলে মনে হয়েছিল, রাইফেল তুলে সেই পথটার উপর কল্পিত চিতার উপর নিশানা নিলাম। কারণ চিতাটা হঠাৎ এসে পড়লে গুলি করবার সময় যাতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়।

নিজেকে সম্পূর্ণ তৈরী রেখে চিতার আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাত গভীর না হতেই গ্রামের আলোগুলো নিভে গেল। মাঝে মাঝে কথা বলার অস্পষ্ট যে আওয়াজ আসছিল, তাও থেমে গেল। এমন সময় গ্রামের ভিতর থেকে একটা কুকুর ডেকে উঠলো, ডাক্‌টা থেমে যেতেই আমার খুব কাছ থেকে জঙ্গলের কিনারে একটা ভালুক অ্যাঁক করে শব্দ করলো। শব্দটা এত কাছে আর এত জোরে হলো, যে আমি চম্‌কে উঠে মহুয়া গাছের নীচটা ভাল করে দেখে নিলাম।

আমি চিতাটার সন্ধানে সমস্ত মাঠটা আর জঙ্গলের কিনারায় যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। এই কাজে যখন তন্ময় হয়েছিলুম, তখন আলো-অঁাধারিতে আমার চোখে কয়েকবার ধেঁাকা লাগলো। কোন কোন জায়গায় হঠাৎ মনে হয়েছিল, চিতাটা যেন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি রাইফেল তুলে আরও ভালভাবে দেখবার চেষ্টা করলাম। যখন ছায়াটা আর নড়লো না, তখন বুঝতে পারলাম—ওটা একটা ঢিবি, গাছের কাটা গুঁড়ি বা শুধু ছায়া, আলো-আঁধারিতে চিতাটার অবয়ব নিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে।

চিতাটা এল না! নিস্তব্ধ বনে কোন সাড়া-শব্দ নেই। গ্রামের কুকুরগুলো সারা-রাতের মধ্যে আর একবারও ডাকেনি। ধীরে ধীরে ভোর হয়ে গেল। আমি মাচা থেকে নেমে খামার বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলাম। পরের রাতও সেই ভাবে কেটে গেল, ব্যতিক্রম শুধু ভালুকটা ডাক্‌লো না। এক-ঘেঁয়েমীর মধ্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে বসে ক্লান্তিকর রাত জাগা···। চিতাটাকে কোন টোপ না দিয়েই মহুয়া গাছের ডালে বসে মারতে পারবো—এমন কোন আশা ছিল না। দৈবাৎ-এর উপর নির্ভর করে একটু চেষ্টা করা গেল মাত্র। এবং প্রথম চেষ্টা হিসাবে সেটা যে ব্যর্থ হলো, সে কথা বলা-বাহুল্য।

চিতাটাকে মারবার জন্য এর পরের চেষ্টা হলো হাঁকোয়া শিকার। পরপর দু'রাত্রি জাগরণের ফলে দুপুরের আহারের পর আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন সরযূলালা গ্রামের লোকজন ডেকে একটা হাঁকোয়া শিকারের সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে। সে রাত্রে আর কোথাও যাওয়া হলো না। সকালে বীটার-রা এলে আমরা রওনা দিলাম। সরযূলালা বীটারদের সঙ্গে বীটের জায়গা সম্বন্ধে

আলোচনা করছিল। আমরা যে জায়গায় এসে থামলুম, সেটা একটা নদীর ধার। দুটো পাহাড়ের মাঝখানে আট-দশ হাত চওড়া একটা পাহাড়ে নদী। বড়-বড় পাথরের ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা জল ঢালুর দিকে বয়ে যাচ্ছে। গভীরতা কোথাও এক হাঁটু, আবার কোথাও কোমর ছাপিয়ে যায়।

নদীর ডানদিকের জঙ্গলে বীট শুরু হলো। আমি তাড়াতাড়ি বসবার জন্য যে জায়গাটা বেছে নিলাম, সেটা আট হাত উঁচু একটা পাথরের ঢিবি। ঢিবিটার ঠিক নীচে হাত-তিনেক চওড়া একটা জন্তু চলাচলের রাস্তা। রাস্তাটার ওপাশের সরু নালাটায় তখনও জল ছিল। আমার ডান পাশের জমিটা ঢিবির সঙ্গে সমান্তরাল এবং ক্রমশ উঁচু হয়ে পাহাড়ে উঠে গেছে।

তাড়াতাড়ি পাথরটার উপর বসবার পর কতকগুলো অসুবিধা নজরে এল। প্রথমতঃ আমার ডানদিকের উঁচু জমি থেকে আমার পজিসন্ (অবস্থান) সহজেই চোখে পড়বে। দ্বিতীয়—জন্তু চলাচলের সরু পথটা ঢাল বেয়ে সোজা আমার নাকের সামনে দিয়ে নীচের নালায় নেমে গেছে। তৃতীয়—যদি কোন জানোয়ার সামনের দিক থেকে এসে উঁচু জমিটায় উঠে আসে, তা হলে আমি একেবারে মুখোমুখি পড়ে যাবো। পাথরটার সামনের মোটা কাঁটা ঝাড়টা নিঃশব্দে পার হলেই আমার রাইফেলের নল থেকে দূরত্ব থাকবে মাত্র দু'হাত! সুবিধার মধ্যে আমার বাঁ-দিকের নালার ধারের সরু রাস্তাটা, যেটা বন্য-জন্তু বিশেষ করে মাংসাশী জন্তুর পালাবার মোক্ষম রাস্তা বলে আমার ধারণা। চিতাটা যদি নালার ধারের পথটা ধরে আসে, তা'হলে চলমান অবস্থাতেই ওকে গুলি করতে পারবো। কিন্তু যদি ওপরের পথটা ধরে আসে, তাহলেই আমরা মুখোমুখি হয়ে পড়বো। পরিণাম কি হবে জানি না।

এর চেয়েও ভাল জায়গার সন্ধান করবার সময় আর ছিল না। বীটারদের অস্পষ্ট শব্দ কানে আসতে লাগলো। সেই মুহূর্তে আমার অস্বস্তির একমাত্র কারণ হয়ে রইলো, সামনের মোটা কাঁটা-গাছটা। আমার স্থির-বিশ্বাস, চিতাটা যদি আসে নীচের পথটা ধরেই আসবে। তবু আত্মরক্ষার জন্য কাঁটা-গাছটার দিকেই রাইফেলের নল ঘুরিয়ে বসলাম। রাইফেলের সেফটী তুলে দিয়ে কান পেতে রইলাম আগে ভাগে যদি কোন শব্দ পাই। ঘন কাঁটা-গাছটার ওপাশে কী আছে বা কী ঘটছে, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না অথচ গাছটাকে কাটবার মত কোন যন্ত্রপাতিও আমার কাছে ছিল না।

বীটারদের আওয়াজ ক্রমশই পরিষ্কার হতে লাগলো। আমার দিকে তখনও কোন জানোয়ার আসেনি। সঙ্গীরাও নীরব। এমন সময় সামনের

জঙ্গলে হুটোপাটীর শব্দ হলো। বীটাররাও চিৎকার করে কী যেন বলে উঠলো। তারপর সব চুপ-চাপ, আর কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে বীটারদের গাছ ঠোকার আওয়াজ হতে লাগলো। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না বলে রাইফেলটাকে বাগিয়ে ধরে কাঁটা ঝাড়টার পাশে তাকিয়ে রইলুম, আর আড়চোখে নালার ধারের পথটাতেও নজর রাখতে লাগলুম।

এইভাবে আরও আধঘণ্টা কাটলো। কাঁটা বনটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আড়চোখে দেখলাম—নালার ধারের পথটা দিয়ে একটা বড় সাপ চলে যাচ্ছে। সাপটাকে ভালভাবে দেখবার জন্য যেই চোখ সরিয়েছি, একটা কালো মতন মস্ত জন্তু চক্ষের নিমেষে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি শুধু চোখের দৃষ্টি সরিয়েছিলাম, রাইফেল সরাইনি। বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠলো। জন্তুটাও হঠাৎ আমাকে এত কাছে দেখে চমকে গিয়েছিল।

আমি রাইফেলের নিশানা নেওয়ার সময় পেলুম না। চিবুকটা কখন রাইফেলের বাঁটের উপর নেমে এসেছিল, তাও জানি না—ট্রিগার টেনে দিলুম। প্রচণ্ড শব্দ করে গুলিটা বেরিয়ে যেতেই আমি পিছন দিকে হ'টে গেলুম, আর তখনই আশ্চর্য হয়ে দেখলাম—একটা প্রকাণ্ড দাঁতাল ব'রা আমার রাইফেলের নল থেকে মাত্র এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থর-থর করে কাঁপছে। আমি দ্বিতীয় গুলিটা ছোঁড়বার জন্যে সোজা হয়ে বসতেই বিশাল বরাটা সেখানেই ধপাস করে পড়ে গেল, আর নড়লো না। এই ভাবে প্রথম বীট্ শেষ হলো।

দ্বিতীয় বীট্ শুরু হলো নদীর বাঁ দিকের জঙ্গলে, এ বীট্ও ব্যর্থ হলো। যার জন্য এত পরিশ্রম, তার দেখা পাওয়া গেল না। বিকাল সাড়ে চারটার সময় বীট্ বন্ধ করে দেওয়া হলো। গ্রামবাসীরা খুব আনন্দ করতে করতে মৃত-ব'রা বাঁশে ঝুলিয়ে গ্রামে ফিরে গেল। চিতাটার পায়ের টাট্কা ছাপ না দেখে কোন জঙ্গল বীট্ করা হবে না—এ কথা জানিয়ে দেওয়াতে গ্রামবাসীরা চিতাটার পায়ের ছাপ অনুসন্ধান করতে রাজী হলো। আরও দু'টো দিন কেটে গেল, কোন খবর এল না। চিতাটা তখনও পর্যন্ত এ-অঞ্চলে আছে কি-না, তারও কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করা গেল না।

এমন সময় ঘোঘোয়ার গ্রাম থেকে খবর এল—চিতাটা আবার একটা বাছুর মেরেছে। রাইফেল, গুলি ও টর্চ নিয়ে ঘোঘোয়ায় পৌঁছে দেখি—পাঁচ-ছয়-জনের একটা ছোট দল মস্ত মস্ত লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে আসতে দেখে ওরা এগিয়ে এসে বললো, বাছুরটাকে কাল রাত্রে কখন মেরেছে,

আমরা কিছুই টের পাইনি। সকালে ছেঁড়া দড়ি, রক্ত আর বাঘের পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারলাম এটা সেই চিতার কাজ। এবারে চিতাটা হুজুর—বাছুরটাকে গভীর জঙ্গলে টেনে গিয়ে অর্ধেকেরও বেশী খেয়ে ফেলেছে। আপনার কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়ে আমরা মড়ি দেখে এসেছি।

নিজের চোখে মড়ি দেখবার জন্য ওদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। প্রায় মাইল খানেক উঁচু-নীচু জমির উপর দিয়ে হাঁটার পর আমরা মড়ির কাছে পৌঁছলাম। চিতাটা অনেক কষ্ট করে এতদূর মড়ি ব'য়ে নিয়ে এল কেন বুঝলাম না। সাদা রঙের মড়িটা একটা ঝোপের তলায় লুকিয়ে রেখে চিতাটা কাছাকাছি কোথাও আছে বলে আমার ধারণা হলো। জায়গাটা এত নির্জন, যে চিতাটা ইচ্ছা করলে দিনেরবেলায় এসেও মড়ি খেতে পারে।

মড়ি থেকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে একটা গাছ পছন্দ করে ওদের বললাম, বসবার একটা জায়গা তৈরী করতে। চিতাটা কাছাকাছি কোথাও আছে, যেন বিশেষ শব্দ না হয়। দু'জন গ্রামবাসী তৎক্ষণাৎ গোটাকতক ডাল কুড়িয়ে নিয়ে বুনো-লতা দিয়ে বেঁধে একটা চেয়ার-আসনের মত তৈরী করে ফেললো।

তখন ওদের বললাম, জঙ্গলের মধ্যে খানিকক্ষণ ঘোরা-ফেরা করে কথা বলতে বলতে যেন গ্রামে ফিরে যায়। ওরা আমার নির্দেশমত যখন মড়ি থেকে কিছুদূরে গেছে, সেই অবসরে আমি গাছে উঠে চুপ করে বসে পড়লাম। আমি ঠিক হয়ে বসলাম দেখে ওরা কথা বলতে বলতে গ্রামের পথ ধরলো।

তখন বেলা দুটো। আমি জানি চিতারা দিনের আলোয় মড়িতে আসে না। আমাকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে, চিতাটাকে সাবধান হওয়ার সুযোগ দেব না বলেই এই কষ্টটুকু স্বীকার করে নিলুম। তাছাড়া জায়গাটা এত নিরিবিলি, যে চিতাটা দিনের বেলায় এলেও আসতে পারে ব'লে মনে হলো। যাইহোক আমার প্রহরা তো শুরু হয়ে গেল, এখন চিতাটার স্খিদে কি রকম, তার উপরই নির্ভর করছে ওর আসা বা না-আসা।

জঙ্গলের সময় বেশ দ্রুত কেটে যায়, যদি না কারুর জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। আমারও সময় বেশ কেটে যাচ্ছিল—পাখীর ডাক, জঙ্গলের খুস-খুস শব্দ, আর কীট-পতঙ্গের ডাক শুনে। কিন্তু চিতাটার জন্য অপেক্ষা করছি বেলা দুটো থেকে—এই কথাটা মনে পড়তেই অনুভব হচ্ছিল, ঘড়ি যেন আর চলছে না।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল, তারপর সন্ধ্যা হলো। বনের প্রাণীরাও যে-যার কর্তব্য করে গেল, পাখীরা গাছের নিরাপদ ডালে আশ্রয় নিয়েছে—দিনের পোকা-মাকড়রাও আত্মগোপন করেছে, আর আত্মপ্রকাশ করছে রাতের প্রাণীরা। ঝিঁ-ঝিঁর ডাক চলেছে একটানা। একটা হায়না অনেকদূর দিয়ে চলে গেল। এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম একটি চারপেয়ে জন্তু দেখলুম। হায়নাটা চলে যাওয়ার পর অন্ধকার এত গাঢ় হয়ে উঠলো, যে আর কিছু দেখা গেল না।

চিতাটার এতক্ষণে মড়ি খেতে আসবার সময় হয়েছে, আমি রাইফেলের সেফ্‌টী অন্‌ ক'রে দিলুম। তারার আলোয় ঘড়িটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। চাঁদ উঠতে আরো এক ঘণ্টা দেরী। দেখতে দেখতে চাঁদ উঠলো, রাত গভীর হলো—তবুও চিতাটা মড়ি খেতে এল না। যতই রাত বাড়তে লাগলো, ততই আমার ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, চিতাটা মাচা বাঁধা দেখে ফেলেছে বলেই মড়ি খেতে এল না। হয়তো পাতার আড়ালে বসে আমায় লক্ষ্য করে আর একটা শিকারের সন্ধানে স'রে পড়েছে। হতাশা আর ক্লান্তিতে রাত কেটে যেতে লাগলো। একটা হ'ট-টি-টি অনেকক্ষণ ডেকে হঠাৎ চুপ হয়ে গেছে। ঝিঁ-ঝিঁ-রাও ক্লান্ত হয়ে ডাক্ থামিয়েছে। ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠলো, আমি গাছের ডালে পীঠ দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম—তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘোঘোয়ার গ্রামে যখন ফিরে এলাম, তখন সকাল আটটা। ঝাঁকালো মহুয়া গাছটার নীচে প্রায় তিরিশ-চল্লিশ জন লোক বসেছিল। আমাকে ডেকে ওরা জানাল—নিমাই, নীরুবাবু ও সরযূলালা এক্ষুণি এসে পড়বে। রাত্রে চিতাটা মড়ি খেতে আসেনি, সে-কথা ওরা জানে। আমার ধারণা ছিল রাইফেলের আওয়াজ হয়নি বলেই ওদের এই ধারণা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আমি যখন ঘুমুচ্ছিলাম তখনই ওরা চুপি চুপি মড়ি দেখে এসেছে। দু'জন লোক চোখ পিট্‌-পিট্‌ করে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ওরা এসে গেল। সরযূলালা বললো – চিতাটা মড়িতে আসেনি, সেকথা ওরা শুনেছে। নতুন খবর হলো—শেষরাত্রে চিতাটা একটা ছাগল নিয়ে নদীর ধারের জঙ্গলে ঢুকেছে, যেখানে আমি ব'রা মেরেছিলাম—সেই দিকেই আছে চিতাটা। আমরা এক্ষুনি হাঁকোয়া করবো। নিমাই ফ্লাস্কে চা আর কাগজে মুড়ে রুটি এনেছিল, মহুয়া গাছের নীচে বসে আমি পরম নিশ্চিন্তে প্রাতঃরাশ শেষ করলাম। তারপর বীটারদের পিছনে

পিছনে চললুম চিতার জঙ্গলে।

পূর্বের সেই পাথরটার উপর আবার এসে বসলাম। কেন জানি না-জায়গাটা নতুন করে ভাল লাগলো। কাঁটা বনটাকে এবারও কাটা হলো না। বীটাররা জঙ্গল ঘেরাও করতে চলে গেছে, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়লো—গতবার একটা সাপ নীচের পথটা দিয়ে গিয়েছিল। ওটাই হিংস্র জানোয়ারদের পথ। আমি কপাল ঠুকে নীচের পথটার উপরই মনোনিবেশ করলাম, উপরের পথটায় নিশানা করবার কিছু নেই—পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতে হবে।

বীটারদের আওয়াজ কানে এল। হো-হো-হো। ক্রমশই আওয়াজটা জোর হতে লাগলো। বীটাররা তখন খুব কাছে এসে গেছে। মনে হচ্ছিল প্রথম বীটটা ব্যর্থ হলো। এমন সময় ওরা চিৎকার করে উঠলো, তেন্দুয়া যা রাহা হ্যায়—শিকারী হুঁসিয়ার…! বীটারদের তাড়া খেয়ে চিতাটা খুব অনিচ্ছায় ওদের আগে আগে হাঁটছিল…

চিৎকারটা একবার উঠেই থেমে গেল। চিতাটা কোন দিকে আসছে, আমার দিকে না অন্য শিকারীদের দিকে! যদি আমার দিকে আসে, তা'হলে কোন পথে? উপরের না নীচের! আমি খুব সমস্যায় পড়ে গেলাম, উত্তেজনায় বুকের ভিতরটা ধ্বক্ ধ্বক্ করতে লাগলো। রাইফেলটাকে শক্ত হাতে ধরে নীচের পথটার এক স্থানে নিশানা ঠিক করে রাখলাম, কিন্তু আমার নজর রইলো কাঁটা বনটার ধারে। চিতাটা যদি এক গুলিতে না মরে! ৪৫০।৪০০ রাইফেলটা চিতার পক্ষে একটু বেশী ভারী, রাইফেলটা খুবই নির্ভরশীল—আমার বিশ্বস্ত প্রিয় রাইফেল। তবুও কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলাম সামনের সেই কাঁটা বনটার জন্য। কাঁটা বনটাকে আবার অগ্রাহ্য করে কী ভুলই না করেছি! রাইফেলের নল থেকে মাত্র এক হাত তফাতে একটা ক্ষ্যাপা চিতার ঘড়-ঘড়ানি শুনতে কোন শিকারীই রাজী নন। আমি তখন এত দেরী করে ফেলেছি যে, সেই সাংঘাতিক পরিস্থিতির মোকাবেলা করা ছাড়া আর কোন উপয়ান্তর ছিল না।

এই সময় চিতাটা এল। নিঃশব্দে নীচের পথটা দিয়ে পালাবার সময় পাথরটার কাছে এসে উপর দিকে হঠাৎ তাকিয়ে দেখলো। চিতাটা আমায় দেখে দাঁড়াল, না উপরের পথটা লক্ষ্য করছিল, ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি যেস্থানে রাইফেলের নিশানা করে রেখেছিলাম—ঠিক সেইস্থানে এক পলকের জন্য দাঁড়িয়ে চিতাটা হয়তো মনস্থির করছিল। আমি এক মুহূর্ত

দেরী না করে ট্রিগার চেপে দিলাম। প্রচণ্ড শব্দের শেষে দেখলাম, চিতাটা ডিগবাজী খেয়ে মাটিতে ছট্‌ফট্‌ করছে। দ্বিতীয় গুলিটা করতে যাবো, এমন সময় চিতাটা ঘড়-ঘড়ে আওয়াজ করতে করতে গড়িয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেল। আর কোন সাড়া শব্দ এল না, চিতাটা মরে গেছে ভেবে আমি খালি নলটায় একটা গুলি ভরে রাখলাম।

আমার ডানদিকের পাহাড়ের ধার থেকেই প্রথম বীটাররা নেমে এল। তারপর এক এক করে অন্য সকলে এসে জমা হলো। নালার ধারে নেমে গিয়ে দেখি চিতাটা নেই, প্রচুর রক্ত ও হাড়ের কুঁচি পড়ে রয়েছে। চিতাটা আহত হয়ে পালিয়ে গেছে দেখে বীটাররা খুবই ঘাবড়ে গেল। ওদের সাহস দিয়ে আমি চিতাটার চিহ্ন ধরে অগ্রসর হতে লাগলাম। চিতাটা কাঁটা-বন পর্যন্ত সোজা উঠে এসেছিল—তারপর দশ-বারো কদম পিছনে হ'টে গিয়ে আমার ডানদিকের পাহাড়টায় রক্তের ফোঁটা ফেলতে ফেলতে উঠে গেছে।

বীটাররা আমার পিছনে পিছনে আসছিল। প্রায় পঞ্চাশ গজ যাওয়ার পর পাহাড়ের কতকগুলো গুহা নজরে এল। চিতাটা বরাবর রক্ত ঝরাতে ঝরাতে যে গুহাটায় ঢুকেছে তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তখন একজন গ্রামবাসী গুহার মুখে ঝুঁকে উঁকি দিতেই আহত চিতাটা প্রচণ্ডভাবে গর্-গর্ করে উঠলো। যেই চিতাটার সাড়া পাওয়া গেল, অমনি আমার পিছনটা ফাঁকা হয়ে গেল। তিরিশ-চল্লিশজন জোয়ান-মদ্দ চোখের নিমেষে হাওয়া হয়ে গেছে।

রাইফেলের নলটা গুহার মধ্যে ঢুকিয়ে আমি উবু হয়ে বসেও চিতাটাকে দেখতে পেলাম না। গুহার মুখটা এত অপ্রশস্ত, যে একটা মানুষ লম্বা হয়ে শুয়ে কোন মতে ঢুকতে পারে। আমিও তাই করলাম। হাতের দু' কনুইয়ের উপর ভর করে লম্বা হয়ে শুতেই চিতাটাকে দেখতে পাওয়া গেল। অন্ধকার গুহার মধ্যে আহত চোখ দুটো চিতাটার ধ্বক্-ধ্বক্ করে জ্বলছিল। আমি কনুইয়ের উপর ভর করে গুহার মধ্যে কোমর পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই চিতার পুরো দেহটা নজরে এল। আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে কোণ-ঠাসা হয়ে আহত চিতাটা রাগে-যন্ত্রণায় এমন গর্জন করে উঠলো, যে আমার বুকের নীচের নুড়িগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠলো।

চিতাটা আমার দিকে মুখ করেছিল, এবং এত কাছ থেকে ওর মাথায় গুলি করা আমার ইচ্ছা নয়। সৌভাগ্যের বিষয় আমাকে কষ্ট করে অপেক্ষা করতে হলো না, চিতাটাই সে সুযোগ করে দিল। আমার দিকে চোখ রেখে

আর সামনে গর-গর করতে করতে রাইফেলের নলে আচমকা থাবা বসিয়ে দিল। ফলে রাইফেলের নলটা একবার মেঝেতে আর গুহার ছাতে ঠুকে যথাস্থানে আবার নেমে এল। চিতাটার হৃদ্‌পিণ্ড তখন আর এক বিঘৎ দূরে। ট্রিগার চেপে দিলাম।

রাইফেলের শব্দ ছোট্ট গুহার দেওয়ালে-দেওয়ালে আছাড় খেয়ে যে প্রচণ্ড প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হলো—তাতে আমার কানে তালা লেগে গেল। চিতার মরণ-আর্তনাদ শোনা গেল না, ধোঁয়ায় সব অন্ধকার হয়ে গেল। আমি দ্বিতীয় ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে চিতাটার ভয়ঙ্কর চোখদুটো আর দেখতে পেলাম না। বুঝতে পারলাম না চিতাটা তখন কি করছিল বা কোথায় আছে। সেই দুঃসহ পরিস্থিতির অবসান হলো—যখন ধোঁয়া বেরিয়ে গিয়ে অন্ধকার গুহার ভিতরটা আবার দেখা গেল। চিতাটা আমার দিকে পিছন ফিরে মরে পড়ে আছে।

চিতাটার ল্যাজ ধরে টানতে টানতে গুহা থেকে বেরিয়ে এসে দেখি—বীটাররা কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার প্রথম গুলিটা ওর বাঁ-কাঁধ সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে নীচের দিকে নেমে যাওয়ায় এত দুর্ভোগ হলো। থাবার আঘাতে আমার রাইফেলের ফোর-সাইটটাও বেঁকে গেল। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা প্রাণীটা মরবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিরিশ-চল্লিশজন জোয়ান-মরদকে বিশহাত দূরে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড় করিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিল…।

শিকারে বিভ্রান্তি

দু'জন গ্রামবাসী জঙ্গলে গিয়েছিল কাঠ আনতে। ঘর করবার জন্য কয়েকটা খুঁটির প্রয়োজন হয়েছিল ওদের। অনুমতি ছাড়া জঙ্গলে গাছ কাটা বে-আইনি, তাই ওরা ভোরবেলায় গোপনে বনে ঢুকেছিল ভাল গাছের সন্ধানে। গাছ-বাছা হয়ে গেলে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে কাজ সেরে ফেলবে নির্ঝঞ্ঝাটে!

শালের কয়েকটা ভাল ভাল খুঁটি চিহ্ন করে ওরা মনের আনন্দে জঙ্গলের একটি পায়েচলা পথ ধরে ফিরে আসছিল হন্ হন্ করে। এমন সময়ে একটি

বাঘের বাচ্চা লাফিয়ে পড়লো ওদের পথের উপর। লোকদু'টি স-বিস্ময়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়তেই আর একটা বাচ্চা প্রথম বাচ্চাটার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে কামড়া-কামড়ি করে খেলা করতে লাগলো। লোকদুটির চোখ তখন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল, ওদের জানা ছিল—নিশ্চয়ই বাঘিনী কাছে-পিঠে কোথাও শুয়ে আছে।

ফুট্‌ফুটে বাচ্চা দুটো যখন লাফালাফি করে খেলা করছিল, লোকদুটি তখন নিঃশব্দে ঝোপের আড়াল থেকে তন্ন-তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখছিল বাঘিনী কোথায় শুয়ে আছে। নিশ্চিন্ত হলো—যখন বাঘিনীকে কোথাও দেখা গেল না। মুহূর্তের মধ্যে ওদের মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ওরা এক সর্বনেশে মতলব ঠিক করে ফেললো—তারপরে একদমে ছুটে গেল বাচ্চাদুটোর দিকে।

দুটো মানুষকে হঠাৎ এত কাছে ছুটে আসতে দেখে বাচ্চাদুটো ভয়ে মাটিতে জড়সড় হয়ে বসে জুলজুল করে চেয়ে রইলো। লোকদুটি আর একমুহূর্তও সময় নষ্ট করলো না। বাচ্চাদুটোকে বগলদাবা করে নিয়েই প্রাণপণে ছুটতে লাগলো। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকায় আর ছোটে, এইভাবে ওরা গ্রামের ধারে পৌঁছে গেল। বাচ্চা চুরির পরিণামের কথা একবারও ভাবলো না। মুখে তখন হাসি ফুটে উঠেছে, বাচ্চাদুটোকে ভাল দামে বিক্রি করা যাবে।

বাঘিনীর বাচ্চা খোয়া যাওয়ার পরিণাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে—তার তুলনা আমার জানা নেই। বাঘিনী সমস্ত জঙ্গল তোলপাড় করে ফেললো, মুহুর্মুহু গর্জনে মাটি কাঁপিয়ে তুললো। প্রচণ্ড রাগে সে তিনটে গরু মেরে ফেললো, তারপর গভীর রাত্রে তার চাপা কান্না শোনা যেতে লাগলো। এই ঘটনার ফলে বনের পথে মানুষ বা যান-বাহন চলাচল সমস্ত বন্ধ হয়ে গেল।

সম্বলপুরের এক শেঠ, গরুর গাড়ী নিয়ে সেই পথে যাওয়ার সময় বাঘিনীর সম্বন্ধে খুব বিজ্ঞের মত বললো—জঙ্গলের জানোয়ারদের মায়া-মমতা ঠিক মানুষের মত নয়, দু'চার দিন চেঁচামেচি করে শান্ত হয়ে যাবে। জঙ্গল মাত্রই বাঘ আছে—তাব'লে কী মানুষের কাজ-কারবার বন্ধ হয়ে যাবে! শেঠের হিসাবে একটু ভুল হয়ে গেল। মৌল্লা-ভঞ্জের কাছাকাছি আসতেই বাঘিনী প্রচণ্ড গর্জন করে গাড়ীর বাঁ-দিকের বলদটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে পেড়ে ফেললো মাটিতে। তখন অপর বলদটা ভারি জোয়ালটা একাই

টানতে টানতে চললো উর্দ্ধশ্বাসে। ভীতু বলদটার তখন দিক্‌-বিদিক জ্ঞান ছিল না। একটা শালের খুঁটিতে আচমকা ধাক্কা খেয়ে নালায় ছিটকে পড়লো—আর গাড়ীর সামনের দিকটা অর্থাৎ জোয়ালটা গড়িয়ে এসে তার গায়ে আটকে রইলো। গাড়ীর চাকাদুটো পথের কিনারায় এসে থেমে গেল—পিছনটা এ্যান্টি এ'য়ার-ক্র্যাফ্‌ট গানের মত উঁচু করে। শেঠ তখন হুমড়ী খেয়ে মাল-প'ত্তরের তলায় বে-হুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে।

এই ঘটনার পরদিন শেঠ, হনুমানজীকে স্মরণ করে একা হেঁটে সহরে এসে পৌছল। তখন একটা ট্রাক শেঠের মাল-পত্তর তুলে আনতে গিয়ে দেখে—বলদটা মরে শক্ত হয়ে গেছে, পড়বার সময় সম্ভবত ঘাড় মট্‌কে গিয়েছিল। আর—প্রথম বলদটাকে বাঘিনী জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে ফালা-ফালা করে চিরে রেখে গেছে।

লোকদুটি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে অপরাধ স্বীকার করলো, তখন একটা বাচ্চা মরে গেছে। অপর বাচ্চাটাকে গ্রামের কয়েকজনে মিলে জঙ্গলের ধারে ছেড়ে দিতেই, বাচ্চাটা ছুটে গাছপালার আড়ালে পালিয়ে গেল। বাচ্চাটা ওর মা'র কাছে ঠিক পৌছতে পারবে কি-না, এই নিয়ে যখন ওরা জল্পনা-কল্পনা করছিল—ঠিক তখনই বাঘিনীর পর পর দু'টি হুঙ্কার শুনতে পাওয়া গিয়েছিল…!

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি দশ দিনের একটা পারমিট সংগ্রহ করে উড়িষ্যার 'মৌলা-ভঞ্জের' জঙ্গলে শিকারে গিয়েছিলাম। তখনকার দিনে মৌলা-ভঞ্জ ছিল শিকারের স্বর্গভূমি! অসংখ্য বন্য জন্তু এই বনে বিচরণ করতো। মৌলা-ভঞ্জের মনোরম ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন এখন আর নেই, কারণ-মৌলা-ভঞ্জের জঙ্গল নষ্ট হয়ে গেছে। হীরা-কুঁদ ড্যামের তলায় অর্ধেকের বেশী জঙ্গল তলিয়ে গেছে, আর বাকি ক্ষেত-খামারে পরিণত হয়েছে। জন্তু-জানোয়ারেরা আশ্রয় নিয়েছে ও-পারের বারো-পাহাড়ীতে। মেটে খরগোস ও কোট্‌রা হরিণ মাঝে মাঝে দেখা যায় মৌলা-ভঞ্জের অবশিষ্ট ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে।

আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম গ্রামপ্রধানের বাড়িতে। গ্রামপ্রধান মানুষটি ছিল ভারি চমৎকার! যেমন রসিক, তেমনি গল্পবাগিশ্‌। আমার জন্য যে ঘরটি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, সেটি একটা গোয়ালঘরের পাশে। ফলে—গোবরের গন্ধটুকু সহ্য করা ছাড়া আর কোন অসুবিধা ছিল না।

প্রথম কয়েকটা দিন জঙ্গলের পথে জন্তু চলাচলের চিহ্ন অনুসরণ করেও,

কোন শিকার সংগ্রহ করা গেল না। তখন গ্রামপ্রধান হাঁকোয়া শিকারের বন্দোবস্ত করলো। কিন্তু এমনি ভাগ্য, যে প্রথম হাঁকোয়াতেই একটা বরাহ মারা পড়লো,—আর সেই শেষ। হাঁকোয়া শেষ হতেই আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল, আমরা ডে'রায় ফিরতে না ফিরতেই পথে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল—একেবারে তুমুল বৃষ্টি! অগত্যা—শিকার বন্ধ রেখে বৃষ্টি ধ'রার অপেক্ষা করতে লাগলাম। আবহাওয়া ক্রমশই এত খারাপ হয়ে পড়লো যে, আমি শিকারের আর কোন আশা-ভরসা দেখলাম না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এতদূর এসে শুধু একটা বরাহ মেরে ফিরে যেতে হবে। মৌলা-ভঞ্জের জঙ্গলে বাইসন থেকে সব রকম শিকারই পাওয়া যায়। অথচ আমার ভাগ্য এমন, যে শাপান্ত করতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

ক্রমে বৃষ্টি থেমে গেল, আকাশ তখনও ঘোর হয়ে ছিল। একটানা বৃষ্টি পড়ার ঝম্ ঝম্ শব্দ তখনও যেন কানে লেগে ছিল। থেকে থেকে দম্‌কা বাতাস বইতে লাগলো। বুড়ো গ্রামপ্রধান সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত শিকারের নানা-গল্প করে শুতে চলে গেছে। আমার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছিল না, সেই সোনা চিতাটার কথা বার বার মনে আসছিল—যার গল্প করে বুড়ো গ্রামপ্রধান এই মাত্র শুতে চলে গেছে। বর্ষা-বাদলার দিনে বৃষ্টি থেমে গেলেই চিতাটা রাতের অন্ধকারে গ্রামের মধ্যে চলে আসে, বনে তখন শিকার পাওয়া যায় না। ক্ষুধার্ত চিতাটা ত'ক্কে ত'ক্কে ফেরে গ্রামের বাছুর ছাগল ধরবার জন্য। কুকুরগুলো সারারাত থেকে থেকে চিৎকার করে ওঠে, ওরাও মাঝে মাঝে চিতাটার শিকার হয়ে পড়ে। কুকুর ঘেউ ঘেউ করলেই গ্রামবাসীরা টিন পিটিয়ে শব্দ করে, যাতে চিতাটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।

গ্রামপ্রধানের অনেকগুলো ছাগল ওর পেটে গেছে। বুড়ো আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—চিতাটা যে কোন সময় এসে উপস্থিত হতে পারে। আমার শিকারের আর কোন আশা ছিল না। এখন শেষ সময়ে ঘরে বসেই যদি চিতাটাকে মারতে পারি—সেই আশায় মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। চিতাটা কি এই ঠাণ্ডায় বের হবে!

আশায় নিরাশায় দুল্‌তে-দুল্‌তে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর চিন্তা করলাম—চিতাটা যদিও আসে এই অন্ধকারে তাকে বুঝতে পারবো কি করে! এই জল-ঝড়ের রাতে একটা কুকুরও নেই—কোথায় যে সব কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, কে জানে! চিতাটা এলে ছাগলগুলো অবশ্য ডাকবে,

কিন্তু তাতে, গুলি করবার সম্ভাবনা অনেক কম। কেন না, অন্য ছাগলের গায়ে গুলি লেগে যেতে পারে। তাছাড়া বেড়ার আড়ালটাও রাত্রের অন্ধকারে যথেষ্ট অসুবিধায় ফেলবে।

এমন সময় আবার টিপ্-টিপ্ করে বৃষ্টি শুরু হলো—সিগারেটটা নিভিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে দাঁড়াতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে মুখে লাগলো, আর সেই সঙ্গে ঘরের মোমবাতিটাও নিভে গেল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেই আঁধার চোখে সয়ে এল। তখন গোয়ালঘরের চাল্টা দেখতে লাগলাম।—চিতাটা লাফিয়ে উঠেছে কি-না।

এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়লো, দাওয়ার ঠিক নীচেই—গোয়ালঘরের কোণটায় একটা জন্তু অন্ধকারে লুকিয়ে আছে! ঠিক সেই সময়েই গোয়ালঘর থেকে একটা ছাগল 'ব্যা' করে ডেকে উঠলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে ভেবে নিলাম, ছাগলটা চিতার গায়ের গন্ধ পেয়েই ভয়ে ডেকে উঠেছে—আর ওটাই সেই চিতা, গোয়ালের চালে উঠতে যাচ্ছিল—আমার সাড়া পেয়েই অন্ধকারে লুকিয়ে বসে আছে। মুহূর্তে শরীরটা কেঁপে উঠলো, আর সর্বাঙ্গ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল! একেবারে খালি-হাতে ক্ষুধার্ত চিতাটার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আছি···!

এতটুকুও শব্দ না করে অত্যন্ত ধীরে ধীরে শরীরটাকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে দরজার আড়ালে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগলাম। গুলিভরা বন্দুকটা দেওয়ালের কোণে দাঁড় করান ছিল, আর টর্চটা ছিল বালিশের তলায়। আমি এক-পা এক-পা করে বন্দুকটার দিকেই অগ্রসর হতে লাগলাম। যখন বন্দুকটা থেকে আর মাত্র তিন হাত দূরে আছি, সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম—জন্তুটা 'সুট্' করে আমার খাটিয়ার তলায় ঢুকে গেল।

আমি দম্ বন্ধ করে অনড় হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপর অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে বন্দুকটা ধরতে গেলাম। তখনও বন্দুকটা আমার নাগালের বাইরে, আমি তিল্ তিল্ করে সেই দূরত্বটুকু অতিক্রম করলাম। কত সময় লাগলো জানি না, কিন্তু বন্দুকের নলটা হাতের মুঠোয় আসতেই নিঃশব্দে তুলে নিয়ে খাটিয়ার নীচে তাক্ করলাম। দুটো ঘোড়ার উপর আল্তোভাবে আঙ্গুল রেখেই বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে সেফটী তুলে দিলুম, অমনি খট্ করে একটা মৃদু শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভিতর কে যেন সজোরে হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিল। গুলি-দু'টো অল্পের জন্য ফাট্তে ফাট্তে রয়ে গেল।

আমার ধারণা হয়েছিল, 'খট্' আওয়াজটার সঙ্গে সঙ্গেই চিতাটা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু চিতাটা তা না করে যেমন নিঃশব্দে বসেছিল, তেমনিই রইলো। এতে সে যাত্রায় আমার প্রাণটা বেঁচে গেল বটে, কিন্তু সেই ঠাণ্ডা হাওয়া বওয়া সত্বেও ; আমার কপাল বেয়ে ঘাম গড়াতে লাগলো। আমার গলায় কী যেন একটা শক্ত হয়ে আটকে রইলো—সেটাকে অনেক ঢোঁক গিলেও আমি সেই সময় নামাতে পারিনি।

সেই ঘন অন্ধকারে সারারাত আমি চিতাটাকে তাক্ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ক্রমশই হাত অবশ হতে লাগলো। মনে মনে ঠিক করলাম, যতক্ষণ না বন্দুকটা আপনা-আপনি আমার হাত থেকে খ'সে পড়ে যাচ্ছে—ততক্ষণ চেষ্টা করে যাবো।

ক্রমে দাঁতে দাঁত বসে গেল, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো—আর পেশীতে টান্ ধরতে লাগলো। বুঝতে পারলাম—আমি আর বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না, বন্দুকটা আমার হাত থেকে পড়ে গেলেই চিতাটা আক্রমণ করে বসবে। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, কেমন করে দাঁড়িয়েছিলাম তাও জানি না। বোধশক্তি বলে কিছু আর তখন ছিল না। শুধু দুটো বোল্‌তা আমার কানের কাছে বোঁ-বোঁ করে ডেকে চলেছে।

এমন সময় পাখী ডেকে উঠলো। অন্ধকার পাত্‌লা হয়ে ধীরে ধীরে ভোরের আলো এসে পড়লো খোলা দরজা দিয়ে। খাটিয়ার তলাটা তখনও অন্ধকার, চিতাটা আমি দেখতে না পেলেও—ও আমাকে দেখতে পাচ্ছে, এবং চিতাটা এখন এগিয়ে এলে, ওকে আমি গুলি করতে পারবো—এই ধারণাটা হঠাৎ মনে এল। ফলে—আমি সাহসী হয়ে উঠলাম। বন্দুকের নলের উপর থেকে যেই প্রথম চোখ সরিয়ে দরজার দিকে—বাইরের দিকে তাকালাম, আর আশ্চর্য হয়ে দেখলাম—গ্রামপ্রধান অবাক্ হয়ে আমায় দেখছে! চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞাসা করলো। কঁড় হ'লা?

তারপর ব্যস্ত হয়ে দাওয়ায় উঠে পড়ে আবার জিজ্ঞাসা করলো, কঁড় হ'লা—শিকারীবাবু? আমার শুকনো জিভখানা খস্‌খসে একটা শব্দ উচ্চারণ করলো মাত্র—গু'টে বাঘ! গ্রামপ্রধান প্রশ্ন করলো,—কঁড়-ক'ইলা? গু'টে বাঘ! বলেই সশব্দে হেসে উঠলো, অমনি খাটিয়ার তলা থেকে লাল রংয়ের একটা কুকুর ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে এসে গ্রামপ্রধানের পায়ে মুখ ঘষতে লাগলো।

আমি বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সেই দৃশ্য দেখলাম, তারপর বন্দুকটা

মাটিতে নামিয়ে বসে পড়লাম। আমার মুখ দিয়ে এমন একটা স্বস্তির শব্দ বের হলো—এমন একটা প্রাণভরা নিশ্বাস নিলাম, যা কোনদিন পারিনি···!

বুড়োকে সারারাতের কাহিনী শোনালাম। শুনে বুড়ো যত হাসলো—তত মাফ্ চাইলো, আমার এত কষ্ট হয়েছে বলে। আবার যত মাফ্ চাইলো—তত বেশী হাসলো, আমার মত একজন শিকারীকে তার কুকুর নাজেহাল করতে পেরেছে বলে।

যাই হোক—বৃষ্টি ধ'রে গেল, সারাটা দিন রৌদ্রে যেন ঝলমল করতে লাগলো। কিন্তু আমার আর থাকবার উপায় নেই, দশদিন শেষ হতে চললো। জঙ্গলে আর গেলাম না। গ্রামের মধ্যেই ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে—কুকুরটার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে। গ্রামপ্রধানকে বললাম, শেষ রাতটা ও আমার ঘর পাহারা দেবে, আর আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুব, তবেই শোধ-বোধ হবে···

দুর্যোগ কেটে গিয়ে নীল আকাশে তুলোর মত পেঁজা হালকা মেঘ ভেসে বেড়াতে লাগলো, আর রাতের অন্ধকারে এক-আকাশ জ্বল-জ্বলে তারা ফুটে উঠলো। আমার মনের দুর্যোগও কেটে গেছে। নির্নীমেষ নেত্রে নক্ষত্র-পুঞ্জের দিকে অবাক হয়ে চেয়েছিলাম। কোলকাতায় এমন করে আকাশ দেখা হয় না। গ্রামপ্রধানের লাল কুকুরটার নাম লালু। লালুও কেমন উদাসীন হয়ে শুয়ে রইল।

অনেক রাতে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। লালুর কোন সাড়া-শব্দ পেলাম না। ও ভরা-পেট খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। গভীর তন্দ্রার মধ্যে ডুবে যেতে যেতে মনে হলো, লালু যেন আমার খাটিয়ার কাছে এসে কিছু বলছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি—লালু একবার দরজার কাছে যাচ্ছে, আর পরক্ষণেই ফিরে আসছে আমার খাটিয়ার কাছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কী হয়েছে লালু? লালু দরজার কাছে ছুটে গেল, একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করেই খাটিয়া ঘেঁসে দাঁড়াল। লালুর চোখে এমন একটা কিছু ছিল—যার অর্থ তখন আমি বুঝতে পারিনি। বন্দুকটা নিয়ে দরজার কাছে যেতেই লালু আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম—লালু চিতাটার কথা হয়তো আমায় বলছে। খুব সন্তর্পণে দরজার খিল খুলতেই চোখে পড়লো, গোয়াল-ঘরের চালে একটা জন্তু জড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আর লম্বা লেজের ডগাটা নাড়ছে। আমার বন্দুকে দুটো এল. জি. ভরা ছিল। নিঃশব্দে নিশানা নিয়ে ঘোড়া টিপে দিলাম। চিতাটা আমায় দেখতে পায়নি, গোয়ালঘরের চাল থেকে

লাফিয়ে পড়ে আর উঠে দাঁড়াতে পারলো না। সেই অবসরে দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়লুম, চিতাটা ওখানেই ধড়ফড় করে মরে গেল।

লালু ছোটাছুটি করে, চিৎকার করে পাড়া মাৎ করে ফেললো। গ্রামপ্রধান ছুটে এসে আবার জিজ্ঞাসা করলো, কঁড়-হ'লা? তারপর লালু—লালু বলে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো। তখন আমি ওর হাত ধরে টেনে আনলাম মরা চিতাটার সামনে, বেচারী নিহত জন্তুটার দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো। এবার আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কঁড়-হ'লা?

বুড়ো গ্রামপ্রধান ভুরু কুঁচকে আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল, আর অপূর্ব এক হাস্যকর ভঙ্গিমায় রহস্য করে বললো, ম্যই ভাবিথিলী···! অর্থাৎ সারমেয় বিভ্রান্তির কথাটা ও আমায় অবার স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। তবুও এই ঘটনায় লালুকে আমি ভালোবেসে ফেললাম। ফেরবার সময় আমার কাছে যা অবশিষ্ট বিস্কুট ছিল লালুকে দিয়ে দিলাম। আমার গরুর-গাড়ী যখন জঙ্গলের আড়ালে চলে যাচ্ছে—তখন দেখতে পেলাম, লালু মনের আনন্দে উপুড় হয়ে বিস্কুট চিবুচ্ছে। আর—বুড়ো গ্রামপ্রধান শূন্য দৃষ্টি মেলে হয়তো ভাবছিল, আবার কবে দেখা হবে আমাদের!

নাগা-ল্যাণ্ডে হাতি-শিকার

দিমাপুর কোহিমা রোডের এক জংলা-পাহাড়ে আমাদের ছাউনি পড়েছিল। তখন বর্ষাকাল, অবিরাম ধারায় ঝম্-ঝম্ করে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছিল। মেঘে-মেঘে আকাশ কালো হয়েছিল, তিল ধারণের আর ঠাঁই ছিল না কোথাও। গুরু-গুরু মেঘের শব্দে স্তব্ধ ধরিত্রী—আবছা, অন্ধকার! জো'লো বাতাস বইছিল। এমন দিনে কাজে মন আসে না, কিন্তু মিলিটারীর ছাউনী কাব্যের জায়গা নয়। নাগা অধ্যুষিত এলাকায় পাহাড়ী বন-জঙ্গলের অন্তরালে যে ডিভিসনটি তখন গোপন ছাউনী ফেলে শরতের মেঘমুক্ত নীল আকাশের অপেক্ষায় ছিল, তার উপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল—তা হলো ইম্ফল উদ্ধার করা!

প্রচণ্ড বর্ষা সত্ত্বেও গোপন প্রস্তুতি চলছিল তলে তলে। পাহাড়ী ঢল্

নেমে পথ-ঘাট সব ভেসে গিয়েছিল। মিলিটারীর তৈরী নালা আর সাঁকোগুলো উপ্‌ছে সর্বত্র জল কাদার প্রলেপ ছিটিয়ে ছিল। মিলিটারীর সব মুভ্‌মেণ্ট তখন প্রায় অচল অবস্থা। আবহাওয়া এত খারাপ হয়ে গেল, যে জোয়ানরা অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলো। আমাশা ও অন্যান্য অসুখের সঙ্গে ম্যালেরিয়া দেখা দিল। মশার কামড় থেকে বাঁচবার জন্য নতুন মশারী আর ব্যারেল-ব্যারেল 'এন্টি-মশ্‌ কিউটো ক্রীম' সাপ্লাই হতে লাগলো। তবু বিপর্যয় ঠেকান গেল না। দলে দলে জোয়ানরা হাসপাতালে ভর্তি হতে লাগলো। অপারেশন তখন বন্ধ, 'ষ্টে এ্যা'জ ইউ আর'—হয়ে জঙ্গলের বিবর ঘাঁটী পাহারা দিতে দিতে দুঃসময়টা কাটান হচ্ছিল। অপারেশন্ বন্ধ থাকলেও মাঝে মাঝে শত্রু পক্ষের রাইফেল—মেসিন-গানের গুলি মাথার উপর দিয়ে শিস্ দিতে দিতে চলে যেত।

সর্বত্র জল আর কাদা প্যাচ-প্যাচ করছিল। জুতোর ওজন হয়ে গিয়েছিল দ্বিগুণ, ভিজে পোষাকের উপর ভারী বর্ষাতিটা চাপানো ছিল এক দায়—তখন আর নড়বার ক্ষমতা থাকতো না। বিছানা কাপড় সব স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করছিল। এমন একটা পোষাক কারুর ছিল না, যা একদম শুকনো খট্‌খটে। এহেন দুরবস্থার মধ্যে তিন-চার ইঞ্চি লম্বা বড় বড় জোঁক রবারের মত বেড়ে বেড়ে ঘুরে বেড়াত। এক চামচের মত রক্ত শু'ষে আঙ্গুলের মত মোটা হয়ে উঠতো জোঁকগুলো। নূন আর জলন্ত সিগারেট-ই হচ্ছে এদের একমাত্র দাওয়াই। বুটের মধ্যে কখন ঢুকে পড়তো বোঝাই যেত না। রক্ত-চোষা শেষ হলে চিন্ চিনে জ্বালা করতেই টের পাওয়া যেত জোঁক ধরেছে। তখন মুখের জলন্ত সিগারেটটা দিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে রক্ত চোষার প্রতিশোধ নেওয়া হতো।

এরপর উপদ্রব ছিল সাপের, বুনো জন্তু-জানোয়ারেরা বনের গভীর অঞ্চলে স'রে গিয়েছিল। তাঁবুর আশে-পাশে মাঝে মাঝে শিয়াল বা হায়না খাবারের লোভে ঘুরে বেড়াত।

জোয়ানদের রসদ, গোলা-বারুদ ইত্যাদি অত্যাবশ্যক সরবরাহের জন্য একটা 'এ্যাড্‌ভান্স সাপ্লাই ইউনিট' বেস-সাপ্লাই থেকে ফ্রন্ট-লাইনে পাঠানো হয়েছিল। ক্যাপ্টেন হ্যাণ্ডসন্ সেই এ্যাডভান্স সাপ্লাই ইউনিটের অফিসার কমাণ্ডিং। প্রচণ্ড বর্ষায় কোহিমা রোডে ধ্বস্ নামায় যোগাযোগের একমাত্র সড়কটি সাময়িক বন্ধ হয়ে গেল। ফলে কন্‌ভয়ের দীর্ঘ লাইনটা পাহাড়ের ধারে বন-জঙ্গলের রঙে রং মিলিয়ে ক্যামুফ্লেজ করেছিল। পাইওনীয়ার ও নাগা কুলিদের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিন দিন পরে পথ পরিষ্কার হতেই, ক্যামুফ্লেজের জাল গুটিয়ে দীর্ঘ কন্‌ভয়টা একটা প্রকাণ্ড ক্ষুধার্ত ময়াল সাপের

মত আবার নড়ে চড়ে উঠলো। আমাদের এ্যাডভান্স সাপ্লাই ইউনিটের জন্য বাইশখানা ট্রাক সেই কনভয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বাইশখানা ট্রাক যখন এসে পৌঁছল, তখন আমার প্রথম কাজ হলো—বড় বড় ঝাঁকালো গাছের নীচে ট্রাকগুলোকে যত দ্রুত সম্ভব ক্যামুফ্লেজ করা। একশো গজ অন্তর এক একটা গাছের নীচে দু'খানা করে ট্রাক দাঁড় করিয়ে দিতে আমি ভিজে নেয়ে গেলুম। আমার হাতে তখন পঁচাত্তর জন নাগা কুলি ছিল। পাহাড়ীরা সাধারণতঃ খুব পরিশ্রমী, জঙ্গল থেকে কাঠ কাটিয়ে মাটি থেকে দু'হাত উঁচু কাঠের 'ড্যাম্প' তৈরী করে রেখেছিলাম রসদ 'ষ্টোর' করবার জন্য। আর গোলা-বারুদ রাখবার জন্য মাটিতে চৌকো চৌকো গর্ত খুঁড়ে তলায় মোটা মোটা কাঠ বিছিয়ে রেখেছিলাম। গর্তের উপরে ফুটখানেক উঁচু একটা আল দেওয়া ছিল, যাতে জল গড়িয়ে ভিতরে না যায়। একটা আশি পাউণ্ড তাঁবুর মধ্যে তেরপলের বাণ্ডিলগুলো রাখা হয়েছিল 'ডাম্প' গুলোকে ঢাকা দেওয়ার জন্য। ডাম্পগুলোর পরস্পরের দূরত্ব ছিল পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর গজের মধ্যে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে ডাম্পগুলোকে এমনভাবে সাজাতে হয়েছিল, যাতে আকাশ থেকে দেখা না যায়। শত্রুর বোমারু বিমানগুলো সব সময় চেষ্টা করতো—সাপ্লাই ডিপো, প্রধান সড়ক আর ব্রীজগুলোকে যত তাড়াতাড়ি ধ্বংস করা যায়।

এরপর শুরু হলো, ডাম্পগুলোর কাছে ট্রাক এনে মাল খালাস করা, এবং কাজটা যত দ্রুত সম্ভব সারতে গিয়ে 'হারি-আপ, কুইক্ কুইক্ চিৎকার করে ক্যাপ্টেন হাওসন কাদায় পুঁতে যাওয়া ট্রাকের ড্রাইভারদের তাড়া দিতে লাগলো। আর—আমি ইন্ডেন্ট (indent) মিলিয়ে দ্রুত মাল খালাস করতে লাগলাম। মাথার উপরে তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। সূর্যের আলো না থাকায় বেলা দু'টোর সময়ই সায়াহ্নের অন্ধকার নেমে এসেছিল। তীক্ষ্ণ বাতাসে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ ট্রাকগুলো খালাস হতে সঙ্গে সঙ্গে ডাম্পগুলোর উপর তে'রপল ঢাকা দেওয়া হলো। ট্রাকগুলোকে ক্যামুফ্লেজ করে রাখা হলো গাছতলায়, ভোর হলেই বে'স্ ক্যাম্পে ফিরে যাবে।

সেদিনের কাজ শেষ শেষ হতেই টল্‌তে টল্‌তে আমরা আশি পাউণ্ডের তাঁবুতে ফিরে এলাম। অল্প একটু দূরে ক্যাপ্টেনের একশো ষাট পাউণ্ডের তাঁবু থেকে চারখানা চায়ের খালি বাক্স এনে আমার বিছানা পাতলুম। বেস্-ক্যাম্পে আমার ক্যাম্প-খাট ও একটা ট্রাঙ্ক রেখে এসেছিলাম, তে'রপলের বাণ্ডিলগুলো হাতছাড়া হওয়ায় চায়ের খালি পেটির উপর আমার

শয্যা পাতা হলো। গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছিলাম, গুঞ্জনটা হঠাৎ স্পষ্ট হতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি ভিজে বুট পায়ে, মাথা পর্যন্ত বর্ষাতি ঢাকা দিয়ে সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে দেখি—জোয়ানরা একটা লাল রং-এর সাপ মেরেছে। সাপটা কাউকে দংশন করেনি, কিন্তু এ জাতের সাপ আগে আর কখন দেখিনি। সাপটাকে একটা ডাণ্ডায় ঝুলিয়ে রেখে ফিরে আসছি, তখন টর্চের আলোয় এক-জোড়া চোখ দেখলাম 'লঙ্গর-খানার' কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাড়া দিতেই জন্তুটো পালিয়ে গেল, শিয়াল কি হায়না ঠিক বুঝতে পারলাম না।

পরের দিন সকাল বেলায় যখন ডাম্পগুলো পরিদর্শন করছিলাম, তখন বি. এস্. টি. ও—অর্থাৎ বিগ্রেড সাপ্লাই-ট্রান্সপোর্ট অফিসারের তরফ থেকে সংবাদ এল—দুপুরের মধ্যে মিট্-অন-হুপের কন্‌ভয়টি এসে পৌঁছবে। মিট্-অন-হুপ্ মানে জ্যান্ত পাঁঠা। নাগা-কুলিদের কোন মতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম—জঙ্গল থেকে তাড়াতাড়ি ডাল-পালা কেটে একটা বড় খোঁয়াড় তৈরী করতে। খোঁয়াড় করবার জায়গা দেখিয়ে দিতেই ওরা জঙ্গলে চলে গেলে আমি ক্যাপ্টেনের তাঁবুতে গিয়ে সংবাদটা দিলাম। সংবাদটা ক্যাপ্টেনের কাছে খুব প্রীতিকর হলো না। এই দুর্যোগে এতগুলো জ্যান্ত পাঁঠা নিয়ে যথেষ্ট বিব্রত হতে হবে—সেই কথা ভেবে অফিসারের তখন মুখ ঝুলে পড়লো।

দুপুরের আহার সেরে সিগারেট খাচ্ছি—এমন সময় কন্‌ভয় এসে হাজির হলো। জল-ঝড় আর গাড়ীর ঝাঁকানিতে পাঁঠাগুলো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল, আর 'ব্যা-ব্যা' করে ডাকছিল। খোঁয়াড়ের মধ্যে গুণে গুণে দুইশত নব্বুইটা পাঁঠা আর দশটা পাঁঠি ছেড়ে দিয়ে আগল্‌টা বন্ধ করে দেওয়া হলো। যাদের হাতে খোঁয়াড়ের ভার দেওয়া হলো, তারা ষ্টোর থেকে খাদ্য এনে রাখলো, আর ড্যালা ড্যালা নুন দড়িতে ঝুলিয়ে পাঁচ-ছ'টা ডাণ্ডায় বেঁধে দিল। পাঁঠাগুলো খোঁয়াড়ের এক কোণে জড় হয়ে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলো। ক্যাপ্টেন হাগুসন্ সেই দৃশ্য দেখে গজরাতে লাগলো, আর আমাকে নির্দেশ দিল—যত শীঘ্র সম্ভব আপদগুলোকে ইন্‌ফেন্ট্রি ইউনিটগুলোর মধ্যে যেন বিলি করে দি।

বিকালের দিকে বৃষ্টি থেমে গেল, হাওয়ার জোরও কমে গেল। ভাবলুম দুর্যোগের বুঝি অবসান হলো, জল-কাদার হাত থেকে এবার রেহাই পাওয়া যাবে। খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়তেই ঝুপ্ ঝুপ্ করে আবার বৃষ্টি নেমে এল এবং সারা রাত একভাবে বর্ষণ হলো। পাঁঠাগুলো 'ব্যা ব্যা' করে ডেকে

বললো, একটানা কানের গোড়ায় সেই আর্ত-চিৎকার শুনে শুনে অসহ্য হয়ে উঠলাম। ঘুমের আশা ত্যাগ করে উঠে বসে সিগারেট খেতে লাগলাম।

এমন সময় সান্ত্রী হন্ত-দন্ত হয়ে জল-কাদার উপর ভারি বুটের ধপ্ ধপ্ শব্দ করতে করতে আমার তাঁবুতে ছুটে এল। আমি টর্চটা জেলে জিজ্ঞাসা করলাম—কী হয়েছে? উত্তেজনায় সান্ত্রীর গলা কাঁপছিল, বললো—হাতি। এক্ষুণি আসুন—আপনার ষ্টোর ভেঙ্গে ফেলেছে! আমি আর দ্বিরুক্তি না করে ভিজে বুটে পা গলিয়েই স্টেন্-গানটা নিয়ে ছুটলাম স্টোরের দিকে। সান্ত্রীও রাইফেল উঁচিয়ে আমার পিছন পিছন এল। পশ্চিম দিকে ডাম্পগুলোর কাছে আসতেই একটা শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলাম। ষ্টেনগানটা রেডি করে টর্চের বোতাম টিপলাম। বৃষ্টির ধারার ভিতর দিয়ে যেটুকু আলো সেখানে পৌঁছল—তাতে দেখলাম, পাঁচটা বুনো হাতি তে'রপলের তলা থেকে চালের বস্তাগুলোকে কাদায় টেনে এনে ফেলেছে। পায়ের চাপে বস্তাগুলোকে ফাটিয়ে শুঁড় দিয়ে চাল তুলে খাচ্ছে। প্রকাণ্ড চেহারার পাঁচটা বুনো হাতি দেখে আমার চোখ ছানা-বড়া হয়ে গেল। সান্ত্রীকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি ক্যাপ্টেনের তাঁবুর দিকে ছুটলাম। ক্যাপ্টেন হ্যাণ্ডসনকে ঘুম থেকে তুলে হাতির হাম্‌লার কথা বলতেই, সাহেবের গলা দিয়ে ঘড়-ঘড়ে একটা আওয়াজ হলো—'এলিফ্যাণ্ট'!

পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বালিশের তলা থেকে ৩৮ বোরের রিভলবারটা টেনে নিয়ে ঝড়ের বেগে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'হারি আপ'। দৌড়ে ডাম্পটার কাছাকাছি এসে টর্চের বোতাম টিপলাম, তখনও হাতিগুলো চাল খেয়ে চলেছে। সাহেব রিভলবারটা তাক করেছিল, কালো কালো প্রকাণ্ড চেহারাগুলো দেখে কি মনে করে রিভলবারটা প্যাণ্টের পকেট গুঁজে রাখলো। তারপর নিঃশব্দে সান্ত্রীর হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে কাঁধে তুলে লক্ষ্য স্থির করে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বললো, ব্রিগেডকে না জানিয়ে এত রাত্রে আমার রাইফেলের শব্দ করতে পারি না। তুমি বরং আগুন জালার ব্যবস্থা কর। মাত্র তিরিশ-চল্লিশ গজ দূরে পাঁচটা বুনো হাতির সামনে দাঁড়িয়ে ওদের রাক্ষুসে খাওয়া যখন দেখছিলাম, তখন আত্মরক্ষার জন্য আমাদের তিনজনের কাছে ছিল তিন রকমের তিনটি হাতিয়ার। ৩০৩ বোরের রাইফেল, একটা ৩০ অটো কার্বাইন্ আর একটি ৩৮ বোরের রিভলবার।

কতকগুলো প্যাকিং-বাক্স, কেরোসিন আর দিয়াশালাই নিয়ে ঘটনাস্থলে ফিরে এসে প্যাকিং বাক্সের উপর কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিতেই

হাতিগুলো খাওয়া বন্ধ করে শুঁড় গুটিয়ে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত কাঠগুলো ওদের লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগলাম, এতে হাতিগুলো খুব ভয় পেয়ে গেল; তখন ক্যাঁক্-কোঁক শব্দ করতে করতে বনের দিকে বড় বড় পা ফেলে পালাতে লাগলো। হাতিগুলো যখন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, আমরা ডাম্পটার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম—সাত বস্তা চাল নষ্ট করেছে। যতটা পারে খেয়েছে, আর বাকিটা কাদায় ফেলে ছড়াছড়ি করে রেখে গেছে।

অত রাত্রে কিছুই করবার উপায় ছিল না। তিনজনে ধরাধরি করে ছেঁড়া বস্তাগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হলো তারপর আগুন নিভিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম। সকালে একটা 'লস্-ষ্টেটমেণ্ট' তৈরী করবার কথা বলে ক্যাপ্টেন হাওসন্ গুড-নাইট করে শুতে চলে গেলে, সান্ত্রীকে হুঁসিয়ার হয়ে ডিউটি করবার কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি তাঁবুতে প্রবেশ করলাম।

রাত তখন ১টা। ভিজে বুট খুলে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে হাতির কথা ভাবতে লাগলাম। বুনো হাতি এর আগে দেখিনি। হাতিগুলো যদি তেড়ে আসতো, তা'হলে আমরা কি করতাম ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা এসে গেল। সিগারেট নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তখনও অন্ধকার, কত রাত হয়েছে ঘড়ি দেখবার ইচ্ছা হলো না। পাশ ফিরে শুতে যাব, এমন সময় দুম্ করে বন্দুকের শব্দ হলো।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। কোথায় ফায়ার হলো, কে ফায়ার করলো, কিছুই মাথায় এল না। দৌড়ে সান্ত্রীর কাছে গেলাম, ও বেচারাও কিছুই জানে না—হতভম্বের মতো বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। ওখান থেকে একদৌড়ে ক্যাপ্টেনের তাঁবুতে এসে ডাকলুম—স্যার। কোন উত্তর নেই। দ্বিতীয়বার ডাকতেই অন্ধকার তাঁবুর ভিতর থেকে ক্যাপ্টেনের আড়ষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল—আলো, আলো জ্বালো শিগ্‌গীর। আমি টর্চটা তাড়াতাড়িতে ফেলে এসেছিলাম, আবার দৌড়ে টর্চ এনে আলো জ্বাল্‌লাম। তাঁবুর ভিতর ঢুকে দেখলাম, ক্যাপ্টেন হাওসন্ ক্যাম্প-খাটটার উপর উবু হয়ে বসে আছে, হাতে সেই ৩৮ বোরের রিভলবার। আর মশারির একটা খুঁট ছিঁড়ে ঝুলছে মাথার উপর।

সাহেবের এই অবস্থা দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কী হয়েছে স্যার! কোন জবাব পেলাম না। সাহেব খুব সন্তর্পণে মশারী তুলে একলাফে আমার পাশে এসে দাঁড়াল, তারপর টর্চটা আমার হাত থেকে নিয়ে রিভলবার উদ্যত রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এক-

পা এক-পা করে খাটের পিছন দিকে এগিয়ে চললো। সাহেবের এ-হেন অবস্থা দেখে আমি তাড়াতাড়ি কাঁধ থেকে ষ্টেন্‌গান নামিয়ে সেফ্‌টি খুলে তৈরী হয়ে দাঁড়ালাম খাটের পিছনের সেই অজানা ভয়ের উদ্দেশ্যে। বুকের মধ্যে ঢিব্‌ ঢিব্‌ করছিল ; সান্ত্রীও রাইফেল বাগিয়ে তাঁবুর দোর গোড়ায় অপেক্ষা করছিল। সূচ্‌ পড়লেও বোধহয় শোনা যায়—এমন নিস্তব্ধতা সেখানে বিরাজ করছিল তখন।

এ-হেন সময় ক্যাপ্টেন হ্যাণ্ডসন্‌ আতঙ্ক আর উল্লাস মিশ্রিত স্বরে অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠলো—its here! its here Banerjee? আমি ষ্টেন্‌গানের ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে খুব সাবধানে এগিয়ে গিয়ে দেখি, আমাদের খোঁয়াড়ের একটা বড় দাড়িওলা মিশকালো বোকা-পাঁঠা বৃষ্টিতে ভিজে ক্যাম্প-খাটটার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপছিল। বেচারার সর্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছিল। মুখটা বিছানার উপর ছিল বলে কালো দাড়ি বেয়ে টুপ্‌ টুপ্‌ করে যে জল গড়াচ্ছিল—তাতে গোটা বিছানাটা ভিজে গিয়েছিল। আমি কিছু বুঝে উঠবার পূর্বেই ক্যাপ্টেন কালো ছাগলটার পেটে সজোরে একটা লাথি মারতেই অবোধ জানোয়ারটা 'ব্যা' করে ডেকে উঠলো। তারপর ক্যাপ্টেন রিভলবারটা বিছানার বালিশের তলায় আবার রাখতে রাখতে বললো—দেখ, হতভাগাটার জন্য আমার অমন সুন্দর ট্রাঙ্কটা ফুটো হয়ে গেল।

এতক্ষণে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো সহ্য করতে না পেরে, বড় দাড়িওলা ছাগলটা বেড়া ডিঙ্গিয়ে খোঁয়াড়ের বাইরে চলে আসে। তারপর আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে ছুটতে একেবারে খোদ সাহেবের তাঁবুতেই ঢুকে পড়ে। বৃষ্টি থেকে তো বাঁচলো, এরপর একটু আরামের প্রয়োজন। বেচারা নরম বিছানা ঘেঁসে দাঁড়াল। তখন মশারী ঠেলে নরম উষ্ণ বিছানায় উপর যেখানে দাড়ি-সুদ্ধ মুখটা রাখলো, সেটা বালিশ নয় ; ক্যাপ্টেনের মুখ! সান্ত্রী ছাগলটার কান ধরে টানতে টানতে খোঁয়াড়ের দিকে চলে যেতে, ক্যাপ্টেন হ্যাণ্ডসন্‌ খাটের উপর বসে হাসতে লাগলো। তারপর রিভলবার থেকে গুলি ছোঁড়ার গল্প বললো, 'অঘোরে ঘুমাচ্ছিলাম—এমন সময় জলে ভেজা ভারি একটা লোমশ মুখ মশারি ঠেলে আমার মুখের উপর চেপে বসলো। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এত ভয় পেয়েছিলুম, যে একটুও নড়াচড়া করতে পারিনি। টস্‌-টস্‌ করে জল গড়িয়ে মুখ-গলা-বালিশ সব ভিজে যেতে লাগলো, আর বিকট দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে গেল। আতঙ্কে তখন হার্টফেল করবার মত

অবস্থা। উঃ কী সাংঘাতিক ব্যাপার! তখন পাগলের মত এক ঝটকায় বিছানায় উঠে বসতেই মশারির খুঁটটা ছিড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বালিশের তলা থেকে রিভলবারটা টেনে কালো মুখটা আন্দাজ করে ট্রিগার টেনে দিলাম।'

আমি তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখি, সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে গল্পটা শোনবার জন্য। ওর কৌতূহল দেখে গল্পটা বললাম। তখন সান্ত্রী হাসির আবেগে পেট চেপে কাদাতেই বসে পড়লো, আমি সেই ফাঁকে টুক করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম! দাড়িওলা বোকা, পাঁঠা-টা লালমুখো সাহেবের মুখে মুখ ঘষছো, কল্পনা করতেই হাসির দমকে পেটের মধ্যে যেন গুলিয়ে উঠতে লাগলো।

পরদিন সকালে নাগা-কুলির, এসে পৌছতেই তাড়াতাড়ি ডাম্পটার কাছে গেলাম, যেখানে গতরাত্রে হাতি এসে চাল নষ্ট করেছিল। সাত বস্তার মধ্যে দু'বস্তা বাঁচানো গেল, বাকি পাঁচ বস্তা চাল destroyed by wild elephants বলে একটা ষ্টেট্‌মেণ্ট তৈরী করে সাহেবের টেবিলে রেখে আসলাম। তারপর খোঁয়াড়ের বেড়াটার উচ্চতা বাড়াবার জন্য আট-জন নাগা-কুলিকে জঙ্গলে ডাল-পালা ভেঙ্গে আনবার জন্য পাঠিয়ে দিলাম।

বেলা একটার সময় সাহেব লাঞ্চ খেতে খেতে আমায় ডেকে পাঠালো। আমি হাজির হতেই বললে, আমাদের লস্‌-ষ্টেটমেণ্টটা কর্ণেল সাহেব পাশ করে দিয়েছেন। আর হাতির ব্যাপারে যদি ওই রকম ঘটনা আবার ঘটে, তা'হলে আমরা ফায়ার করতে পারি। আমি এ বিষয়ে কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করে এসেছি। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞাস, করলো, তুমি কখনও শিকার করছো? আমার 'না' উত্তর শুনে সাহেব জানালে,—হাতি শিকারের জন্য মাচা বাঁধা হবে, আমি যদি ইচ্ছা করি সঙ্গে থাকতে পারি। আমি সম্মতি জানিয়ে ফিরে এলাম।

হাতি শিকারের উত্তেজনা আমাকেও তখন পেয়ে বসলো। নাগা-কুলিরা সেখানে মাচা বাঁধছিল, সেখানে এসে দাঁড়ালাম। একটা প্রকাণ্ড বটগাছের আঠারো কুড়ি ফুট উচুতে খাটিয়া বেঁধে মাচা তৈরী হচ্ছিল। হাতির, যে পথ ধরে গতরাত্রে আমাদের ষ্টোরে হানা দিয়েছিল, বটগাছটা তার ছ'হাত দক্ষিণে। বৃষ্টির জন্য মাচার উপরে তিনখানা বর্ষাতি দিয়ে একটা আচ্ছাদন করা হলো। রাইফেল রাখবার ষ্ট্যাণ্ড, লতা-পাতার আড়াল—সবকিছু নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করে ক্যাপ্টেন হ্যাণ্ডসন্‌ আমায় রাত্রি দশটার সময় তৈরী থাকতে বললো।

রাত্রি দশটা বাজতেই সাহেবের আর্দালী গোবিন্দন্‌ আমায় ডেকে নিয়ে গেল। মাচায় আর কে কে থাকবে—জানতাম না, জিজ্ঞাসাও করিনি। হাতি

শিকারের উপযুক্ত হাতিয়ার আমাদের ছিল না, গার্ড-রুম থেকে দুটো ৩০৩ বোরের রাইফেল আনা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন চুপি চুপি আমায় বললো— মিলিটারীর এই রাইফেলগুলো হাতি শিকারের পক্ষে হাল্‌কা, সেই কারণে আমরা দু'জনেই একসঙ্গে ফায়ার করবো। তা নাহলে অতবড় জানোয়ারকে ফেলতে পারবো না। গোবিন্দন্ আমাদের পিছনে বসে টর্চের আলো দেখাবে। গোবিন্দন্‌কে আড়ালে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, হাতি এলে ভয় পাবি না তো? একগাল হেসে গোবিন্দন্ জবাব দিল—না আপনার হাত খুব ভাল আমরা জানি, তবে সাহেব আজ লাল-জল একটু বেশী খেয়ে ফেলেছে।

যাই হোক—যথাসময়ে আমরা বাঁশের মই বেয়ে মাচায় উঠে পড়লাম। আমি বাঁ দিকে বসলাম, ক্যাপ্টেন ডানদিকে, আর গোবিন্দন্ একটা পাঁচ-সেলের টর্চ হাতে নিয়ে আমাদের মাঝখানে বসে পড়লো। আমরা যখন মাচায় বসলাম, তার ঘণ্টা দুই আগে বৃষ্টি-পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘন মেঘের আড়ালে চাঁদ-তারার কোন অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি ক্যাপ্টেনের দেখাদেখি একটুও নড়াচড়া না করে চুপ করে বসেছিলাম। এক সিগারেট খাওয়া ছাড়া আমার কোন কষ্ট হয়নি। বেশ লাগছিল মাচায় বসে থাকতে, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের পরই অস্বস্তি আরম্ভ হলো।

পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেল, কোমর ব্যথা করতে লাগলো—কেবলই একটু নড়ে-চড়ে বসতে ইচ্ছা হচ্ছিল ; কিন্তু ক্যাপ্টেনের ভয়ে কষ্ট করে চুপ করে থাকতে হলো। গোবিন্দন্ ও উস্‌খুস্ করছিল। ক্যাপ্টেন ওর উরুতে এমন এক চিম্‌টী কাটলো, যে, গোবিন্দন্ তৎক্ষণাৎ যদি না তার মুখে হাত চাপা দিত, তো উঃ শব্দটা সেই নিস্তব্ধ রাতে অনেকদূর ছড়িয়ে পড়তো।

এমন সময় আবার বৃষ্টি এল। বর্ষাতির উপর জলের ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগলো টপ টপ করে, বৃষ্টির ঝাটে আমাদের জামা-কাপড় ভিজে যেতে লাগলো। তখনও হাতির দেখা নেই। আমার কেবল মনে হতে লাগলো গতরাত্রে যদি আগুন না জ্বালা হোত—তাহলে হাতির দল চালের লোভে ততক্ষণে ঠিক এসে হাজির হোত। অসংখ্য পোকা-মাকড়ের ডাক আর ব্যাঙের গ্যাঙোর-গ্যাঙোর শুনতে শুনতে রাত দুটো বেজে গেল, তবুও হাতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তখন ক্যাপ্টেন প্রস্তাব করলে,—আজকের মত তাঁবুতে ফিরে যাওয়া যাক, আগামী কাল নিশ্চয়ই আসবে।

পরের রাতটাও মাচায় কাটাতে আমার যেমন এতটুকু ইচ্ছা ছিল না, তেমনি রেহাইও ছিল না। কেন না, ক্যাপ্টেন আমায় হাতি শিকারের পার্টনার করে নিয়েছে—অতএব আমি যেতে বাধ্য। আর গোবিন্দন্-এর কোন ওজর-আপত্তি না শুনে তাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। আবার

সেই বাঁশের মই বেয়ে মাচায় একঘেয়ে বসে থাকা। কোমর-পিঠ ব্যথায় টন্‌টন্‌ করতে লাগলো। তবুও অতন্দ্র প্রহরীর মত জঙ্গলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম। হাতির কোন সাড়া শব্দ নেই, এমন কী 'লঙ্গর-খানার' ধারে যে শিয়ালটাকে ঘোরাফেরা করতে দেখলুম—তারও দেখা মিললো না। পোকা-মাকড়গুলো একভাবে ডেকে চলেছে, সৌভাগ্য সেদিন আর বৃষ্টি হয়নি। বসে বসে ঘুম পেতে লাগলো।

এমন সময় কাদায় পুতে যাওয়া ভারি পা টেনে তুললে যেমন শব্দ হয়, তেমনই চটাং-চটাং শব্দ কানে এলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি সোজা হয়ে বসলুম, ক্যাপ্টেন আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ইসারা করলো। তখনও আমি কিছু দেখতে পাইনি, এমন সময় মড়মড় করে ডাল ভাঙ্গার শব্দ হলো। শব্দটা যেদিক থেকে এসেছিল, কান পেতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় মনে হলো; অন্ধকারে কী যেন একটা দেখতে পাচ্ছি। ক্রমে সেটা স্পষ্ট হলো, প্রকাণ্ড চেহারার ছায়া-মূর্তিগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। পাঁচটা হাতি পরপর লাইন দিয়ে হেলে-দুলে অগ্রসর হচ্ছিল।

কোন হাতিটাকে গুলি করবো—এই কথা চিন্তা করছিলাম। ক্যাপ্টেন হাণ্ডসন্‌ কি করে আমার মনের কথা জানলো বলতে পারবো না, কানের কাছের কাছে মুখ এনে হঠাৎ ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো—যে হাতির উপর আলোটা স্থির হয়ে থাকবে, তার মাথায় গুলি করতে হবে। হাতিগুলো তখনও পঞ্চাশ গজ মতন দূরে ছিল, আমি রাইফেলটা রেডি করে রাখলাম। প্রকাণ্ড চেহারার হাতিগুলো যতই এগিয়ে আসতে লাগলো, ততই উত্তেজনায় আমার হাত-পা কাঁপতে লাগলো। দেখতে দেখতে ক্রমে সেই ভাবটা কেটে গেল, তখন হাতির পাল প্রায় আমাদের গাছতলায় পেঁছে গেছে।

তখন ক্যাপ্টেনের ইসারা পেয়ে গোবিন্দন্‌ প্রথম হাতিটার মাথায় আলো ফেললো, তারপর আলোটা সরিয়ে সরিয়ে অপর হাতিগুলোর মাথায় ফেলতে লাগলো। আলোটা নড়াচড়া করতেই হাতির দল থমকে দাঁড়াল। সেই অবসরে ক্যাপ্টেন, গোবিন্দন্‌-এর হাতটা শক্ত করে ধরে তৃতীয় হাতিটার মাথায় স্থিরভাবে ফেলে রাখবার ইঙ্গিত করেই রাইফেল তুলে নিল। আমি হাতিগুলোকে দেখতে দেখতে আড়চোখে আলোর ব্যাপারটা বুঝে ফেললুম, তারপর মনে মনে এক-দুই-তিন গোনার শেষে তৃতীয় হাতিটার মাথা লক্ষ্য করে ৩০৩ বোরের রাইফেলটার ট্রিগার টেনে দিলাম।

দুটো আওয়াজ প্রায় একই সঙ্গে হলো। 'ক্যাঁক' করে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলেই শুঁড়গুলোকে মুখের কাছে গুটিয়ে নিল, তারপর মুহূর্তের মধ্যে পিছন ফিরে হুড়মুড় করে বন-জঙ্গল ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে পালাতে লাগলো। প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড দেহগুলো পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে যে দৌড় শুরু করলো, তা দেখে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

যে হাতিটার মাথায় গুলি লেগেছিল, সেই হাতিটা ক্রমশই পিছিয়ে পড়তে লাগলো। আর দৌড়তে না পেরে থপ্ থপ্ করে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে দাঁড়াল। তারপর প্রবল জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে সেইখানে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো। শুঁড়টাকে যতদূর সম্ভব লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে আছড়া-আছড়ি করতে লাগলো। তারপর হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভীষণ চিৎকার শুরু করে দিল। হাতিটা প্রথমে যেভাবে দৌড় শুরু করেছিল, তা দেখে আমরা ভেবেছিলাম—হালকা রাইফেলের গুলির কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।

এমন সময় একটা জীপ এসে আমাদের গার্ড-রুমের কাছে দাঁড়াল। দু'জন অফিসার সান্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলছেন দেখে ক্যাপ্টেন হাণ্ডসন্ তাড়াতাড়ি মাচা থেকে নেমে ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেল। আমরাও নেমে পড়লাম। হাতিটাকে দেখবার জন্য ওরা এগিয়ে আসতেই, আমি রাইফেল নিয়ে জীপে উঠে পড়লাম। হাতিটা দু'শো গজ মতন দূরে স্থির হয়ে পড়েছিল। জীপটা কাছে আসতেই হঠাৎ ধড়মড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। প্রবলভাবে পাগুলো ছুঁড়তে লাগলো। তখন ওর মাথার কাছে গিয়ে আরও একজোড়া গুলি করতেই হাতিটা মরে গেল। মোট পাঁচটা হাতি এসেছিল, তার মধ্যে দু'টি দাঁতাল আর তিনটি মাদী। আমরা যেটাকে গুলি করেছিলাম, সেইটাই আয়তনে মস্ত বড়। তবে দাঁত অতি নগণ্য, মাত্র দু'ফুট লম্বা।

হাতিনা মারা পড়েছিল রাত তখন তিননে। খুব আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, সেই রাত্রেই খবরটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভোর হতে না হতে না হতেই নাগাকুলিরা হাতিটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, দাঁতদুটো বার করবার কথা বলতেই ওরা ছুরি-কুড়ালের সাহায্যে আড়াই-ঘণ্টার মধ্যে দাঁতদুটোকে নিখুঁতভাবে কেটে বার করলো। তারপর প্রকাণ্ড হাতিটা কেটে খণ্ড খণ্ড করে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিল, না খাওয়ার জন্য কোথাও লুকিয়ে রাখলো—বোঝা গেল না।

দাঁতদুটো প্রায় একই মাপের। কর্ণেল সাহেবেকে একটা দাঁত উপহার দেওয়া হলো, আর অপর দাঁতটা কেটে অর্ধেকের বেশী ক্যাপ্টেন হাণ্ডসন্ রেখে দিল। তখন বাকি অংশটা দু'ভাগ করা হলো। গোবিন্দন্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম, এইটুকু দাঁত নিয়ে কী করবি? গোবিন্দন্ মাদ্রাজের মালিয়ালাম গোষ্ঠির লোক। এক গাল হেসে বললো—বৌয়ের শাঁখা গড়িয়ে দেব।

আমার তখন কোন বন্ধন ছিল না। মোবাইল-ক্যান্টিনের সার্জেণ্ট-ইন্-চার্জ মিস্ ম্যাগী, খবর শুনে একদিন জোর করে হাতির দাঁত কেড়ে নিয়ে গেল।

ওয়াইল্ড-উড্‌বাইন সিগারেটের কয়েকটা কার্টুন ছাড়ে দিয়ে বলেছিল—ডারলিং এই শুভ্র বস্তুটি থেকে মেয়েদের অলংকার হয়, তুমি কী করবে!

ম্যাগী হয়তো ঠিকই বলেছিল। বর্ষার মেঘ সরে গিয়ে ধীরে ধীরে নীল আভা দেখা যাচ্ছিল আকাশে। আর ক'দিন পরেই মুহুর্মুহু কামানের গোলা এসে পড়বে আমাদের এ পাহাড়ে।

পাগলা হাতি

একটা হাতি ক্রোধে অন্ধ হয়ে যখন পাগলা হয়ে যায়, তখন তার বেপরোয়া কাণ্ড-কারখানা দেখে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। মানুষকে আর ভয় করবে না—এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তখন সে লোকালয়ে আসে। তারপর শুরু হয় তার ধ্বংসের খেলা।

উনিশ-শো একষট্টি সালের আগষ্ট মাসে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়বেতা ও চিনাপুর থানার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একটি বন্য হস্তীর আবির্ভাব হয়। হাতিটা বনের গাছপালা খেতে খেতে গ্রামের ধারে উপস্থিত হতেই ওর পিছনে ধাওয়া করা হলো। ফলে হাতিটা ভয় পেয়ে পালাল না তো বটেই, বরং ওর ক্রোধাগ্নিতে আরও ইন্ধন যোগান হলো। হাতিটার অত্যাচার শুরু হওয়ায় জনসাধারণ ভীষণ অসুবিধা ভোগ করতে লাগলো। ক্ষেত, খামার, বাগান নষ্ট করতে করতে হাতিটা উল্লাসে যেন ফেটে পড়তে লাগলো, তখন কয়েকখানি মাটির কুটির ভেঙে ফেললো। পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কতকগুলো গরুর-গাড়ি ভেঙে তছনছ করে ফেললো, অনেক গরু বাছুরও মারা পড়লো।

হাতিটার মেজাজ কেন এমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, আর কেন-ই বা সে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার কোন কারণ জানা যায়নি। যে যে কারণে হাতি বিদ্রোহী হয়, দল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়—তার কোন চিহ্ন ওর শরীরে ছিল না। মাত্র সাত ফুট উঁচু একটা হাতির যতই উচ্চাশা বা প্রাণশক্তির প্রাচুর্য থাক—দলপতি হওয়ার যোগ্যতা হাতিটার ছিল না। দেড় ফুটের মত লম্বা দুটো দাত, আর সাত ফুট উচ্চতা নিয়ে যদি হাতিটার দলপতি হওয়ার বাসনা হয়ে থাকে; বা দলের হস্তিনীদের প্রতি নজর দিয়ে থাকে—তা হলে তার পরাজয় অনিবার্য। প্রচণ্ড লড়াইয়ের শেষে অধিকতর অভিজ্ঞতা ও দৈহিক ওজনের অধিকারী হিসাবে দলপতির যখন জয় হয়, তখন বিদ্রোহী তরুণ হাতি

অনিচ্ছা সত্বেও দলত্যাগ করতে বাধ্য হয়। লড়াইয়ের ফলে সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত,—দীর্ঘদিন যন্ত্রণায় ভুগতে ভুগতে পাগল হয়ে যায়, তখন যে কোন প্রাণীকেই সে তার শত্রু বলে মনে করে।

এখানে যে হাতিটার কথা লেখা হচ্ছে—তার শীরের কোথাও কোন ক্ষত ছিল না, এবং দাঁতও ভাঙ্গা ছিল না। লড়াইয়ের পরিণামে তাকে দলত্যাগ করে একা ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে, এমন কোন চিহ্ন তার শরীরে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবুও কোন অজ্ঞাত কারণে অত্যন্ত বদ-মেজাজে সে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একদিন একটা গরুর-গাড়ীর পথ ধরে সে নিজের মনে হাঁটছিল, এমন সময় একটা গরুর-গাড়ীর সঙ্গে ওর হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তখন সন্ধ্যা হতে বিশেষ দেরী ছিল না, গাড়ীটা ছিল খড়ে ভর্তি,—সেই পর্বত-প্রমাণ খড়ের গাদা দেখেই হাতিটা রাগে অন্ধ হয়ে গেল। তখন পাগলের মত সে ছুটলো—গাড়ীটা আক্রমণ করে খড়ের গাদাটা তছনছ করার জন্য। হাতিটাকে ছুটে আসতে দেখে গাড়োয়ান ও তার সঙ্গী প্রাণভয়ে লাফিয়ে পালাল, কিন্তু ভারি জোয়ালে বাঁধা গরুদুটোর পালাবার উপায় ছিল না। নিরুপায় হয়ে গরুদুটো ভঁস্ ভঁস্ করে বড় বড় শ্বাস ফেলে আতঙ্কে ছটফট করতে করতে পথ ছেড়ে ধারের নীচু জমিতে নেমে পড়তেই গাড়ীর চাকা উল্টে গেল। ফলে খড় ছড়িয়ে পড়লো, আর গরুদুটো মুখ থুবড়ে জোয়ালে আটকে রইলো।

শুঁড় তুলে ফট্‌ফটিয়ার (মোটর সাইকেল) বেগে দৌড়িয়ে আসছিল হাতিটা। গাড়ীটা পড়ে যেতেই গরুদু'টোর উপর পা তুলে মোটা মোটা পাঁজরাগুলোকে মটমট করে ভেঙ্গে ফেললো। তারপর খড়ের গাদাটা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দলে-পিষে তছনছ করতে লাগলো। সে কাজ শেষ হতেই নজর পড়লো গাড়ীটার উপর। গাড়ীটাকে টুকরো টুকরো করার পর সেখানে যখন প্রাণের কোন চিহ্ন আর পাওয়া গেল না ; তখন হাতিটা শান্ত মনে আবার পথে উঠে এল। হাতির আক্রমণ থেকে যারা অতিকষ্টে প্রাণে বাঁচালো, বা আঘাত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো— তাদের রিপোর্ট যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো। হাতিটার দুর্নাম ক্রমেই ছড়িয়ে পড়লো। অনেক অসাবধানী পথিক তার বিশাল পায়ের তলায় পড়ে, কিম্বা শুঁড়ে ধরা পড়ে গাছের গুঁড়িতে আছাড় খেয়ে চুরমার হয়ে গেল।

এরপর বন্দুক ও পটকার সাহায্যে হাতিটাকে সে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। একমাস তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। সেপ্টেম্বর মাসে যখন ধানের শিসগুলো বেশ পুরুষ্ট হয়ে উঠেছে, নীল আকাশ থেকে হিমেল স্পর্শ নেমে রাতের শেষে যখন ঘাসের বুকে শিশির কণা ছড়িয়ে দিচ্ছিল,— সেই সময় রামগড়ে হাতিটার আবার দেখা পাওয়া গেল। কয়েকদিনের

মধ্যেই হাতিটার কথা সবার মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। গড়বেতা ও চিনপুর থেকে হাতিটার কু-কীর্তির কথা এখানেও এসে পৌঁচেছিল। হাতির আক্রমণ কখন কোনদিক থেকে আসবে, সেই দুর্ভাবনায় সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাতিটা কোথায় লুকিয়ে থাকতো, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলেই বড় বড় পা ফেলে সোজা ধানক্ষেতে নেমে যেত। শিষশুদ্ধ গাছগুলোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার বিশাল জঠর পূর্ণ করতো। যত না খেত তার অনেকগুণ পায়ের চাপে নষ্ট করতো। ক্ষেতের পর ক্ষেত উজাড় হয়ে যেতে লাগলো—দরিদ্র গ্রামবাসীরা মাটির ঘরের দরজা বন্ধ করে অসহায়ের মত শুনতো তার খাওয়ার শব্দ। সম্-বৎসরের ফসলের এই ক্ষতি দেখে নিঃশব্দে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো আর ভাবতো—কিভাবে হাতিটাকে তাড়ান যায়। ক্রমাগত তাড়া খেয়ে খেয়ে হাতিটা ক্রমশই বেপরোয়া হয়ে উঠলো। রামগড়ে এসেও হাতিটা ক্ষেত-খামার আর বাগান নষ্ট করছিল। একদিন হঠাৎ রেগে গিয়ে বনের ধারে কতকগুলো মাটির ঘর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

এই ঘটনার পর জঙ্গলের ধারে যাদের বাস, তারা বাড়ী-ঘর ছেড়ে সন্ধ্যার পূর্বেই পাকা ইস্কুল-বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিত। হাতিটা কখনও কখনও স্কুল-বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যেও এসে পড়তো। বাড়ী-ঘর ছেড়ে যারা প্রাণের মায়ায় স্কুল-বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিত, দুর্ভাবনায় সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারতো না। সকালে ফিরে গিয়ে কী দেখতে হবে, সেই ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়তো।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য হাতিটার সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যেতে লাগলো। যেমন—কোন উঁচু পাড় থেকে ধানক্ষেতে নামার সময় বা ওঠার সময়, হাতিটা একটা বিশেষ পদ্ধতি নিত। উঁচু জমিটার ধারে এসে পিছনের পাদুটো, আর পাছার উপর ভর করে 'স্লিপ' খাওয়ার মত সর্-সর্ করে নীচে নেমে যেত। আবার ওঠার সময় ক্ষেতের উঁচু বাঁধের উপর দাঁতের ভর দিয়ে অতবড় শরীরটাকে অবলীলাক্রমে টেনে তুলে নিত। হাতির বাসের উপযুক্ত জঙ্গল রামগড়ে ছিল না। দিনেরবেলায় ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে যেখানে হাতিটা থাকতো, সেই আসা-যাওয়া পথের উপর গ্রামবাসীরা একদিন কাঁটাতার ও বন থেকে বাবলা কাঁটার ডাল কেটে এনে বিছিয়ে মাটি ও ঘাস পাতা দিয়ে ঢেকে রাখলো। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও হয়নি—উৎসুক গ্রামবাসীরা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল হাতিটার দুর্গতি দেখবার জন্য। এমন সময় হাতিটাকে আসতে দেখা গেল। সবাই ধারণা করেছিল মাটি ও ঘাসে ঢাকা

জায়গাটা হাতি বুঝতে পারবে না। হাতিটা অথম হলেই—যেভাবে হোক তাড়াতে হবে। কিন্তু গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না—যখন দেখলো, হাতিটা হেলে-দুলে আসতে আসতে পথের সেই বিশেষ জায়গায় হঠাৎ থেমে গেল, তারপর শুঁড়টাকে নীচু করে ঘাসের চাবড়াগুলোর উপর ঘোরাতে লাগলো। সন্দেহভাজন হতেই হাতিটা পা দিয়ে ঘাসের চাবড়া সরিয়ে শুঁড় দিয়ে একটা একটা করে সব কাঁটাতার ও বাবলা কাঁটা পথের একধারে জড় করলো। পথ নিষ্কণ্টক হতেই হাতিটা আবার চলা আরম্ভ করলো—কাছে-পিঠে কোন ধানক্ষেত লক্ষ্য করে।

এরপর হাতিটাকে তাড়াবার জন্য আর একবার চেষ্টা করা হলো। হাতিটা সচরাচর যে পথটা ধরে হাঁটে—সেই পথের উপর একটা আগুনের কুণ্ড জেলে রাখা হলো। হাতিটা ইচ্ছা করলে অন্য পথে ঘুরে যেতে পারতো, কিন্তু তা না করে একটা ডোবা থেকে জল এনে সেই আগুন নিবিয়ে তার উপর দিয়ে চলে গেল।

এই সময় মেদিনীপুর টাউন থেকে এক ভদ্রলোক হাতিটাকে মারবার জন্য এলেন। ৪০৫ বোরের একটা উইন্‌চেষ্টারের রাইফেল ও একটা দু-নলা বন্দুক নিয়ে রামগড়ে পৌঁছে ভদ্রলোক শুনলেন যে, হাতিটা দু'মাইল দূরের একটা জঙ্গলে দিনের বেলাটা কাটায়; আর রাত্রির অন্ধকার হলেই রামগড়ের রাস্তায় নেমে আসে। তখন ভদ্রলোক, একজন স্থানীয় সঙ্গীকে নিয়ে দু'মাইল পথ হেঁটে জঙ্গলের ধারে পৌঁছলেন। রাইফেল তৈরী রেখে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে উঁকি দিয়ে হতিটার কোন সাড়াশব্দ পেলেন না। ভদ্রলোকের হাতি শিকার সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, হাতিটা জঙ্গলে নেই এই ধারণা নিয়ে ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে এলেন। তারপর মতলব করলেন—হাতিটা যে পথ দিয়ে যায়, তার ধারে রাত্রে অপেক্ষা করবেন। করলেনও তাই, কিন্তু হাতিটা ঠিক সেই রাত্রেই ধানক্ষেতে এল না।

ভদ্রলোক পরপর আরও দু'রাত গাছের ডালে বসে কাটালেন, কিন্তু হাতির অস্তিত্ব টের পেলেন না। হাতিটার সম্বন্ধে যত গুজব শুনেছিলেন, তার সিকি-ভাগও যদি সত্য হতো—তাহলেও এতক্ষণে ওর শরীরে অন্ততঃ ডজনখানেক গুলি বসানো যেতে পারতো, এই ভেবে ভদ্রলোক নিরাশ হয়ে পড়লেন। হাতিটাকে যদি একবার চোখের দেখাও দেখতে পেতেন! শিকারীর সামনে হাতিটা বের না হওয়ায় গ্রামবাসীরা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হলো। ফিরে যাওয়ার পূর্বে ভদ্রলোক আর একবার দু'মাইল হেঁটে জঙ্গলের ধারে পৌঁছলেন, তারপর

অত্যন্ত সাবধানে হাতিটাকে খুঁজতে লাগলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক খোঁজার পর হাতিটার যখন কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন ভদ্রলোক মাথার ঘাম মুছে একটা গাছতলায় বসে সিগারেট ধরালেন। বিরক্ত হয়ে সঙ্গীকে জানালেন, তাঁকে অনর্থক হয়রানি করা হলো।

এমন সময় কাছেই একটা তিতিরের ডাক শুনে ভদ্রলোক লুব্ধ হয়ে উঠলেন। দুটো চার নম্বর গুলি বন্দুকে ভরে তিতিরের শব্দ লক্ষ্য করে বনের আড়ালে আড়ালে অগ্রসর হতে লাগলেন। তিতিরের ডাকটার উৎপত্তিস্থল আবিষ্কারের চেষ্টায় অত্যন্ত সন্তর্পণে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় বনের মাঝখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিতিরের নেশায় ভদ্রলোক হাতির কথা বেমালুম ভুলে গেলেও, তাঁর সঙ্গী ৪০৫ বোরের রাইফেলটা দু'হাতে ধরে অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে হাতিটারই সন্ধান করতে লাগলেন। যদিও ৪০৫ বোরের রাইফেল ছোঁড়ার কল-কব্জা তাঁর জানা ছিল না।

তিতিরটা মাটির রঙে রং মিশিয়ে ছিল, পায়ের শব্দ পেতেই তীর বেগে ছুটলো বনের দিকে। তিতিরটা যখন বনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল, সেই সময় ভদ্রলোক গুলি করলেন। গুলিটা লাগলো না। মাটি থেকে দু-হাত উঁচু হয়ে তিতিরটা উড়ে গেল। উড়ে যাওয়া তিতিরের অনুসরণে প্রবৃত্ত না হয়ে ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে ফেরার পথ ধরলেন। সেই সময় হঠাৎ শাঁখের মত তীক্ষ্ণ প্রচণ্ড শব্দ ওদের কানে এল, আর শুনতে পেলেন বন-জঙ্গল ভাঙ্গার একটা মড় মড় শব্দ। মুহূর্তে হাতিটার কথা মনে পড়ায়, ভদ্রলোক আর তাঁর সঙ্গী উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে লাগলেন। জঙ্গলের ধারে নীচু মাঠটায় লাফিয়ে পড়তেই ভদ্রলোকের পা মচ্‌কে গেল। কোন গতিকে প্রাণ নিয়ে গ্রামে ফিরে এলেন। একান্ত সৌভাগ্য হাতিটা শুধু চিৎকার করেছিল। ওদের ধরবার জন্য যদি তাড়া করতো, তাহলে দু-জনের মধ্যে একজনকে নিশ্চয় শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারতো ; নয়তো বিশাল পায়ের তলায় পিষে মারতো। রক্ত-হীম-করা একটা চিৎকার শুনেই ভদ্রলোকের হাতি শিকারের শখ মিটে গেল। তল্পি-তল্পা বেঁধে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ী ফিরে গেলেন।

এমন সময় একটা অত্যন্ত শোচনীয় ঘটনা ঘটলো। যার ফলে হাতিটা সরকারী মহলে অবাঞ্ছিত বা পাগলা হাতি বলে আখ্যাত হলো, এবং জেলা শাসকের তরফ থেকে কাগজে ছেপে শিকারীদের আহ্বান করা হলো— হাতিটাকে মারবার জন্য।

গ্রামের ধারে একটা ছোট মাটির ঘরে এক বুড়ি বাস করতো। তার

আপনজন বলতে ছিল এক নাতি—মেয়ের ছেলে। হাতির উপদ্রব কমে যাওয়ায়, নাতি টাউনে যাওয়ার মতলব করলো। জমি-জমা সংক্রান্ত কাজটা অনেক দিন পড়ে ছিল—যাওয়া হয়ে উঠছিল না। যাওয়ার সময় নাতি, বুড়ি দিদিমাকে ডেকে বললো—সাবধানে রাতটুকু কাটিয়ে দিতে, সকালেই সে ফিরে আসবে। নাতি চলে যেতে বুড়ি সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমুলো। রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা সকালেই করে রেখেছিল, সুতরাং সন্ধ্যাবেলায় তার কোন কাজ ছিল না। বাছুরটাকে শোবার ঘরের এককোণে বেঁধে রাখলো। ভাঙ্গা গোয়াল ঘরটা পড়ে যাওয়ার পর, সামর্থ্যের অভাবে আর মেরামত করা হয়নি।

বাছুরটাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে বুড়ি ঘরের খিলটা ভাল করে বন্ধ করে দিল, তারপর লম্ফটা জেলে চুপ করে বসেছিল। হাতির উৎপাত শুরু হওয়া থেকে সমস্ত গ্রামেই এই ব্যবস্থা। সকাল সকাল ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকা, অনেকে ভয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারতো না। হাতিটার পায়ের শব্দ কানে এলে কেউ টুঁ শব্দটিও করতো না। মেদিনীপুরের শিকারী রাইফেল নিয়েও কিছু করতে পারলেন না। বরং হাতির তাড়া খেয়ে তাঁর পা মচ্‌কে গেল। এই ঘটনার পর গ্রামবাসীদের দুর্ভাবনা বেড়ে গেল, রাতের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে লাগলো।

বসে বসে বুড়ির ঘুম এসেছিল, এমন সময় নৈশ স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে এক তীক্ষ্ণ বিকট শব্দ হলো। শব্দটা এত কাছে থেকে হলো, যে বুড়ি ধড়মড়িয়ে উঠে ভাবলো—হাতিটা বোধহয় ঘরের মধ্যেই ঢুকে পড়েছে। তাড়াতাড়ি দরজার খিলটা যথাস্থানে আছে দেখেও বুড়ি ভয়ে কাঁপতে লাগলো। বাছুরটাও তখন দড়ি টান-টান করে এগিয়ে এসে কান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জনটার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করছিল। বুড়ির ভাবনা হলো—হাতিটা হয়তো তার ঘরের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুরণো মাটির ঘরে যদি হাতিটা গা ঘষে, তাহলেই নড়বড়ে দেয়াল ভেঙ্গে পড়বে। নাতিটাও ঘরে নেই, যে এই বিপদের সময় বুদ্ধি জোগাবে। তখন বুড়ি অনেক হিম্মৎ করে ঘরের জানালাটা খুলে উঁকি দিয়ে দেখলো—হাতিটাকে দেখা যায় কিনা। ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ—কোথাও এতটুকু আলো নেই, টিন পেটাবার শব্দ নেই। মৃত্যুর স্তব্ধতার মাঝে কোথায় দাঁড়িয়ে পাগলা হাতিটা আক্রোশে ফুঁসছে কে জানে!

বাছুরটাও যেন বিপদের আঁচ পেয়েছিল। দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ভয়চকিত দৃষ্টি মেলে বিহ্বলের মত তাকিয়ে ছিল বুড়ির দিকে। বাছুরটার

হাবভাব দেখে বুড়ির সন্দেহ গভীর হলো, তখন ভাবলো—এমন একটা কিছু করা দরকার, যাতে হাতিটা অন্যত্র সরে যায়। জলন্ত লম্ফটা জানলার বাইরে ঠেলে দিতেই হাওয়া লেগে দপ্-দপ্ করে শিখাটা জ্বলতে লাগলো। বুড়ি আশা করেছিল, লম্ফের আগুন দেখেই হাতিটা স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু তা তো হলোই না—বরং জ্বলন্ত লম্ফের আগুনটাই বুড়ির কাল হলো।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ লম্ফের আলোটা চোখে পড়তেই, হাতিটা ধ্বংসের আনন্দে আর একবার চিৎকার করে উঠলো ; সেই সঙ্গে ভারি পা ফেলে সবেগে ধেয়ে এল। বাঁশের কাঠামো মড়্-মড়্ করে ঝুলে পড়লো, বাছুরটা ডাকতে লাগলো, আর বুড়ি সাহায্যের জন্য পরিত্রাহী চিৎকার করতে লাগলো। সেই নারকীয় কাণ্ডের মধ্যে গ্রামবাসীরা তারস্বরে চিৎকার করতে করতে টিন বাজাতে লাগলো, বড় বড় কাঠের গুঁড়িতে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালা হলো। তবু হাতিটা ভয় পেল না। প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটির দেয়াল সশব্দে ভেঙ্গে পড়লো—খড়ের চালটা হেলে গেল একদিকে। তখন পাগলা হাতিটা সেই ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে হেঁটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

হাতিটা চলে যেতে গ্রামবাসীরা সেই ধ্বংসের স্তূপ থেকে বুড়িকে টেনে বার করলো, মুখে চোখে জল দিয়ে বাতাস করা হলো—তবুও বুড়ির জ্ঞান ফিরে এল না। হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, যা হাতের গোড়ায় তখন পাওয়া গিয়েছিল, তাই প্রয়োগ করা সত্ত্বেও ভোরবেলা বুড়ি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। বাছুরটা দেয়াল চাপা পড়ায় একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল। সকাল হতেই গ্রামে হুলস্থুল কাণ্ড পড়ে গেল। দলে দলে লোক এসে ভীড় করতে লাগলো, পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করলো। তারপর বিকালে একদল পুলিশ এসে তাঁবু ফেললো। হাতিটাকে রামগড় থেকে তাড়াবার জন্য জঙ্গলের ধারে গিয়ে ৩০৩ বোরের রাইফেল থেকে কয়েক রাউণ্ড গুলি ছোড়া হলো। সবশেষে একটা গুজব শোনা গেল—পুলিশের গুলিতে হাতিটা সাংঘাতিক জখম হয়ে লালগড়ের জঙ্গলে পালিয়ে গেছে।

মেদিনীপুরের ডি.এম.-এর নিকট হাতি-শিকারের অনুমোদনপত্রের জন্য একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলুম, তখন পর্যন্ত কোন উত্তর পাইনি। উপরিউক্ত ঘটনার প্রায় বাহাত্তর-ঘণ্টা পরে কালেক্টরের অফিসে এসে দেখলাম—হাতিটার ইতিবৃত্ত নোটিশবোর্ডে টাঙ্গানো রয়েছে। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। উপদ্রুত এলাকায় তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হলে চন্দ্রকোণার উপর দিয়ে যাওয়াই সব থেকে সুবিধা, এই কথা শুনে, বেশ কয়েক মাইল গাড়ি দিয়ে

চন্দ্রকোণার বাস-স্ট্যাণ্ডে হাজির হলাম। বিকাল চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগলো, খোঁজ-খবর নিয়ে অবশেষে জানতে পারা গেল—যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যই বাসের দেরী হচ্ছে। সন্ধ্যার মধ্যে বাস না এসে পড়লে সারারাতই আমায় চন্দ্রকোণার চটিতে পড়ে থাকতে হবে। সকালের আগে আর কোন যানবাহন পাওয়া যাবে না।

অত্যন্ত বিরক্তি আর অস্থিরতার মধ্যে রাত ভোর হলো, তারপর বাসে চেপে রামগড়ের কাছে নামলাম। সেখান থেকে আবার হু'মাইল হেঁটে যখন ঘটনাস্থলে পৌছলাম, তখন বেলা বারোটা। সেখানে পুলিশের যে তাঁবু পড়েছিল তার ইন্‌চার্জ একজন সাব ইন্সপেক্টর! অফিসারটি তখন সেখানে ছিলেন না। বিকাল তিনটের পর দেখা হবে—এই খবর শুনে গ্রামে ফিরে আসতেই কয়েকজন গ্রামবাসী আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য এগিয়ে এলেন। আমার কাঁধে রাইফেল দেখে আন্দাজ করেছিলেন যে, আমি একজন শিকারী এবং হাতিটার সন্ধানেই এসেছি।

তখন গ্রামবাসীরা আমায় শেষ ঘটনার জায়গায় নিয়ে গেল। ভাঙ্গা মাটির ঘরটা তখনও পরিষ্কার করা হয়নি। বুড়ীর মৃতদেহ সৎকারের পর নাতি কোন আত্মীয়ের বাড়ী চলে যাওয়ায়, তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো না। হাতিটার পায়ের ছাপ ও অন্যান্য নিদর্শনগুলো যখন ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, তখন পুলিশের একজন (সাদা পোশাক পরা) আমায় জানালো যে—হাতিটা লালগড়ের দিকে চলে গেছে। ওর পিছনে পিছনে পুলিশের একটা দলও লালগড় অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে। আমি লালগড় পুলিশ ক্যাম্পে হাতির খবরাখবর পেতে পারি। তাছাড়া হাতিটাকে মারবার ব্যাপারে ওরা আমায় সাহায্য করতে পারবে।'

তখন হু'জন লোক ঠিক করে আমার বিছানা ব্যাগ ওদের মাথায় তুলে দিয়ে আমি লালগড়ের দিকে যাত্রা করলাম। লালগড়ের দূরত্ব ওখান থেকে প্রায় আড়াই-তিন মাইলের মত শুনেছিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা হেঁটেছিলাম সাড়ে চার মাইলের উপর। পথে যেতে যেতে হাতির পুরনো পায়ের ছাপ, শুকনো নাদি চোখে পড়ছিল। পরীক্ষা করে, দেখা গেল, চিহ্নগুলো অন্তত দশ-বার দিনের পুরণো। হাতি অনুসরণ করা বলতে যা বোঝায়—আমার এ অভিযানে সেরকম কোন উত্তেজনা বা আশঙ্কা ছিল না। সতর্ক হয়ে সন্তর্পণে চলার কোন প্রশ্ন ছিল না, কেননা আমি ও আমার মোটবাহকেরা চলছিলাম খোলা-মাঠ, বাগান, আর গ্রাম্য ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে।

যদিও হাতিটা এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই চলাফেরা করতো। আমাদের উদ্বিগ্ন না হওয়ার কারণ—আমাদের হাতে ছিল ৪৫০।৪০০ বোরের একটা ভারি দো-নলা রাইফেল, যেটাকে একটা মোক্ষম অস্ত্র বলে মনে করতুম। তাছাড়া যথেষ্ট দিনের আলো ছিল, হাতিটা সচরাচর অন্ধকার রাতগুলো পছন্দ করতো।

খুব দ্রুত হেঁটেও পাঁচটার আগে পুলিশ-ক্যাম্পে পৌছন গেল না। লালগড় বেশ বড় গ্রাম, গ্রামের মেঠো-পথ ধরে ঘুরে ঘুরে 'হাটতলায়' এসে পৌছন গেল। সেখানে এক কাপ করে গরম চা খেয়ে নদীর ধারে এলাম পুলিশ-ক্যাম্পে। কাঁসাই নদীর একটা ধারা মহকুমার পচাপানী, বলরামপুর হয়ে লালগড়ের উপর দিয়ে মেদিনীপুরের ভীমপুরে প্রবেশ করে মূল নদীর সঙ্গে পুনঃ মিলিত হয়েছে। পুলিশ-ক্যাম্প থেকে নদীর দূরত্ব প্রায় আধ মাইল, নদীর এ ধারটা জংলা জায়গা। বর্ষার জলে পুষ্ট হওয়া ঝোপ-ঝাড় আর লতা-পাতায় ঘন-সন্নিবদ্ধ। হাতিটা রামগড়ে তাড়া খেয়ে খুব সম্ভব নদীর ধারের বনটায় এসে লুকিয়েছে।

পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করলাম। থানায় চেয়ার-আসীন পুলিশ অফিসার আর হাতি-মারা ক্যাম্পের পুলিশ অফিসারের মধ্যে অনেক প্রভেদ লক্ষ্য করলাম। সে মহিমা, গাম্ভীর্য, দম্ভ নেই—জনসাধারণকে অর্বাচিন্ ভাবার সে অহং ভাবও নেই, সাধারণ ভদ্রলোকের মত সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন। সুনীল নামে একজন কনেষ্টবলকে চায়ের অর্ডার দিয়ে আমার সম্বন্ধে যা জ্ঞাতার্থ কৌশলে জেনে নিয়ে হাতিটার কথায় ফিরে এসে বললেন—খুনীর পিছনে আসে পুলিশ, আর মানুষখেকো বা পাগলা হাতির পিছনে আসে শিকারী। হাতিটার মধ্যে দুটো বদ্-অভ্যাসের সমন্বয় ঘটেছে বলেই লালগড়ের জঙ্গলে আমাদের দেখা হলো। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অফিসারের কথা শুনছিলাম। ভদ্রলোক জানালেন—হাতিটার উপর তিন-চারটে খুনের পরোয়ানা হয়েছে। রামগড়ের এক বুড়িকে অকারণে হত্যা করার পরই পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া রয়েছে। চার-পাঁচ রাউণ্ড গুলি ছোড়ার ফলে হাতিটা জখম হয়েছে কি-না জানি না, তবে ভয় পেয়ে লালগড়ে পালিয়ে এসেছে। এখন ওকে নদীর ওপারে তাড়িয়ে দিতে পারলেই ডিউটী শেষ।

গুণ্ডা হাতি মারার কোন বিশেষ টেক্‌নিক্ আছে কি-না জিজ্ঞাসা করায়, আমি আফিসারকে হাতি-শিকারের কয়েকটা গল্প শোনালাম। শিকারীদের

সরাসরি না ডেকে পুলিশ পাঠানোর সমালোচনা করে অফিসার বললেন—ট্রেনিং-সেণ্টারে শিকারের পাঠ শুরু হলেই ষোল কলা পূর্ণ হবে। একটা ঘুঘু পর্যন্ত শিকার করিনি, অথচ গুণ্ডা-হাতি মারার হুকুম নিয়ে লালগড়ে এসে ক্যাম্প ফেলতে হয়েছে—বুঝুন অবস্থাটা একবার।

যাই হোক—আগামীকাল সকালে জঙ্গল ঘেরাও করে পুলিশি-অভিযানে আমি সাহায্য করতে পারবো ভেবে ভদ্রলোক আনন্দ প্রকাশ করলেন। তখনও পৌনে ত্'ঘণ্টা সময় হাতে ছিল। জঙ্গলটা একবার ঘুরে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই অফিসার খুব আগ্রহের সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সুনীল ও আর একজন কনষ্টেবলকে জঙ্গলে যাওয়ার জন্য তৈরী হওয়ার হুকুম ছুঁড়ে দিলেন। আমি মোট-বাহকদের প্রাপ্য মিটিয়ে দিতেই ওরা চলে গেল। বিছানা-ব্যাগ ক্যাম্পে রেখে রাইফেল ও পাঁচটি গুলি বের করে ক্যাম্পের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। পাঁচ-মিনিটের মধ্যে ওঁরাও এলেন। ত্'জনের পরিবর্তে তিনজন কনষ্টেবল সঙ্গে নিয়ে অফিসার ও আমি নদীর ধার দিয়ে জঙ্গলের ধারে এসে পৌঁছলাম।

ঝোপ-ঝাড় আর লতাপাতার জঙ্গল, বর্ষার প্রাবল্যে বেশ সতেজ আর ঘনসন্নিবদ্ধ। খুব সন্তর্পণে ঝোপ-ঝাড় পাশ কাটিয়ে, আগাছা ডিঙ্গিয়ে নিঃশব্দে বনের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমার ৪৫০/৪০০ বোরের রাইফেলটার সঙ্গে ওঁদের ৩০৩ বোরের চারটি রাইফেল বাগিয়ে পাগলা হাতিটার সন্ধানে গুঁড়ি-মেরে হাতিটার অবস্থান নির্ণয়ে লিপ্ত হলাম। ইতস্তত ঘোরার পরও হাতিটার পায়ের ছাপ দৃষ্টিগোচর হলো না, তখন একটা পায়ে চলা সরু পথ ধরে অগ্রসর হলাম। সন্ধানী দৃষ্টি ফেলেও কোথাও হাতিটা দেখা গেল না, বা তার উপস্থিতি টের পাওয়া গেল না।

খুব মামুলি জঙ্গলেও হাতি অসম্ভব কৌশলে এমন আত্মগোপন করে থাকতে পারে যে—একেবারে ঘাড়ের উপর না এসে পড়া পর্যন্ত টের-ই পাওয়া যায় না। যে কোন ঝোপের আড়ালে থেকে লম্বা শুঁড়টা বেরিয়ে এসে গলা জড়িয়ে ধরতে পারে ভেবে আমি রাইফেলের সেফটী খুলে রেখেছিলাম। এমন সময় একটা শব্দ হলো, আমি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে শব্দটা অনুমান করবার চেষ্টা করছিলুম। পুলিশ অফিসারটি খুব তাড়াতাড়ি আমার পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের শব্দ হলো? আমি তাঁকে চুপ করে থাকবার ইসারা করে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, কিন্তু আর কোন আওয়াজ হলো না। তখন পুলিশ অফিসারকে বললাম—শব্দটা হাতির ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন মনে

হচ্ছে কোন কাঠ-ঠোকরা পাখি গাছের ফাঁপা ডালে ঠোঁট ঠুকে শব্দ করছিল। পাখিটা উড়ে আমাদের পিছন দিকের কোন গাছে বসলো।

একটা হাতিকে যখন অনুসরণ করছি—তখন একজন পুলিশ অফিসার আর তিনজন কনষ্টেবল গুলিভরা রাইফেল নিয়ে আনাড়ীর মতন স-শব্দে পিছু নিলে যে অস্বস্তি বোধ হয়, আমি সেই অস্বস্তির পাত্র হয়ে সভয়ে ওদের রাইফেলগুলো এড়িয়ে অগ্রসর হতে হতে হাতিটাকে যেমন খুঁজছিলাম; তেমনি পিছনে নজর রাখছিলাম রাইফেলের নলগুলোর উপর। ফলে আমাদের গতি ব্যাহত হচ্ছিল আর হাতিটার অনুসন্ধানও ঠিকমত হচ্ছিল না।

ক্রমে দিনের আলো ফুরিয়ে এল, মাথার উপর বড় বড় গাছপালার ছায়ায় বনের তলাটা আবছা-অন্ধকার মনে হতে লাগলো। এক ঝাঁক শালিক পাখী একটা ঝাঁকালো আমগাছে বসে কিচির-মিচির করে তুমুল হট্টগোল করছিলো। আমরা সেই গাছটা পিছনে ফেলে বনের একটা প্রান্তে এসে পৌঁছতেই হঠাৎ নজরে পড়লো, কয়েকজন সাঁওতাল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। পুলিশ দেখে ওরা থেমে গেল। আমি লোকগুলোর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম হাতিটাকে দেখতে পেয়েছ কি না। বুড়ো মতন লোকটা ফিস্‌ফিস্ করে জানালো, হাতিটাকে দেখেই ওরা ভয়ে এদিকে পালিয়ে এসেছে। হাতিটা ওই ওদিক রয়েছে বলে হাত বাড়িয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল, তারপর বললো—বড় ঘাসের বনে ঘুরে ঘুরে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

আমরা সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরে আসব বলে সঙ্গে টর্চ নেওয়া হয়নি। রাইফেলের-মাছি দেখার মত আলো তখনও ছিল। আমি বুড়ো সাঁওতালটাকে সঙ্গে নিয়ে হাতিটার কাছে যাব ঠিক করে পুলিশ অফিসারকে বললাম—আপনারা এখানে চুপ করে থাকুন, আমি এর সঙ্গে হাতিটার দিকে যাচ্ছি বলে বুড়ো সাঁওতালকে সঙ্গে আসবার ইসারা করলাম। রাইফেলের ব্রীচ ভেঙ্গে গুলিদুটো আর একবার দেখে নিয়ে চুপিচুপি অগ্রসর হতে লাগলাম। কিছুদূর আসবার পর হঠাৎ একটা শব্দ শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখি, আমার সঙ্গীরা লাইন দিয়ে আমার পিছনে পিছনে আসছে। পুলিশ অফিসার বললেন, এরা হাতি শিকার দেখবার জন্য আসছে বলে আমার গা ঘেঁসে-দাঁড়ালেন। নষ্ট করবার মত আর এতটুকুও সময় ছিল না। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললাম—খুব নিঃশব্দে আসবেন, একটুও শব্দ যেন না হয়।

প্রায় দশ-মিনিট গুঁড়ি মেরে অগ্রসর হবার পর গাছপালার ফাঁক দিয়ে ঘাসের বনটা চোখে পড়লো। বুড়ো সাঁওতালটা আমায় পায়ে-চলা পথটা

থেকে তখন বাঁ-দিকের একটা ঝোপের তলায় নিয়ে এল। সেখান থেকে আমরা বসে বসে কিছুটা আসতেই ঝোপটা শেষ হয়ে গেল। দেড় কি দু'হাত উঁচু লম্বা ঘাস বনটার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতিটা। লম্বা শুঁড়টা বাড়িয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে বড় বড় ঘাসগুলো ছিঁড়ে মুখের মধ্যে পুরে দিচ্ছে। কুলোর মত মস্ত কান দুটো মাঝে মাঝে পিছনের ঘাড়ে ঝাপটা মারছিল। সৌভাগ্য—বাতাস আমাদের অনুকূলে ছিল। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আলো ফুরিয়ে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি আরও দশ-পনেরো হাত এগিয়ে যাব স্থির করলাম। হাতিটার দূরত্ব ছিল ষাট-সত্তর গজের মত।

আমি ঝোপের আড়াল দিয়ে একটু একটু করে হামা দিয়ে অগ্রসর হয়ে যখন শিমুল গাছটার গোড়ায় এসে পড়েছি, তখন হাতিটা হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করলো। মস্ত কান দুটো স্থির হয়ে গেল, বাঁকা শুঁড়টা ধীরে ধীরে গুটিয়ে মুখের কাছে উঠে এল। কতকগুলো ঘাস তখনও জ'ড়ান ছিল। শিমুল গাছটার পাশ দিয়ে গলা বাড়িয়ে আমি হাতিটার ওই লক্ষণগুলো দেখলুম, রাইফেলটা বাগিয়ে ধরতে আর বড়-জোর আধ-মিনিট সময় লাগতে পারে।

এমন সময় আমার সঙ্গীরা এক এক করে আমার পিছনে জড়ো হতে লাগলেন। তিনজন কনেষ্টবল, একজন দারোগা আর দুজন সাঁওতালকে ঢাকা দেওয়ার মত ঝোপ সেখানে ছিল না। শিমুল গাছটা মাত্র দু'হাত মোটা। আমার পিছনে যেই 'হাট' বসে গেল, অমনি হাতিটা পালাবার জন্য পা তুললো। হাতিটা পালিয়ে যাচ্ছে দেখে, যে অবস্থায় ছিলাম—সেই অবস্থাতেই রাইফেল তুলে ধরলাম। ঠিক সেই সময় একজন কনষ্টেবল একটা বুনো-লতায় পা জড়িয়ে হুড়মুড় করে একেবারে পাশে গড়িয়ে পড়লো। হাতিটা ছোট্ট লেজটা তুলে এমন অবিশ্বাস্য-বেগে দৌড় দিল, যে সেই আবছা অন্ধকারে আমি নিশানা নেওয়ার সময় পেলুম না। ট্রিগার চেপে দিলাম। অথনও রাফেলের মাছি-টা প্রকাণ্ড কালো শরীরের উপর ছিল। গুলিটা লাগতেই 'ক্যাক্' করে শব্দ করে হাতিটা বাঁ-দিকে ঘুরলো, তারপর আমার দিকে পিছন ফিরে নালায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর আধ-মিনিট সময় পেলেই ওর কানের ফুটোয় গুলিটা ঢুকিয়ে দিতে পারতাম, কনেষ্টবলটাকে আমি রাগের মাথায় গালাগাল দিয়ে ফেললাম। যাই হোক—যা হ'বার তা হয়ে গেছে, বৃথা আফশোষ না করে দ্রুত জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। পুলিশ অফিসার কনেষ্টবলকে যথেষ্ট তিরস্কার করতে লাগলেন। হাতিটার আঘাত কত

মারাত্মক হয়েছে,—তার জবাবে বললাম—৪০০ গ্রেনের একটা সলিড নাইট্রো-এক্সপ্রেস্ গুলি ওর শরীরের ঠিক মাঝখানে ঢুকেছে, এর বেশী কিছু আর বললাম না। হাতিটা আমায় যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিল—দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি মারতে পারলাম না, রাগে আমার সর্বাঙ্গ রি-রি করতে লাগলো। সকাল পর্যন্ত যদি হাতিটা থাকে, তা'হলে বীট্ হবে—এই কথা বলে আমি হোটেল ফিরে এলাম।

বুড়ো সাঁওতালটা আমার পিছনে পিছনে আসছিল, ওর কৌতূহল দেখে ওকে হোটেলে এনে এক কাপ চা খাওয়ালাম। তারপর বললাম—কাল সকালে হাতিটার যখন সন্ধানে যাব, তখন ও যদি সঙ্গে থাকে তো ভাল হয়। সাঁওতালটা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—নদীতে এখন বেশী জল নেই। হাতিটা যদি নদী পার না হয়—তাহলে সকালে হাতির খোঁজে সে আমায় সাহায্য করবে। হাতিটার নদী পার হওয়ার সম্ভাবনার কথা এতক্ষণ চিন্তা করিনি, বৃদ্ধের কথা শুনে আমার চিন্তা বেড়ে গেল। তখন বুড়ো সাঁওতাল বললো—সে রাত্রে চৌকিদারের সঙ্গে থাকবে, যদি হাতিটা নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে—আমায় তৎক্ষণাৎ খবর দেবে। আমি আশ্বস্ত হয়ে ওকে বিদায় দিলাম।

আমি পুলিশ-ক্যাম্পে আর গেলাম না। কয়েকজন স্থানীয় অধিবাসীর কাছ থেকে হাতিটার পুরণো গল্প শুনছিলাম। যদিও হাতিটা লালগড়ে মাত্র দু'দিন হল এসেছে—আর এখনও পর্যন্ত গ্রামবাসীদের কোন ক্ষতি করেনি; তবুও গ্রামবাসীরা খুব সতর্ক ছিল। হাতিটা এ অঞ্চলে আসবার অনেক আগেই তার শয়তানির খবরগুলো নিয়মমাফিক এসে পৌঁচেছিল। ওরা আশা করলো আগামীকাল সকালের পুলিশি অভিযানে হাতিটা মারা পড়বে। আমার গুলির প্রতিক্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় বললাম—হাতিটার মারা পড়তে সময় লাগবে।

অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। লালগড়ের হাটতলা ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে গেলে আমি শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে গভীর ঘুমে আছন্ন হলাম, আর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম—হাতিটাকে আমি অনুসরণ করে চলেছি। গভীর বন আর দুর্গম পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে চলেছি তো চলেছিই……। রাইফেলের ভারি গুলিটা দিয়ে হাতির পিঠ ফুটো করে দিয়েছি, আর সেই গর্ত দিয়ে রক্তের ধারা বইছে। আমাদের ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কিছুতেই আহত হাতিটাকে নাগালের

মধ্যে রাখতে পারছি না। আমার সর্বাঙ্গ বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে, দম্ ফুরিয়ে গেছে, আমি গভীর হতাশা আর উত্তেজনায় ভেঙ্গে পড়ছিলাম।

এমন সময় চৌকিদার আর সেই বুড়ো সাঁওতাল দৌড়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে আমায় ঠেলে তুলে দিল। তখন ভোরের আলো ফুটে উঠছে-ওরা খুব উত্তেজিত স্বরে বললো, হাতি নদী পার হচ্ছে—শীঘ্র আসুন! আমার ঘুমের ঘোর মুহূর্তে কেটে গেল। লাফিয়ে বিছানায় বসলাম, তারপর রাইফেল ও গুলি নিয়ে এক-দৌড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

তারপর ছুট—ছুট আর ছুট। পথের দিকে তাকাইনি, পুলিশ-ক্যাম্পে খবর দেওয়া হয়েছে কি-না তাও জিজ্ঞাসা করিনি। একদমে ছুটে জঙ্গলটা পার হয়ে নদীর ধারে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন একেবারে বে-দম হয়ে গেছি। নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছিলাম না। কোন-গতিকে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে নদীর উঁচু পাড়ে উঠে পড়লাম। বুড়ো সাঁওতাল আঙ্গুল বাড়িয়ে দিল—হাতি নদী পার হচ্ছে। ভোরের আলোয় দেখলাম, নদীর মাঝখানের ঢেউ ভেঙ্গে পাগলা হাতিটা ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছে। পিঠের চওড়া হাড়ের খানিকটা, চোখদুটো, আর বাঁকা শুঁড়টা জলের উপর ভাসছিল।

আমি রাইফেলের যখন নিশানা নিলাম হাতিটা তখন নদীর পাড়ের কাছে পৌঁছে গেছে। দেহটা ধীরে ধীরে জলের রেখা ছেড়ে বড় হচ্ছিল। একটা অশ্বত্থ-গাছের ডাল নদীর উপর ঝুঁকে ছিল। হাতিটা পাতার আড়ালে যাওয়ার আগেই, ওর চাওড়া পিঠটা লক্ষ্য করে রাইফেলের ট্রিগার চেপে দিলাম। প্রচণ্ড শব্দ হলো। হাতিটা অতি কষ্টে একটা শব্দ করলো—তারপর বিশাল শরীরটা টেনে-টেনে ওপারে উঠে পড়লো। আমার দ্বিতীয় গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাড়ের খানিকটা ধুলো উড়িয়ে দিতেই হাতিটা অদৃশ্য হয়ে গেল। পুলিস অফিসার কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বুঝতে পারিনি। হঠাৎ বললেন—আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন ঝাড়গ্রামে চলে যান, হাতিটা ওই দিকেই যাবে।

আমি ঝাড়গ্রামে যাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। টলতে টলতে হাতিটা শেষ পর্যন্ত ঝাড়গ্রামে এসে পৌঁছল। আঘাতের যন্ত্রণায় ওর তখন হুঁস ছিল না। সোজা গ্রামের উপর দিয়ে হেঁটে জঙ্গলের একটা গাছে শুঁড় জড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

ঝাড়গ্রামেও হাতিটার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাড়া পড়ে গিয়েছিল। পাগলা হাতিটা এপারে এসেছে আর বেপরোয়ার মত গ্রামের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গেছে, এই কথা শুনে গ্রামের শিকারীরা হাতিটাকে খুঁজতে বেরুল। এমন সময় একটা

বুলেট ওর ছোট্ট কপালের মাঝখানে এসে বিদ্ধ হলো। হাতিটা একটুও চিৎকার করলো না, থর-থর করে ওর বিশাল দেহটা কাঁপতে লাগলো। তারপর হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়লো মাটিতে। মানুষের দরবারে ওর কোন নালিশ শোনা হয়নি, কেন-না—ও খুনী, পাগলা হাতি। শেষবারের মত কাঁপা-শুঁড়টা আকাশে তুলে ধরলো, তারপর আছড়ে পড়লো রক্তে-রাঙ্গা ঝাড়গ্রামের মাটিতে চিরকালের মত…।

শিকারের একটা নিয়ম আছে—প্রথম গুলির দাবিদারকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এ-ক্ষেত্রে হাতিটার উপর বারো বোর বন্দুক থেকে দুটো এল্. জি.-র কয়েকটা ছিটে, আর একটা লিথেল্-বল মারা হয়েছিল। তারপর পুলিশের ৩০৩ বোরের দুটো গুলি লাগে, আর ৪৫০।৪০০ বোরের চার-শো গ্রেনের একটা গুলি ওর পিঠের শিরদাঁড়ার ঠিক নিচেই বিদ্ধ হয়, অপরটা পেটের কাছাকাছি। শেষ গুলিটা ওর কপালে লাগে, ফলে হাতিটা ওখানেই পড়ে মারা যায়।

ধলভূমের রোগ

উনিশ-শো একষট্টি সালে জানুয়ারী মাসে ধলভূম সাব-ডিভিসনের জঙ্গল এলাকায় এক দুষ্ট-হাতির আবির্ভাব হয়। ওর উচ্চতা ছিল মাত্র আট ফুট। হাতির সামনের পায়ের বেড় যে মাপের হয়, তার দ্বিগুন করলেই উচ্চতার সঠিক হিসাব পাওয়া যায়। সামান্য এক-আধ ইঞ্চির তফাৎ হয় মাত্র। কিন্তু কি আসে যায় উচ্চতার তারতম্যে—একটা হাতি যখন 'দুষ্ট' আখ্যা লাভ করে, তখন তার ক্ষুদ্র দুই চোখে ঘৃণা, ক্রোধ আর ধ্বংসের বাসনা নেচে বেড়ায়। দুঃসাহস আর কু-বুদ্ধি দিয়ে পুষিয়ে নেয় উচ্চতার সামান্য অভাবটুকু। একটা বারো ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট হাতি—মানুষ ও গৃহ-পালিত পশুর উপর আক্রোশ মেটাতে গিয়ে যে ত্রাসের সৃষ্টি করে, কয়েক ফুট উচ্চতা কম হওয়ায় তার কোন হেরফের হয় না ; বরং গ্রামের ঝোপ-জঙ্গলে আত্মগোপন আরও বেশী অনায়াস-সাধ্য হয়।

হাতিটার পিঠে কয়েকটা লম্বা লম্বা আঘাতের চিহ্ন ছিল। দাঁত কুড়ি বাইশ ইঞ্চি লম্বা। শোনা যায়, সিংভূম জেলার সারেণ্ডা জঙ্গলের গভীর অঞ্চল থেকে হাতিটা পিঠের লম্বা লম্বা আঘাতের চিহ্নগুলো নিয়ে পালিয়ে এসেছে। হাট গামারিয়া আর গোয়ার মাঝামাঝি জায়গায় হাতির দলটা চরে বেড়াত। দক্ষিণ কোয়েলের তীরে দলের সর্দারের সঙ্গে ওর লড়াই হয়। যৌবন মদ-মত্ত ছোট-খাট হাতিটার মনে দুরাশা হয়েছিল, সে দলের সর্দার হবে। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আর যৌনউন্মাদনায় সে দলপতিকে অগ্রাহ্য করে দলের হস্তিনীদের প্রতি

নজর দিয়েছিল। সর্দারের দৃষ্টি এড়িয়ে কোন যুবতী হস্তিনীকে বনের আড়ালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই, দলপতি সম্ভবত ক্রুদ্ধ গর্জন করে তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। তবুও উন্মত্ত হাতিটা স্থির থাকতে পারলো না, তার দুর্দান্ত যৌন-প্রবৃত্তি মাতাল করে তুললো তাকে। ছোট-খাট সংঘর্ষের পর সে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো।

পরিণামে শুরু হয়ে গেল এক ভীষণ যুদ্ধ। এবং সেই যুদ্ধে অভিজ্ঞ শক্তিশালী দলপতির প্রচণ্ড দৈহিক ওজনের ফলে বিদ্রাহীর পরাজয় ঘটে। বিশাল দাঁতের আঘাতে তার সর্বশরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়, তখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে তরুণ বিদ্রোহী দল-ত্যাগ করে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

তারপর রাগে, ঘৃণায় আর প্রতিশোধের অক্ষম জ্বালায় সে ক্ষেপে পাগল হয়ে যায়। তিক্ত মেজাজে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমেই দূরে সরে আসে। সর্দারের ভয়ে দলে ফিরে যেতে আর সাহস করেনি। এমন অবস্থায় একা একা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একদিন গোলমুরী থানার অন্তর্গত বারহা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়।

বারহা-গ্রামের অধিবাসীরা একদিন সকালে দেখলো একটা প্রকাণ্ড হাতি—থালার মত মস্ত বড় বড় পা ফেলে রাতের কোন এক সময় তাদের গ্রামের উপর দিয়ে হেঁটে গেছে। থালার মত গোল-গোল পায়ের ছাপগুলো দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল, গ্রামের ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ সকলেই মহা কৌতুকে সেই চিহ্নগুলো দেখলো। তারপর অদৃশ্য হাতিটাকে নিয়ে যে-যার মত কাহিনী রচনা করে পরস্পরকে বলে বেড়াতে লাগলো। ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সকলে জেনে গেল, বারহার গ্রামে একটা মস্ত হাতি এসে ঢুকে পড়েছে।

একদিন গভীর রাত্রে গ্রামের পথ দিয়ে সে আসছিল, হঠাৎ এক গৃহস্থের বাড়ীর সামনে কতকগুলো কলাগাছ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। কলা বাগানটা ছিল একটা ডোবার ধারে। হাতিটা পথ ছেড়ে ডোবার পাশ দিয়ে কলা বাগানে এসে পৌঁছল। তারপর পরমানন্দে কলাগাছগুলোকে খেতে লাগলো। এই কাজে যখন সে লিপ্ত ছিল—তখন এক সময় তার নজর পড়লো গোয়ালঘরটার উপর। দেওয়াল-সংলগ্ন একটা খড়ের চালার নীচে দুটো গাই-গরু আর একটা বাছুর খোঁটাতে বাঁধা ছিল। হাতিটা যখন কলা-বাগান নষ্ট করছিল, গাই-গরু দুটো আর বাছুরটা অত্যন্ত ভয় পেয়ে মাটির দেয়াল ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছিল।

হাতিটা খাওয়া বন্ধ করে ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ক্রুদ্ধ চোখে ভয় পাওয়া গরু-বাছুরগুলোকে কয়েক সেকেণ্ড দেখলো। ততক্ষণে রাগ চরমে পৌঁছে গেছে। বড় বড় পা ফেলে সে আক্রমণের জন্য এগিয়ে গেল। ছোট চালাটায় জোর করে প্রবেশ করতেই, বাঁশের খুঁটিগুলো ভেঙ্গে অপল্কা চালাটা নাকের-ডগায় ঝুলে পড়তে সে রাগে অন্ধ হয়ে গেল। তখন বিজাতীয় ঘৃণা আর প্রতিশোধের বাসনায় চালাটাকে এক ঝট্‌কায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সামনের গরুটাকে দেয়ালের গায়ে প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরলো। গরুগুলো এক-সঙ্গে জোরে ডেকে উঠলো। খুঁটিতে বাঁধা অপর গাই-গরু আর বাছুরটা দড়ি ছিঁড়ে পালাবার জন্য হুটোপাটি শুরু করে দিল। গোয়াল-ঘরের দাপাদাপি শুনে গৃহস্থের ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিন্তু বাড়ির উঠোনে হাতিটাকে দেখে ওরা এত ভয় পেয়েছিল, যে হাতিটার কবল থেকে গরু-বাছুরগুলোকে বাঁচাবার কথা মনে হয়নি। নীরব দর্শকের মত হতবাক্‌ হয়ে রইলো।

এদিকে হাতিটা প্রতিশোধের উল্লাসে গরুটাকে মনের সুখে পায়ে দল্‌তে লাগলো। অপর গরুটা ইতিমধ্যে দড়ি ছিঁড়ে প্রাণ নিয়ে পালাল বটে, কিন্তু বাছুরটা দড়ি ছিঁড়তে পারলো না। নিরুপায় হয়ে তার আক্রমণের খোরাক হয়ে আতঙ্কে থর্‌ থর্‌ করে কাঁপতে লাগলো। গরুটার হাড়-গোড় ভেঙ্গে চুরমার করবার পর সে মন দিল বাছুরটার দিকে। শুঁড়ে জড়িয়ে এক-টানে দড়ি ছিঁড়ে তাকে শূন্যে তুলে সজোরে ছুঁড়ে দিল কলা-বাগানের ধ্বংসের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ফুটবলের মত সুট্‌ করে ছুঁড়ে দিল ডোবার ধারে, সেখান থেকে পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল রাস্তায়। ততক্ষণে বাছুরটার গায়ের চামড়া গুটিয়ে ধুলোয় মাখামাখি হয়ে ঝুলছিল। রক্ত-মাংসের দলাটা পথের বাঁক পর্যন্ত টানতে-টানতে নিয়ে এল। নোংরা বস্তুটার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার মত আর কিছু নেই ভেবে সেটাকে ওখানেই ফেলে রেখে মাঠে নেমে পড়ল। তারপর সেখান থেকে কোণাকুণিভাবে চললো 'চিমিতি' গ্রামের দিকে।

পরদিন দেখা গেল—নিহত গরুটার একটা শিং গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেছে, চারটে-পা ভেঙ্গে কুচিকুচি হয়েছে। পাঁজরার হাড় ভেঙ্গে চামড়া ফুটো করে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে আর কিছু নীচের দিকে মাটিতে পুঁতে গেছে। বাছুরটার গায়ের চামড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে ডোবার ধারে রাস্তার ধুলোয় মাখামাখি হয়ে রয়েছে, আর রাস্তার মোড়ে ধুলো মাখা বিবর্ণ একটা মাংসের পিণ্ড, সে-টা যে

একটা আস্ত বাছুর—বোঝবার উপায় ছিল না। গোয়াল-ঘরটা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল, কিন্তু বাছুরটার এক ফোঁটা রক্তও কোথাও পড়েনি।

হাতিটার দুর্ণাম ক্রমশই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বুটা গ্রামটা একেবারে জঙ্গলের ধারে। একদিন দুপুরবেলা সকলেই যখন আহারান্তে ঘরে বিশ্রাম করছিল, তখন এক-পাল ছাগল একটা ফসলের ক্ষেতের উপর গিয়ে পড়লো। কী কারণে সেই সময় হাতিটা জঙ্গলের ধারে এসেছিল—দৃশ্যটা ওর চোখে ধরা পড়লো। তখন হাতিটা নিঃশব্দে ক্ষেতের ধারে এসে পাগলের মত ছাগল-গুলোকে আক্রমণ করে বসলো। কতকগুলো ছাগল কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালালো, পরিত্রাহী চিৎকার করতে করতে যে যেদিকে পারে প্রাণপণে ছুটলো ; কেবল তিনটি ছাগল ওর কবলিত হলো। ছাগল তিনটেকে মেরে কাছাকাছি একটা শুষ্ক ডোবার কাদায় পুঁতে দেওয়ার পর ওর কাজ শেষ হলো। নির্ঝঞ্ঝাটে মনের মত কাজটি শেষ করতে পেরে হেলেদুলে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেল। সঙ্গীদের দুরবস্থা থেকে অব্যাহতি পেয়ে অন্য ছাগল-গুলো একটানা ডেকে চললো। যারা সেই ডাকে আকৃষ্ট হয়ে বাইরে এসেছিল—দৃশ্যটা তাদের চোখে পড়লো। গ্রামের চাষারা কাদা থেকে ছাগল তিনটে তুলে আনবার পর দেখা গেল, সব ক'টিরই ঘাড় ভেঙ্গে গেছে।

ধলভূমে আসার সময় দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে করতে সে কোন মানুষ মেরেছিল কি-না, সে খবর তখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ধলভূমের গ্রামে বাগান, ক্ষেত-খামার, আর গবাদি পশু হত্যা করছিল। তখনও পর্যন্ত কোন মানুষ তার কবলিত হয়নি।

এমন সময় ডিম্‌না-নালা ওয়াটার-ওয়ার্কসের জনৈক কর্মচারীর সঙ্গে আকস্মিকভাবে হাতিটার সাক্ষাৎকার হয়ে গেল। ভদ্রলোকের একটি বিলাতি দো-নলা বন্দুক ছিল। সুযোগ মিললেই পাখি শিকারের আশায়, কোয়ার্টার থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে চিমিতি বা বারহার জলাশয়গুলিতে চলে যেতেন। পানকৌটি আর হুইস্লিং-টিলের বাসা ছিল জলাশয় দু'টি। হাতির উপদ্রবের কথা ভদ্রলোকের জানা ছিল, হাতিটা তখন ঠিক কোন জায়গায় আছে বা মানুষ মেরেছে কি-না তখনও শোনেন-নি। তাছাড়া হাতির মত একটা বিশাল প্রাণীকে দূর থেকে দেখে সাবধান হওয়া যাবে, এই ধারণা নিয়ে ভদ্রলোক বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে রওনা হলেন।

জঙ্গলের একটা সংক্ষিপ্ত পথ ধরে জলাশয়ে পৌঁছে দেখলেন, সাঁপলা আর পদ্মপাতার বনে কতকগুলো পাখী বসে রয়েছে। সবগুলিই বন্দুকের রেঞ্জের

বাইরে। জল-পি-পি-গুলো ডাকতে ডাকতে পাড়ের দিকে এগিয়ে আসছিল। ভদ্রলোক ধৈর্যধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন, দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরার ফল ফললো। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই পানকৌটি আর একটি ইস্লিহং-টিল্ শিকার হলো। পাখী তিনটিকে জল থেকে কুড়িয়ে বাঁ-হাতে ঝুলিয়ে বন্দুক ঘাড়ে রেখে ফেরার উপক্রম করলেন। তখন সূর্য অস্ত গেলেও যথেষ্ট আলো ছিল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর হঠাৎ হাতিটার কথা মনে পড়ে গেল। সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিক তাকিয়েও হাতির মত একটা বিশাল প্রাণীকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে দেখলেন না।

এমন সময় কাছেই একটা বন-মোরগের ডাক ভেসে এল। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন। খালি বন্দুকটায় নিঃশব্দে দু'টো চার নম্বর গুলি ভরে মোরগের ডাক্‌টা লক্ষ্য করে গুঁড়িমেরে এগিয়ে চললেন। মোরগটা যেখান থেকে ডেকেছিল, ডাক্‌টার সেই উৎপত্তি স্থলে অত্যন্ত সন্তর্পণে পৌঁছেও মোরগটার দেখা পেলেন না। শেষ পর্যন্ত মোরগটাকে খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের পথটা ছেড়ে অনেকদূর এসে পড়লেন। মোরগটা গাছের ডাল থেকে ডেকেছিল কি-না বুঝতে না পেরে, বনের শুক্‌নো পাতা এড়িয়ে বনের-তলা ভাল করে দেখতে লাগলেন। গাছের ডালে মোরগটা নেই, সুতরাং মাটিতে বসে বসে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে সন্ধান চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এদিকে সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসছে, সে খেয়াল নেই। একটা ঝোপের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়েছেন—অমনি একটা খস্ খস্ শব্দ হল। মোরগটা কাছে-পিঠে কোথাও আছে মনে করে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়লো, একটা ঝোপের আড়ালে হাতিটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রায় তিরিশ-চল্লিশ গজ দূরে ঘন-ঝোপের সঙ্গে মিশে ছিল হাতিটা। সাদা দাঁতদুটো চোখে না পড়লে অনুমান করা যেত না অতবড় একটা প্রাণী লুকিয়ে আছে। হাতিটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

বনের মধ্যে একটা মানুষের চলা-ফেরা হাতিটার নজর এড়ায়নি। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল—যখন মানুষটা নিঃশব্দে গুঁড়িমেরে তারই দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ভদ্রলোকের একান্ত সৌভাগ্য, ওর শুঁড়ের নাগালের মধ্যে যাওয়ার পূর্বেই হাতিটাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। হাতিটাকে দেখা মাত্রই মনে হয়েছিল, খুন করবার জন্যেই নিঃশব্দে অপেক্ষা করে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি চতুর্গুণ বেড়ে গেল। গলা বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল আর বন্দুক সমেত হাতখানা কাঁপতে শুরু করলো। ভদ্রলোক মুহূর্তের মধ্যে মাথাটা ঝোপের আড়ালে টেনে নিলেন। তারপর যেভাবে এতটা পথ এসেছিলেন, সেইভাবে নিঃশব্দে দ্রুত জঙ্গলের পথটায় ফিরে এসে প্রাণপণে দৌড় শুরু করলেন। এমন জোরে ছুটলেন, যে জীবনে এমন ছোটা আর

কখনও ছুটেছেন কি-না—মনে করতে পারলেন না। জঙ্গলের শেষে ফাঁকা মাঠ নেমে আসবার পর পিছন ফিরে দেখলেন, হাতিটা তাঁকে মারবার জন্য ধাওয়া করেনি। তখন ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়লো, বুকের ভিতরটা যেন ফেটে যাচ্ছিল—অতিকষ্টে কোয়ার্টারে ফিরে এলেন।

পরদিন এক বন্ধুকে ঘটনাটা শুনিয়ে দিলেন। হাতিটাকে তাড়াতে না পারলে শিকার বন্ধ—এই তথ্য উপলব্ধি করতে করতে ছু'বন্ধু পরামর্শ করলেন, যেমন করেই হোক হাতিটাকে তাড়াতে হবে। কয়েকটা এল. জি. আর লিথেল্ বল পকেটে পুরে ছু'বন্ধু একদিন ছুপুরে বনে এলেন। সমস্ত ছুপুর ইতস্তত খোঁজা খুঁজি করেও হাতিটার দেখা পেলেন না, শেষে ক্লান্ত হয়ে একটা গাছতলায় বসে যখন ধুমপান করছিলেন—এমন সময় একটা শব্দ হলো। মড়-মড় করে ডাল ভাঙ্গার একটা শব্দ। চকিতে ছু'বন্ধুর দৃষ্টি বিনিময় হলো, নিঃশব্দে বন্দুকছুটো কুড়িয়ে নিয়ে বনের আড়াল দিয়ে এগিয়ে চললেন। দো-নলা বন্দুকটায় একটি করে এল. জি. আর লিথেল্ লোড্ করা, আর এক-নলা বন্দুকটায় শুধু একটা এল. জি. ভরা ছিল ; এই হাতিয়ার নিয়ে ওঁরা শব্দটা লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে লাগলেন।

কিছুদুর যাওয়ার পর কয়েকটা ছোট ছোট শব্দ হলো, তখন শিকারীরা হাতির কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। এমন সময় দেখা গেল, একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে হাতিটা শুঁড় দিয়ে পাতা সমেত ছোট ছোট ডাল-পালা মুখের মধ্যে পুরে দিচ্ছে। হাতিটা একমনে খাচ্ছে দেখে ওঁরা অত্যন্ত সন্তর্পণে হাতিটার কাছে এসে পৌঁছলেন। বন্দুক ছুটো তুলে নিশানা করবার সময় দেখতে পেলেন, হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে হাতিটা কানছুটোকে একবার সামনে আর পিছনে ঘোরাতে লাগলো। লম্বা শুঁড়টা মুখের নিচে গুটিয়ে নিল, তখন সেখানে একটা ছোট ডাল ধরা ছিল। হাতিটা একেবারে স্থির হয়ে গেল।

ছুম্-ছুম্-ছুম্ করে তিনটে নলই ফাঁকা হয়ে গেল। ছুটো এল. জি. আর একটা বুলেট ওর শরীরে বিদ্ধ হতেই, হাতিটা বিস্ময়কর বেগে ওদের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াল। ঘন বনের মধ্যে যদিও শিকারীদের দেখতে পেল না, তথাপি এমন এক ভয়ঙ্কর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো ; যে শিকারীরা খালি বন্দুক ভ'রে নেওরার জন্য আর এতটুকুও নড়াচড়া করতে সাহস পেলেন না। হাতিটা যেন তীব্রবেগে এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে এমন এক তীক্ষ্ণ প্রচণ্ড চিৎকার করে করে উঠলো, তা শুনে কানের পর্দা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। ওর শুঁড় থেকে ডালটা খসে পড়লো। তারপর প্রচণ্ডবেগে উল্টোদিকে বনের মধ্যে আশ্চর্য ভাবে দৌড়ে চলে গেল। হাতি এত জোরে দৌড়তে পারে, আগে জানা ছিল না বলে শিকারীদের বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না। বন্দুকের গুলিতে হাতির কিছু হলো না দেখে—তার অনুসরণে প্রবৃত্ত না হয়ে শিকারীরা ক্ষুন্ন-মনে ফিরে গেলেন।

সেইদিন রাত্রে বার্হার-গ্রামে হাতিটা একজন মানুষকে হত্যা করলো, একটা মাটির ঘর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। আর গ্রামের ধারে জড় করে রাখা চারখানা খালি গরুর-গাড়ি রাস্তার মাঝখানে টেনে এনে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। সাক্‌চি আর গোলমুরি থানায় হাতির অত্যাচারের অনেকগুলো দরখাস্ত জমা পড়ার পর চাঁইবাসার একজন এস্. ডি. ও. হাতিটাকে মারবার জন্য উপস্থিত হলেন। গ্রামের একটা পাকা বাড়ীতে সাহেবের তাঁবু পড়লো, জীপ আর দামী রাইফেল নিয়ে হাতির সন্ধান চললো।

একদিন-ছ'দিন এইভাবে তিন-দিন কেটে গেল, অথচ হাতিটার দেখা পাওয়া গেল না। হাতিটা আশ্চর্যভাবে জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে বেড়াতে লাগলো। সাহেব আর সময় নষ্ট করতে পারলেন না, চতুর্থ দিন জঙ্গলের একটা পথের হাতির পায়ের দাগ দেখে মাচা বাঁধা হলো। সন্ধ্যার পূর্বে সাহেব জঙ্গলের ধারে জীপ রেখে অল্প একটু হেঁটে মাচায় উঠলেন। সমস্ত রাত নিঃশব্দে কেটে গেল, হাতির কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। উদ্বিগ্ন আর এক-ঘেঁয়েমীর মধ্যে সকাল হতেই সাহেবের প্রহরার শেষ হলো, সেই দিনই তিনি চাঁইবাসায় ফিরে যাবেন। ক্লান্ত হয়ে জঙ্গলের ধারে এসে দেখেন জীপ নেই। চারিদিকে ইতস্তত খোঁজাখুঁজি করতে করতে অন্যান্য লোকজন এসে পড়লো। সাহেবের জীপ পাওয়া যাচ্ছে না দেখে সোরগোল পড়ে গেল। এমন সময় একজন লোক দৌড়ে এসে সাহেবকে জানালো, জীপটা একটা নালায় পড়ে আছে বলে আঙ্গুল বাড়িয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল। কিছুদূর যেতেই সাহের আশ্চর্য হয়ে দেখলেন—চাকার ঘষড়ান দাগ, স্থানে স্থানে বেশ গভীরভাবে ফুটে উঠেছে—সেব সঙ্গে হাতির পায়ের ছাপ।

সাহেবের মাথা ঘুরে গেল। হাতিটা তার উদ্যত রাইফেলের সামনেই আসছিল। পথে জীপটা দেখেই তার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপলো, তখন জীপটাকে ঠেলতে ঠেলতে নালায় এনে ফেললো। তারপর পেট্রোলের গন্ধ হয়তো ভাল না লাগায়, ঘুরে অন্য দিকে চলে গেছে। অপূর্ব সুযোগটা নষ্ট হওয়ায় সাহেবের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। পরে আর একবার চেষ্টা করা যাবে ভেবে তখনকার মত তাঁবু তুললেন। আর হাতিটা বুট্টা, পাগদা, চিমিতি ও বার্হা গ্রামের ক্ষেত-খামার আর বাগানগুলোকে নিজের জমিদারী ভেবে ব'হাল তবিয়েত ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বুলেট আর এল. জি-র জখমগুলো ঘায়ে পরিণত হওয়ায়, এক ঝাঁক্ মাছি লুব্ধ হয়ে তার উপরে সব-সময়ে ভন্-ভন্ করতে থাক্‌লো। ফলে হাতিটা আরও ক্ষেপে গেল এবং তার অত্যাচারের

সীমা ছড়িয়ে গেল। বন-বিভাগ তখনও হাতিটাকে 'রোগ্' বলে ডিক্লেয়ার না করায়—কালেক্টরের অফিসে ক্রমাগত চাপ দেওয়া হতে লাগলো, যাতে হাতিটাকে তাড়াতাড়ি মারা হয়।

একটা ক্ষেতের মাঝখানে চারখানা বাঁশ পুঁতে একটা মাচা বানানো হয়েছিল—বন্য-জন্তুর হাত থেকে ফসল রক্ষা করবার জন্য একদিন দু'জন চাষী মাচায় বসে পাহারা দিচ্ছিল, শীতকাল বলে একটা মাটির গাম্লায় কাঠ-কয়লার আগুন করে তাপ নিচ্ছিল রাতের কন্-কনে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্য। এমন সময় হাতিটা সেই ক্ষেতে এসে হাজির হলো। হাতিটাকে তাড়াবার জন্য যেই ওরা টিন পিটিয়েছে, অমনি হাতিটা ওদের দেখতে পেল। কাঠ-কয়লার আগুনে দুটো শুকনো পাতা দিয়ে ফুঁ দিতেই আগুন জলে উঠলো। অমনি হাতিটা রাগে চিৎকার করে উঠলো। ছোট্ট ল্যাজটা তুলে পাগলের মত ধেয়ে গেল মাচাটা লক্ষ্য করে। ধ্বংসের বাসনায় তখন সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, শুঁড় জড়িয়ে বাঁশের খুঁটিগুলোকে এক একটানে উপড়ে ফেললো। মাচাটা কাৎ হয়ে পড়তেই সে তার উপর গিয়ে পড়লো। লোক দু'টি কীভাবে বেঁচে গেল —সেটাই আশ্চর্য, সেই ঘোর অন্ধকারে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল পরিত্রাহী চিৎকার করতে করতে।

লোকদু'টির বাঁচার একমাত্র কারণ—গাম্লার আগুন ছড়িয়ে পড়তেই হাতিটা ক্ষণিকের জন্যই থেমে গিয়েছিল, তারপর দ্বিগুন আক্রোশে মাচাটাকে তছনছ করতে লাগলো। এরপর লোকদু'টি যেদিকে দৌড়েছিল, সেইদিকে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে তাদের সন্ধান না পেয়ে ক্রোধে আর একবার চিৎকার করলো, তারপর কয়েকটা পেঁপে-গাছ মট্-মট্ করে ভেঙ্গে তার নরম পাতাশুদ্ধ, মুথিটা খেয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। হাতিটার ভারি পায়ের দুপ-দাপ শব্দটা মিলিয়ে যেতেই আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

হাতিটা তখন রীতিমত ত্রাসের কারণ হয়ে পড়েছে। বন-বিভাগের তরফ থেকেও প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা হয়নি। পাগলা হাতিটাকে 'রোগ্' বলে ডিক্লেয়ার না করায় বাইরের কোন শিকারীও এসে পৌঁছায় নি। নিরস্ত্র গ্রামবাসীরা তার সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করে শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়লো। তখন কয়েকজন সাহসী গ্রামবাসী অপর গ্রামগুলি থেকে বন্দুকধারীদের এনে হাতিটাকে মারবার জন্য একবার চেষ্টা করলো।

হাতিটা 'পাগদা' গ্রামের একটা ক্ষেতে নিয়মমত যেত। সেই মূল্যবান

খবরটা সংগ্রহ করে, ওরা ভোররাত্রে হাতিটাকে ঘিরে ফেলবার মতলব করে অনেকগুলো আগুনের কুণ্ড তৈরী করে রাখলো। তারপর বন্দুকধারীদের নির্দিষ্ট গাছে তুলে দেওয়া হলো, একদল লোক তীর-ধনুক আর বল্লম নিয়ে গ্রামের ধারে অপেক্ষা করতে লাগলো। হাতিটা ক্ষেতের মাঝখানে এলেই ওরা চিৎকার করে হাতিটাকে তীর মারবে, তখন বিহ্বল হাতিটা যেদিকেই যাবে —গাছের উপর থেকে গুলিবৃষ্টি করা হবে। হাতিটাকে ওদের এলাকা থেকে না তাড়ানো পর্যন্ত কেউ ক্ষান্ত হবে না, এই শপথ নিয়ে গ্রামবাসীরা প্রচণ্ড উত্তেজনা ও উদ্বেগ নিয়ে সন্ধ্যা থেকে অপেক্ষা করে রইলো।

ক্রমে রাত হলো। চারিদিকে নীরব নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মাঝে ধীরে ধীরে চাঁদ উঠলো। কোন বাড়ীতে এতটুকু আলো নেই, শব্দ নেই। সেই নৈশ স্তব্ধতা ব্যাহত করে দূরাগত রাতচরা পাখীর ডাক শুধু ভেসে আসছিল। এমন সময় ভালুকের চিৎকার শোনা গেল। সুদর্শন ওর সঙ্গীদের ইশারা করে চুপ করে থাকতে বললো, ফিস্-ফিস্ করে জানালো—ভয় নেই, ভালুক কুল গাছের নীচে ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে জঙ্গলে ঝগড়া করছে ; এদিকে আসবে না।

এরপর হাতিটা এল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল, কালো মতন বিশাল একটা জানোয়ার ক্ষেতের মধ্যে নড়া-চড়া করছে। হাতিটা কখন নিঃশব্দে ক্ষেতে নেমে পড়ল, কেউ টের পায়নি। ওরা হাতিটাকে ক্ষেতের মাঝখানে আসার সময় দিয়ে নিঃশব্দে ঘাপ্‌টী মেরে দেখতে লাগলো। হাতিটা খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল। কালো হাতিটার পিঠের উপর চাঁদের আলো এসে পড়ায়, খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। নড়াচড়া করায় শুভ্র দাঁত দু'টি চন্দ্রাভায় ঝল্‌মল্ করে উঠছিল।

কয়েক মিনিটের জন্য হাতিটাকে ওদের ভাল লাগলো। তারপর প্রচণ্ড চিৎকারের সঙ্গে টিন্ বাজানোর শব্দ হলো, কয়েকটা তীর ছিলা থেকে সাঁ-সাঁ করে ছুটে গেল হাতিটার দিকে। তারপর বন্দুকের মূহুর্মুহু শব্দে চারিদিক কেঁপে কেঁপে উঠলো। হাতিটা হতবুদ্ধি হয়ে কয়েক সেকেণ্ড স্থির থেকে বন্দুক আর তীরের আঘাতগুলো সহ্য করলো। অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বিবশ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বিকট এক চিৎকার করে জঙ্গলে ঠেলে উঠলো। গাছপালা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে পাগলের মত ছুটতে লাগলো দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। তখনও ভোরের আলো ফুটে ওঠেনি, অন্ধকারে হাতিটার আর পিছু নেওয়া হলো না। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলো—হাতিটার উপর চরম

আঘাত হানা হয়েছে। মৃত্যু যদিও বা না ঘটে, এ অঞ্চলে আর ফিরতে সাহস করবে না, এমন শিক্ষা ওকে দেওয়া হয়েছে—এই উল্লাসে ওরা ভোর না হওয়া পর্যন্ত হৈ-হট্টগোল করতে লাগলো। তারপর দিনের আলো ফুটে উঠতেই, হাতিটা মাঠের যেখানে দাঁড়িয়েছিল—সেখানে গিয়ে দেখে প্রচুর রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

এই ঘটনার পর সম্ভবত বাইশে জানুয়ারীর এক সকলে দু'জন স্ত্রীলোক যথারীতি ঝর্ণার জল আনতে গেল। গ্রামের উঁচু-নীচু পথ দিয়ে কলসী মাথায় স্ত্রীলোক দু'টি গাছ-পালার আড়ালে মিলিয়ে যেতেই, প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছটার মাথায় কয়েকটা শকুন উড়ে এসে বসলো। শকুনদের ডানার শব্দ শুনে সুদর্শন মুখ তুলে দেখলো, তারপর কাজ করতে করতে মাঠের সঙ্গীদের বললো—জঙ্গলে কোণ জানোয়ার মারা পড়েছে। সুদর্শন ওদের গ্রামের চোরা-শিকারী। আরও বললো—জঙ্গলে কোন জানোয়ার মারা পড়লে, বা মরার অপেক্ষায় নির্জীবের মত পড়ে থাকলেও—শকুনরা ঠিক টের পায়। তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই হাতিটার কথা ওদের মনে উদয় হলো। একজন বললো—হাতিটা হয়তো এতদিন পরে মারা পড়েছে, নয়তো মরার অপেক্ষায় কোথাও শুয়ে আছে। শকুনগুলোর দিকে আর একবার তাকিয়ে সুদর্শন বললো– কিছু বলা যায় না, হাতিটার কোন সন্ধানও তো করা হলো না।

এমন সময় ঝর্ণার ধার থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন স্ত্রীলোক টলতে টলতে বন থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লো। তারপর কোন গতিকে উঠে পাগলের মত ছুটতে লাগলো। সুদর্শনরা মাঠে কাজ করতে করতে সেই দৃশ্য দেখে হেঁকে জিজ্ঞাসা করলো, কী হয়েছে? কিন্তু স্ত্রীলোকটির তরফ থেকে যখন কোন উত্তর এল না, তখন তারা এগিয়ে গিয়ে স্ত্রীলোকটিকে ধরে ফেললো। স্ত্রীলোকটির মুখ দিয়ে তখন গাঁজলা উঠছিল, আতঙ্কে বড় বড় চোখদুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কোন কথা না বলে স্ত্রীলোকটি ওদের কোলের উপর মূর্চ্ছিতের মত পড়ে রইলো।

দেখতে দেখতে লোক জড় হয়ে গেল। স্ত্রীলোকটির চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে, সে কয়েকটা বড় বড় শ্বাস ফেলে চোখ মেলে তাকাল। তখনও তার সম্পূর্ণ হুঁস ফিরে আসেনি, ফ্যাল্-ফাল্ করে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে বললো—হাতি, হাতি ওর সঙ্গিনীকে ধরেছে বলে হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগলো। তখন কয়েকজন সাহসী লোক

লাঠি-সোটা নিয়ে ঝর্ণার কাছে গিয়ে দেখে, মাটির কলসীদুটো ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে, আর অপর স্ত্রীলোকটি রক্তাক্ত অবস্থায় একটা ঝোপের উপর চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। স্ত্রীলোকটির পেটের ডানদিকের একটা বড় গর্ত, সেখান দিয়ে রক্তের স্রোত নেমে নিম্নাঙ্গ বেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে। গলায়, বুকে কতকগুলো মোটা-মোটা কালসীটের দাগ।

স্ত্রীলোকটি তখনও বেঁচে ছিল, তাড়াতাড়ি একটা ডুলি করে তাকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। পুলিশ তদন্ত হওয়ার পরও বন-বিভাগ নীরব ছিল। কিন্তু সিংভূমের ডেপুটি-কমিশনার হাতিটাকে 'রোগ' বলে ঘোষণা করলেন, এবং দুষ্ট-হাতিটাকে মারবার জন্য শিকারীদের আহ্বান করলেন। এর কিছুদিন পরে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়।

সেই সময় চাঁইবাসার বনবিভাগের অফিসে এক তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো। যদিও ডেপুটি কমিশনার হাতিটাকে 'রোগ' বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু বন-বিভাগ হাতিটাকে মারার ব্যাপারে তখনও পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। ফলে কিছু বাক্-বিতণ্ডার সৃষ্টি হলো। এমন সময় জনৈক কর্মচারী আমায় ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার পরামর্শ দিলেন। কর্মচারীটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলাম, এবং সন্তুষ্টচিত্তে যখন তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম—তখন আমার পকেটে রয়েছে ২-২-১৯৬১ তারিখের সীলমোহর করা অনুমোদন-পত্র। এখন আমি নির্ঝঞ্ঝাটে দুষ্ট হাতিটার অনুসন্ধান করতে পারি।

প্রথমে ডিম্না-নালা ওয়াটার-ওয়ার্কসের শিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম, তারপর নয় মাইল হেঁটে বারহার গ্রামে এসে পৌঁছলাম। গ্রামবাসীরা স্কুল-বাড়ীর একটা ঘরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে, আমার সঙ্গী বলরামবাবু কোথা থেকে সুদর্শনকে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন। চোরা-শিকারী হিসাবে লোকটির বনপথ বেশ জানা ছিল, ভাবলাম—তার সাহায্যে হয়তো হাতিটাকে খুঁজে বার করা সহজ হবে। চিমিতির জঙ্গলের পথে অনেকগুলো চিহ্ন নানাদিকে চলে গেছে, এর মধ্যে কোনটা নতুন, তা আন্দাজ করা এক রকম অসম্ভব। কারণ হাতিটা কখন কোন জঙ্গলে থাকে তার কোন ঠিক নেই। ছোট ছোট পাহাড়গুলো ডিঙ্গিয়ে কখন বুট্টা, পাগদা, আবার কখনো চিমিতি বা বারহার গ্রামসংলগ্ন জঙ্গলে এসে নিঃশব্দে আক্রোশে ফুঁসতে থাকে।

পাগদা গ্রামটা একটা পাহাড়ের নীচে। ঘন বনে ছাওয়া পাহাড়ের উপর

থেকে কাঠ কেটে আনবার জন্য লরীওয়ালারা যে রাস্তাটা তৈরী করেছিল, তার চওড়ার মাপ প্রায় সাত-আট ফুটের মত। ড্রাইভারদের অসুবিধার উপর নজর রেখে আর পয়সা বাঁচানোর কথা চিন্তা করে, পথটার বিশেষ কোন বাঁক-চুর না রেখে যতটা সম্ভব সোজা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—একেবারে পাহাড়টার মাথার কাছাকাছি। পাহাড়টার মাথায় দাঁড়ালে যে অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চোখে পড়ে তা ভোলবার নয়। অল্প একটু হাওয়া দিলেই, ঘন সবুজ বাঁশ-বনে অপূর্ব এক শির্‌-শির্‌ শব্দ হয়। দে'লা লেগে বাঁশে-বাঁশে ঠোকাঠুকি হয়ে যে শব্দের উৎপত্তি হয়, তার সঙ্গে তুলনা করতে গেলে বিকনাটোরী, মীরজাপুরের হালিয়া-রেঞ্জ, অথবা সুন্দরবনের অপূর্ব পুরুষ হরিণের শিংয়ের ঠোকাঠুকির কথা মনে পড়ে। পাহাড়ের ওধারে গভীর বনে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে থাকবার যথেষ্ট জায়গা রয়েছে দুষ্ট হাতিটার জন্য। ভাঙ্গা গাছ-পালা আর নুয়ে পড়া ঘাসের শিসে তার অজস্র চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে, শুকনো নাদি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

ফরেষ্ট-গার্ডের সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেলে আমার সঙ্গী বলরামবাবু ওকে জিজ্ঞাসা করলেন—হাতিটাকে কোন দিকে গেলে পাওয়া যাবে। ফরেষ্ট-গার্ড খুব গম্ভীর আর আশ্চর্য হবার ভান করে বললো - কোন হাতি? এখানে বুনো হাতিরা মাঝে মাঝে চরতে আসে। তখন বলরামবাবু 'রোগ্' হাতিটার কথা জিজ্ঞাসা করতেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, এখানে কোন 'রোগ্' হাতি নেই। তখন রগড় করে বলরামবাবু অনুমোদন-পত্রটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ডেপুটি কমিশনার কি ভুল করেছেন। আর কথা নেই, লাইসেন্সটা উল্টে-পাল্টে দেখে গম্ভীর হয়ে চলে গেল। এর থেকে অনুমান হচ্ছিল—ফরেষ্ট বিভাগে কোন অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে হাতিটাকে মারার ব্যাপারে কোন সাহায্যেই পাওয়া যাবে না।

চিমিতির গ্রামে এসে দুর্ঘটনার জায়গাটা পরিদর্শন করলাম। ক্রুদ্ধ আহত হাতিটা ঝর্ণার ধারের হাল্কা-জঙ্গলে যেভাবে আত্মগোপন করে লুকিয়ে ছিল এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছিল, তা দেখে বিস্ময়ের অবধি রইলো না। দুটো ঝোপের আড়ালে যেখানে হাতিটা লুকিয়েছিল, সেখানে প্রস্রাবের দাগ ও পুরানো নাদি জড় হয়েছিল। জায়গাটার দূরত্ব ঝর্ণার জল থেকে মাত্র সাত-আট ফুট। স্ত্রীলোক দু'টি মাথার কলসী নামাবার পূর্বেই হাতিটা ওদের আক্রমণ করে বসে। আমি যখন জায়গাটি দেখছিলাম, তখনও মাটির কলসীর ভাঙ্গা টুকরোগুলো চতুর্দিকে ছড়ান ছিল। সুদর্শন

বললো—স্ত্রীলোক দু'টি গল্প করতে করতে যেই ঝর্ণার ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন, তখন সাপের মত একটা বাঁকা শুঁড় ঝোপের পাশ থেকে উঠে এল। স্ত্রীলোকটি যেই চীৎকার করে উঠলো, অমনি শুঁড়টা গলায় জড়িয়ে তাকে শূন্যে তুলে নিল। তারপর ঝোপটার উপর আছাড় মারতেই কলসী দুটো সশব্দে ভেঙ্গে পড়লো। তখন দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি পরিত্রাহী চীৎকার করতে করতে উল্টো-মুখো হয়ে দৌড়তে লাগলো।

হাতিটা বুঝতে পেরেছিল—এক্ষুণি লোকজন ছুটে আসবে, তার উপর আবার আঘাত হানা হবে। শয়তানটা মুহূর্তের মধ্যে স্ত্রীলোকটির পেটে দাঁত ঢুকিয়ে দিল, তারপর সকলের অগোচরে আর নিঃশব্দে জঙ্গলের আড়াল দিয়ে গভীর বনে পালিয়ে গেল। ঝোপটার পাতায় তখনও শুকিয়ে যাওয়া কালো রক্তের চিহ্ন লেগেছিল। হাতিটার সন্ধানে চারদিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম। চিমিতি আর পাগদার বনে-পাহাড়ে কতবার কষ্ট করে যাওয়া-আসা হলো, হাতিটার একটা ছবি তোলবার জন্য ভারী ক্যামেরাটা বইতে বলরামবাবুর যথেষ্ট অসুবিধা হলো। তবুও পাহাড়ে ওঠা আর নামার কষ্ট স্বীকার করে তার অনুসন্ধানে ঘুরলাম। এর মধ্যে একবারও আমরা হাতিটার পথের কোন হদিশ পেলাম না।

এর পরের দিন খুব ভোরে হাতির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। সারারাত শিশির পড়ে বনের গাছপালা ভিজে ছিল, বনের মধ্যে দিয়ে চলতে গিয়ে আমাদের পোষাক ভিজে গেল। খুব সন্তর্পণে পা টিপেটিপে ইতস্তত ঘুরতে লাগলাম। এমন সময় একটা শব্দ হলো, শব্দটা একটা ডাল ভাঙ্গার মত। আওয়াজটা কানে আসামাত্র আমরা একটা ঝোপের আড়ালে নিঃশব্দে বসে পড়লাম। হাতিটা কত কাছে বা কত দূরে রয়েছে, তার আন্দাজ করা তখন সম্ভব হল না। ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে রুদ্ধশ্বাসে শুধু অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর আশঙ্কা করতে লাগলাম—যে কোন মুহূর্তে সাপের মত লম্বা শুঁড়টা ঝোপের উপর দিয়ে এগিয়ে আসতে পারে।

তখন খুব দ্রুত একটা কথা মনে পড়লো—বাতাসের গতি জানা দরকার। হাওয়া যদি আমাদের অনুকূলে ব'য়, তাহলে হাতিটা আমাদের উপস্থিতি নাও টের পেতে পারে। কিন্তু যদি প্রতিকূল হয়—তাইলে হাতিটা এতক্ষণ আমাদের গায়ের গন্ধ পেয়ে হয় পালিয়ে গেছে; আর না হয় কোথাও নিঃশব্দে অপেক্ষা করে রয়েছে। এত কথা মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে উদয় হলো, কিন্তু কিছুই তখন করতে পারলাম না। এতটুকু নড়াচড়া না করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে

রইলাম শুধু।

কতক্ষণ বসে থাকার পরও কিছু ঘটলো না। সুদর্শনকে ইশারায় জিজ্ঞাসা করলাম। সে-ও বিশেষ কিছু বলতে পারলো না। তখন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম, তারপর ৪৫০।৪০০ বোরের ভারি দো-নলা রাইফেলটা দু'হাতে তুলে নিতেই তিরিশ-চল্লিশ গজ দূরের একটা ঝোপ ভয়ানাক দুলে উঠলো। তারপর গাছপালা ভাঙ্গার শব্দ করতে করতে দৌড়ে পালিয়ে গেল হাতিটা। আমি তার পিছনটা কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম। ঝোপটা যেখানে দুলে উঠেছিল সেই জায়গায় পৌঁছতেই হাতিটা দৌড়ে যাওয়ার টাট্‌কা চিহ্ন আমাদের চোখে পড়ল। বলরামবাবু হাতির পায়ের দাগটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মাপ নিলেন। দুষ্ট হাতিটার পায়ের মাপের সঙ্গে এ-মাপ ঠিক-ঠিক মিলে গেল।

একদিন হাতিটার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়টা ডিঙ্গিয়ে ও-ধারের ঘন জঙ্গলে নেমে এলাম। হাতিটা যাওয়া-আসা করায় গাছপালা ভেঙ্গে যে পথ তৈরী করেছিল, সেখানে কতকগুলি টাট্‌কা চিহ্ন দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হতে লাগলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর একগাদা হাতির নাদি আমাদের চোখে পড়লো। হেঁট হয়ে যখন নাদিটা পরীক্ষা করছিলাম, সুদর্শন পা দিয়ে সেটাকে ঘেঁটে দিয়ে বলল—এ গতকালের ব্যাপার। হাতিটা আগের রাত্রে এখানে আসেনি, সুতরাং আমরা ধরে নিলাম হাতিটা তখনও নীচের জঙ্গলে রয়েছে। কিছুক্ষণ কান পেতে রইলুন—যদি হাতিটার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায়। যদিও তেমন কিছু পাওয়া গেল না—তবুও আমাদের আশঙ্কা হলো, পাহাড় বেয়ে নেমে আসবার সময় হাতিটার চোখে আমরা ধরা পড়ে গেছি। তখন খুব সতর্ক হয়ে যথাসম্ভব দ্রুত অগ্রসর হতে গিয়ে আর এক-দফা নাদির উপর এসে পড়লাম। এটা আগের চেয়েও টাট্‌কা এবং খুব সাম্প্রতিক ব্যাপার বলে মনে হলো। হাতিটার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত হতে পারে এমন একটা আশা মনের উপর দানা বাঁধছিল।

উন্মত্তের মত হাতিটার সন্ধানে যখন এগিয়ে চলেছি—এতটুকু কারুর খেয়াল হয়নি, যে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে আমাদের যখন চৈতন্যোদয় হলো, তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাড়াতাড়ি পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। পাহাড়ের মাথায় এসে যখন পৌঁছলাম, তখন ঘোর অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে কোন টর্চ ছিল না। অন্ধকারে অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে পাহাড় থেকে নামতে হল। সমতলভূমিতে নেমে আসতেই খুব কাছ থেকে ভালুকের শব্দ হলো। একটা পাগলা হাতির

পিছনে যেতে যত-না ভয় পাক্—ভালুকের আওয়াজ শুনেই সুদর্শন আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। আমার গা-ঘেঁষে হাঁটতে-হাঁটতে ফিস্-ফিসিয়ে বললো—কুল পাকলেই ব্যাটারা এমন হল্লা করে।

ভালুক দুটোকে মারার ব্যাপারে সুদর্শনের যথেষ্ট আগ্রহ থাকা সত্বেও হাতির-জঙ্গলে বন্দুকের শব্দ করতে আমি নারাজ শুনে, সে জঙ্গলের পথ ধরে পাগদার গ্রামে নিয়ে এল। অন্ধকার রাত্রে ছয়-সাত মাইল হেঁটে আমাদের ডেরায় না ফিরে ওখানকার আদিবাসীদের মাটির দাওয়ায় রাত কাটালাম। সকাল হতেই চিমিত্তিতে ফিরে এসে শুনলাম, হাতিটা রাত্রে এসেছিল এবং হরিসভার চালাটা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। আমাদের এখানে আসার কিছুদিন আগে তিনদিন ব্যাপি এক হরিসভায় অনুষ্ঠান হয়েছিল। গ্রামের মাঝখানের এক ফাঁকা মাঠে বেশ কয়েকটা বাঁশের খুঁটিতে তেরপল্ আর হোগ্লা চাপা দিয়ে হরিসভার চালাটা তৈরী হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরও চালাটা খোলা হয়নি। হাতিটা রাতের কোন এক সময় যেতে যেতে চালাটা দেখতে পায় এবং ওদের অসমাপ্ত কাজটাতে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন বোধ করে নিঃশব্দে এগিয়ে আসে। তারপর শুঁড়ের একটা টানে চালাটা নামিয়ে এনে পায়ে করে সেটাকে মাটির সঙ্গে বিছিয়ে দেয়। খুঁটিগুলোকে তুলে একটা পুকুরের জলে ফেলে দেওয়ার সময়, একটা খড়ের চালে লতিয়ে ওঠা লাউগাছের উপর দৃষ্টি পড়ে। লাউগাছটাকে উদরস্থ করে তার গন্তব্য পথে চলে যায়।

অনুসন্ধানের কাজ এখন অনেকটা সহজ হয়ে পড়লো। কারণ হাতিটার জঙ্গল আমরা দেখে এসেছি, তাছাড়া হরিসভার চালাটা ভাঙ্গার পর বুট্টার দিকে ওর পায়ের ছাপ্ পড়ায়—অনুসরণ করার মত একটা পথ এখন পাওয়া গেছে। গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলেই যখন হরিসভার মাঠে এসে হাতিটার দুষ্টবুদ্ধির কথা বলাবলি করে ছেঁড়া তেরপলটা গুটিয়ে নিচ্ছিল, তখন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। হাঁটতে হাঁটতে বেলা দেড়টার সময় বুট্টা-গ্রামের এক আদিবাসীর মাটির দাওয়ায় জল খাওয়ার জন্য এসে বসলাম।

সোনার মত ঝকঝকে একটা ঘটীতে জল এনে বৃদ্ধ আদিবাসীটি বলল, ভোররাত্রে হাতিটার শব্দ সে শুনছে। আমাদের জল খাওয়া হয়ে গেলে সিগারেট ধরাবার সময় বৃদ্ধকে একটা সিগারেট দিতে, সে একটা চষা-ক্ষেতের উপর হাতিটার পায়ের ছাপ দেখালো এবং হাতিটা কোন দিকে গেছে তার হদিস্ বাৎলে দিল। সুদর্শনের সাহায্যে হাতিটার চিহ্ন অনুসরণ করতে এতক্ষণ কোন অসুবিধা হয়নি, কিন্তু গ্রামের সীমানা অতিক্রম করে বনে ঢুকতেই

হাতির পায়ের দাগ আমরা হারিয়ে ফেললাম। জঙ্গলটা এসে সেই পথটায় মিশেছে—যেখানে কনট্রাক্টররা লরী নিয়ে যাওয়ার জন্য পাহাড়ের খাড়াই পথটা তৈরী করেছিল। বিশ্রাম না নিয়ে সেই পথটা ধরে সোজা ওঠা যায় না, বুকে হাঁপ ধরে। রাস্তাটার উপর আবার হাতির পায়ের ছাপ পাওয়া গেল, ভারী শরীর নিয়ে সোজা পাহাড়ের মাথায় উঠে গেছে।

পথে দু'বার বিশ্রাম নেওয়ার পর চূড়োয় ওঠা গেল। হাতিটা ঢালু বেয়ে নেমে যাওয়ার সময় এক জায়গায় ঘষড়ানর অল্প একটু দাগ রেখে গেছে। এছাড়া আর এমন কোন চিহ্ন নেই—যা ধরে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। সুদর্শন কি বুঝলো জানি না, নুয়ে পড়া ঘাসের ডগা—গাছের ডালাপালা, আর ভাঙ্গা পাতা দেখতে দেখতে পাহাড় থেকে নামতে লাগলো এবং থেকে থেকে ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে ইসারা করতে লাগলো, যাতে আমরা কোন শব্দ না করে ফেলি।

শেষ পর্যন্ত জমি অনেকটা নিচু হয়ে গেলে একটা ঢালু মতন জায়গায় এসে পৌঁছলাম। পায়ের তলার মাটি স্যাঁৎসেঁতে। আরও দেড়শো গজ অগ্রসর হওয়ার পর একটা টিপির মত চোখে পড়ল। সেই টিপিটার কাছে পৌঁছে ঘড়ি দেখলাম বিকেল সাড়ে চারটে। ভাঙ্গা ডালপালা আর ইতস্তত ছড়ান প্রস্তরখণ্ডের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে. অত্যন্ত সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে অগ্রসর হতে হতে একটা নালার ধারে এসে পৌঁছলাম। কল্‌-কল্‌ করে নালা দিয়ে জল বইছিল। হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো, নালার পাড়ের নরম মাটিতে প্রকাণ্ড একটা পায়ের ছাপ। হাতিটা এইমাত্র নালাটা পার হয়েছে বলে মনে হলো। নালাটা পার হতে যাবো, এমন সময় মট্ করে একটা শব্দ কানে এল। আমরা কাঠের মত স্থির হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরতেই হাতিটার মত আমাদেরও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো।

খুব কাছাকাছি কোথাও রয়েছে হাতিটা। পিছন থেকে আমার কাঁধের কাছে একটা হাত রেখে খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু শোনবার চেষ্টা করছিল সুদর্শন। বলরামবাবু ক্যামেরাটা ঠিক করে নিচ্ছিলেন—আমি চোখ না সরিয়েও টের পেলাম। এমন সময় সুদর্শন আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌-ফিসিয়ে কী বলতে বলতে আমার কাঁধটা হঠাৎ সজোরে খাম্‌চে ধরলো, আর সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল বাড়িয়ে একটা ঝোপ দেখিয়ে দিল। আমি বিদ্যুৎ-গতিতে সেইদিকে তাকিয়েও কিছু দেখতে পেলাম না। একদৃষ্টে সেইদিকে

তাকিয়ে থাকতেই মট্ করে আবার একটা আওয়াজ কানে এল। সুদর্শন সেই একভাবে দাঁড়িয়েছিল—একটা হাতে আমার কাঁধটা খাম্‌চে ধরা, আর অপর হাতের একটা আঙ্গুল সেই ঝোপটার দিকে ঘোরান। আমি তখন পর্যন্ত কিছু দেখতে না পেয়ে দারুণ অস্বস্তিতে ঘামতে শুরু করলাম।

এমন সময় আমাদের চোখে পড়ল—সেই ঝোপটার পিছন দিকের ঢালু জমিতে হাতিটা অত্যন্ত সন্তর্পণে নেমে যাচ্ছে। আমার রাইফেল তৈরী ছিল, কাঁধের উপর তুলে এনেই ওর হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে ট্রিগার চেপে দিলাম। নিচু বনটা যেন কেঁপে উঠলো—পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি উঠলো—গুড়ুম! হাতিটা মাত্র পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে ছিল, গুলিটা ওর শরীরে ঢুকে যেতে যেমন দেখলুম—তেমনি বলরামবাবু ক্যামেরার ক্লিক্ শব্দটুকুও শুনতে ভুল করলুম না। হাতিটা হুড়-দাড় করে বন-বাদাড় ভেঙ্গে ছুটে গেল। অস্ত-সূর্যের রক্তাভ আলো পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে তখন……।

তিন কোয়ার্টর মত অনুসন্ধান করার পর সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরে এলাম। হাতিটা মাইলখানেকের মধ্যে নিশ্চয়ই থাকবে, অতবড় একটা গুলি খেয়ে এর বেশী আর যেতে পারবে না—এই ধারণা নিয়ে তখনকার মত ফিরে আসছিলাম। ফরেষ্ট গার্ডের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। হাতিটাকে এইমাত্র গুলি করেছি বলা সত্ত্বেও খুব গম্ভীর হয়ে জানালো, আমার 'পারমিটের, মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। লোকটার উপর প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল, তবু নরম গলায় তাকে পরিস্থিতিটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গোঁয়ার লোকটা কোন মীমাংসায় না এসে গম্ভীর হয়ে চলে গেলে, সুদর্শন বললো—লোকটা নাকি খুব খারাপ এবং ইচ্ছা করলে আমাদের বিপদে ফেলতে পারে।

তখন বলরামবাবুর পরামর্শে খুব অনিচ্ছার সঙ্গে চাঁইবাসায় আবার ফিরে এসে ডেপুটি কমিশনারের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলাম। দেখা হতে ভদ্রলোককে সব কথা খুলে বললাম এবং মাত্র দু-তিন দিনের জন্য পারমিটের এক্সটেন্‌শনে অক্ষম এই কথা জানিয়ে বিদায় দিলেন। আমি হতবাক্ হয়ে গেলাম, ফরেষ্ট-বিভাগের অনমনীয় মনোভাবের দরুনই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে শুনে আমরা দমে গেলাম। কোন অনুরোধেই আর রক্ষা হল না।

হৃৎপিণ্ডে চারশো গ্রেনের একটা সলিড্ গুলি নিয়ে হাতিটার কী পরিণাম হতে পারে কল্পনা করতে করতে অক্ষম আক্রোশে ফুঁসতে লাগলাম। ভেবেছিলাম এক্সটেন্‌শন পাওয়া সহজ হবে, সেটা ফরেষ্ট-গার্ডের নাকের ডগায় ফেলে দিয়ে হাতিটাকে খুঁজতে যাবো। —পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ঢালু জমিটায় নেমে

ভাঙ্গা গাছপালা আর ইতস্তত ছড়ান প্রস্তর-খণ্ডের মধ্যে দিয়ে বড় টিবিটার গা ঘেঁসে নালার ধারে যে ঝোপটার পিছনে গুলি করেছিলাম ; সেখানকার ঢাল্ বেয়ে মাইল খানেকের মধ্যে যেখানে রক্তাক্ত পতনোন্মুখ হাতিটা আমার অপেক্ষায় রয়েছে—শেষ মোকাবেলার জন্য। হল না, আমার দুর্ভাগ্য আমায় হটিয়ে দিল—পাহাড়, বন আর সেই মনোরম নিম্ন উপত্যকা থেকে ; যেখানে নালার ধারে ৪৫০।৪০০ বোরের একটা গুলির শূন্য নিঃশেষিত খোল্টা বর্ষা আর ফাগুণের ঝরাপাতার অন্যমনস্কতায় হারিয়ে যাবে ধীরে ধীরে…!

আমাদের গাইড সুদর্শনের প্রাপ্য মিটিয়ে ওকে বিদায় দিলাম, তবুও ছেড়ে যেতে চাইলো না আমাদের। যথারীতি গার্ড হুইসেল বাজাবার পর আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল। রুদ্ধ আবেগে দারুণ ফুঁসতে ফুঁসতে ট্রেনটা চাঁইবাসার প্ল্যাটফরম ছেড়ে চলে গেল। হাতির খবর আর পাওয়া যায়নি, ধলভূমের 'রোগ'-এর এইখানেই ইতি করতে বাধ্য হলাম…।

বাঘের ডাক

শিকারের তাঁবু পড়েছে—বরিবাদীর জঙ্গলে। হাজারীবাগ জেলার সীমান্তবর্তী জঙ্গল—বরিবাদী। ওপারে পালামৌর লাগোয়া জঙ্গল—মাঝে চাকো নদী। তখন গ্রীষ্মকাল, বালুকাময় শীর্ণ নদী—কোথাও জল নেই। গোর্খিয়ারা গরু চরাতে এসে তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করে নদীর বালি খুঁড়ে। এই রকম অনেক গর্ত ছড়িয়ে আছে নদীর বুকে, যাতে পরিষ্কার নদীর জল জমা হয়ে থাকে।

আমার বন্ধুরা বাঘ শিকারে এসে হাজারীবাগের প্রচণ্ড গরমে অস্থির হয়ে হাঁস-ফাঁস করছিলেন। তিনদিন জঙ্গল বিট্ করেও কোন জন্তু পাওয়া যায়নি এমন কী খাওয়ার মত এতটুকু মাংসও যোগাড় হয়নি। আমি যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও বন্ধুরা নিরাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। বিপুলবাবুর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগলো, আর শিরিণবাবু মাথায় ভিজে গামছা জড়িয়ে—শিকারের উৎকট্ নেশাকে অভিসম্পাত করতে লাগলেন।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটলো, যার ফলে শিরিণবাবু মাথার গামছা ফেলে কোমরের বেল্ট শক্ত করে আঁটলেন—আর বিপুলবাবু গুলির ব্যাগ খুলে নতুন গুলি বাছতে বসলেন। তখন বিকাল পাঁচটা, কুমার সাহেব হন্-হন্ করে তাঁবুতে ফিরে এলেন—মুখ বেয়ে ঘাম গড়াচ্ছে, সঙ্গে গ্রামের মাহাতো।

মাহাতো সবিনয়ে জানালো, গতরাত্রে বাঘ তার গোয়াল-ঘরে গরু ধরেছিল। গোয়ালে আরও গরু ছিল ব'লে বাঘ সুবিধা করতে না পেরে, গরুটার একটা পা ভেঙ্গে পালিয়ে গেছে। কুমার সাহেব খুব উত্তেজিত ভাবে বললেন—বাঘটাকে মারবার জন্য মাহাতো একটা মোষের বাচ্চা দিতে রাজী আছে। খবরটাকে স্বাগত জানালো বড়দা—অর্থাৎ রঘুপতিবাবু। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমরা এতদূর করলাম, এবার যা কিছু করণীয় আপনি করুন।

বাঘ শিকারের উৎকট নেশা কাটাবার জন্যই বন্ধুদের এতদূর এনেছিলাম, অতএব সম্মতি জানাতেই হল। বললাম—সন্ধ্যার মুখে মাচা বাঁধার অসুবিধা আছে, কাল সকালে দেখে শুনে মাচা বাঁধা হবে। মাহাতো চলে গেলে বন্ধুরা বন্দুকের নল পরিষ্কার করে নতুন গুলি হাতের কাছে রেখে দিলেন সমস্ত রাত তাঁবু পাহারা দেওয়ার জন্য।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হলো। ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেল অরণ্যানী। পাখীর ডাক থেমে গেছে অনেকক্ষণ। এমন সময় বনের কীট-পতঙ্গেরা ডাকা আরম্ভ করলো—কীট্ কীট, কূট কূট। আকাশে তখনও চাঁদ ওঠেনি। আমাদের তাঁবুটা ছিল গ্রামের শেষ-প্রান্তে অরণ্যের কোলে, নদী ওখান থেকে তিন-ফার্লং দূরে। গাছের পাতায়-পাতায় হাওয়া বইতে লাগলো শির্ শির্ করে। বনের ছোট-খাট শব্দগুলো একাকার হয়ে এমন এক ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি করলো, যা মনকে আবিষ্ট করে আড়ষ্ট করে তোলে এক অজানা ভয়ের ছোঁয়ায়!

এতদিন জঙ্গলে কোন বন্য-প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় নি, এমন কী দূরাগত কোন ডাকও ভেসে আসেনি। শিকার সম্বন্ধে যখন সকলেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, জঙ্গল-বাছাই ও আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন—ঠিক তখনই, এক আসন্ন সন্ধ্যায় বাঘের খবর এল! অরণ্যের ভীষণতম প্রাণী! তার আবির্ভাবে রাতের সেই প্রহরে অরণ্যে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। গাছের পাতারা পর্যন্ত নিশ্চুপ হয়ে গেল। আকাশের এক-প্রান্ত থেকে ভীরু এককালি চাঁদ অভ্যর্থনা জানাল অরণ্যরাজকে, নদীর শুষ্ক বালি চিক্-চিক্ করে উঠলো রূপালী আলোয়। বড়দা হ্যাজাকটা জেলে তাঁবুর দোরগোড়ায় রেখে দিলেন, তাতেও ভয় দূর হ'ল না—বরং বাইরের অন্ধকার আরও রহস্যময় হয়ে উঠলো। বিপুলবাবু ভারী রাইফেলটা কোলের উপর রেখে সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে নিলেন বড় বড় শ্বাস ফেলা ছাড়া তাঁবুতে আর কোন শব্দ ছিল না—শব্দ ছিল না বাইরের ওৎ-পেতে থাকা জমাট অন্ধকারের মধ্যেও।

এমন সময় নৈশ-স্তব্ধতা খান খান করে হেঁকে উঠলো অরণ্যের প্রহরী—হুঁশিয়ার। কোট্‌রা-হরিণটা কয়েকবার ঘন ঘন ডেকে ছুটে পালিয়ে গেল। ভূতুড়ে একটা অরণ্যের কোণায় সচকিত করে গেল, শিরায়-শিরায় রক্তে উন্মাদনা এনে দিল—বাঘ। আমি ঠিক অনুমান করতে পারলাম না—কোট্‌রা হরিণটা বাঘ দেখে ডাকল—না—হ্যাজাক দেখে অমন আতঙ্ক ছড়িয়ে গেল! এতদিন জঙ্গলে কোন শিকার পাওয়া যায়নি, কোট্‌রা হরিণটাই প্রথমে ডাকলো। আমার বন্ধুরা একটা হরিণ শিকার করেই হয়তো সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যেতে পারতেন। না-না করেও শেষ পর্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এল—বাঘ! এত বড় পাওয়াটাকে এত সহজে নেওয়ার শক্তি ছিল না বলেই হয়তো আরণ্যক পরিবেশ বুকের উপর এমন ভারী হয়ে চেপে বসেছিল।

শিরিণবাবু একটু কেশে বললেন—কাল কিভাবে মাচা বাঁধা হবে, কিভাবে শিকার হবে আসুন একটু আলোচনা করা যাক। কাল সকালে জঙ্গল ভালভাবে না দেখে কিছু মন্তব্য করা এই মুহূর্তে ঠিক হবে না, আমার এই উক্তিকে বিপুলবাবু সমর্থন করেন এবং সেইসঙ্গে রাতের প্রহরার ব্যবস্থা করে শুয়ে পড়বার পরামর্শ দিলেন। আমার মাথায় 'শিকার' এই তিনটি অক্ষর তখন ঘুরে বেড়াতে লাগলো, ঘুম এল না। শিকারের কাহিনীর শেষ নেই, তাই শিকারের ন'টে গাছ কোনদিন মুড়োয় না! মুড়োবার ছাগলকে বেঁধে রাখা হয় বনের প্রান্তে—জীবন্ত টোপ্! বাঘকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসে গুলির আওতায়। তাই বাঘ মরে, আর বেঁচে থাকে রক্ত-ঝরা তিনটি অক্ষর 'শি-কা-র'!

পরের দিন ভোরে আমরা সকালে বাঘের খোঁজ-খবর করে মাচা বাঁধবার জন্য রওনা দিলাম। গ্রাম থেকে মাহাতোকে তুলে নেওয়া হল। মাহাতোই পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। প্রায় আধ মাইল ঘন বনের মধ্য দিয়ে গিয়ে নদীর ধারে এসে পড়লাম। দুটো বনমুরগী ঘুরে ঘুরে পোকা ধরছিল, আমাদের সাড়া পেয়ে নিমেষের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। কিন্তু একটা তিতির খুব কাছ থেকেই একভাবে ডাকতে লাগলো।

আমরা যেদিক থেকে নদীতে নামলাম, সে দিকটা একটা নাবাল্ অঞ্চল! ঢালু মতন জায়গাটাতে বেশ খানিকটা ঘোলা জল জমেছিল। লক্ষ্য করলাম—বাঘ রাত্রে জল খেয়েছে। সামনের থাবাদুটো পাশাপাশি রেখে লম্বা হয়ে বসে জল খাওয়ার চিহ্ন। মাঝারি আকারের পুরুষ বাঘ। মাহাতো জানালো, দু-তিন মাইলের মধ্যে আর কোথাও জল নেই। বাঘ যখন এ-জঙ্গলে এসে গরু ধরেছে, তখন সে এখানেই রোজ জল খাবে।

কথাটার মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না, তাই আশ-পাশের গাছগুলো দেখতে লাগলাম মাচা বাঁধবার জন্য। বিপুলবাবু দলবল নিয়ে মাহাতোর সঙ্গে ফিরে গেলেন—খাটিয়া ও মাচা বাঁধবার সরঞ্জাম পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি গুলিভরা রাইফেলটা কোলের উপর রেখে একটা গাছের গোড়ায় ঠেস্ দিয়ে বসে সিগারেট খেতে লাগলাম। আমি মাচা বাঁধবার জায়গা থেকে প্রায় এক'শ গজ দূরে বসেছিলাম, এমন সময় দেখলাম—গত রাত্রের সেই কোট্‌রা হরিণটা অত্যন্ত সন্তর্পণে এল জল খেতে। বাঘটা যেখানে বসে জল খেয়েছিল, হরিণটা তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন কান নাড়তে লাগলো; তারপর জল খেল। পর মুহূর্তেই দৌড়িয়ে পালিয়ে গেল, বোধ হয় আমার সিগারেটের গন্ধ পেয়ে থাকবে।

লোকজন এল সেই বেলা দশটায়। একটা বড় মহুয়া গাছে মাচা বাঁধা হলো। মাচার উচ্চতা, কমপক্ষে আঠারো ফুট। পাশেই একটা কেঁদ গাছ ছিল, অনেক কেঁদ-ফল ফলে রয়েছে তাতে। বাঘের জল খাওয়ার জায়গা থেকে মাচার দূরত্ব কুড়ি-বাইশ ফুটের বেশী হবে না। জলের ধারেই মোষের বাচ্চাকে বেশ শক্ত করে বেঁধে রাখা হলো, কারণ—শিকারীরা জীবন্ত টোপের উপরই বসবেন।

আমি মাচার পাশগুলো বেশ শক্ত করে বাঁধতে লাগলাম। কারণ—টোপের উপর বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তা অনেক পাকা শিকারীর নার্ভকেও অবশ করে দেয়। টোপের ধ্বস্তাধ্বস্তি ও মরণ-আর্তনাদ বুকের রক্ত জল করে দেয়। তখন টর্চের আলোয় রক্তমাখা বিভৎস মুখখানা করে রাইফেলের গুলি লাগানো নতুন শিকারীর পক্ষে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য বলেই আমার ধারণা হয়েছিল। যাই হোক্—মাচা বাঁধা, টোপ্ বাঁধা ইত্যাদি কাজ সাঙ্গ করে তাঁবুতে ফিরে এসে সঙ্গীদের তৈরী হওয়ার নির্দেশ দিলাম।

বিকাল সাড়ে-চারটের সময় বন্ধুরা মাচার উদেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন, আধ-ঘণ্টা পরে আমি নদীর পাড়ে একটা গাছের ডালে উঠে বসলাম। বন্ধুদের বিপদ-আপদের কথা চিন্তা করে ওদের অজ্ঞাতে এই ব্যবস্থা করেছিলাম শ্রীকুমারের পরামর্শে। আমাদের পরস্পরের দূরত্ব ছিল প্রায় একশো গজের মতন।

সূর্য অস্ত গেল। দিনের দেখা জঙ্গল, রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার—তাল তাল গাঢ় অন্ধকারে ডুবে রইলাম। চাঁদ উঠবে রাতের

দ্বিতীয় প্রহরে। রাইফেলটাকে গাছের একটা ডালে ঝুলিয়ে রাখলাম। বন্ধুরাই বাঘ শিকার করবেন—বাঘ যদি গুলি খেয়ে পালায়, তাহলে আমি তার গতিরোধ করবো। জঙ্গলের রাত সাঁ-সাঁ করে কেটে যেতে লাগলো। কোন জন্তুর ডাক্ নেই, জঙ্গলের এতটুকু সাড়া শব্দ নেই। অখণ্ড স্তব্ধতার মাঝে চাঁদ উঠলো, ক্লান্তি আর এক-ঘেঁয়েমীর মধ্যে সময় কাটতে লাগলো। তারপর একসময় ভোর হয়ে গেল, দুঃসহ নৈশ-যাপনের সমাপ্তি……।

আমি গাছ থেকে নেমে বন্ধুদের ডেকে নিলাম। টোপ্ অক্ষত অবস্থায় ওখানেই বাঁধা রইলো। বন্ধুদের সান্ত্বনা দিলাম, ধৈর্য ধরুন—বাঘ ঠিক আসবে। সমস্ত দিনটা ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিয়ে কেটে গেল, বিকালে আবার সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। বন্ধুরা অনেক রকম ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে মাচায় উঠলেন, এবং আমার চিন্তান্বিত মুখখানার দিকে তাকিয়ে স-কৌতুকে বললেন—আজ ঠিক বাঘ আসবে।

আমি মনে মনে বললাম—তথাস্তু! আমার নির্দিষ্ট গাছে উঠে বসলাম। মহিষের বাচ্চাটার জন্য মাহাতোর দুশ্চিন্তা ছিল—দু'জন সঙ্গী নিয়ে নদীর অপর পাড়ের একটা গাছে চড়লো শিকার দেখবার জন্য। আবার যথারীতি সূর্য অস্ত গেল। সেই অন্ধকার আর এক-ঘেঁয়েমী চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। মনে হলো, এ-রাতও নিষ্ফল হবে। জন্তু-জানোয়ারের চলা-ফেরার কোন শব্দ পেলাম না। হঠাৎ মনে হলো, 'বাঘের ডাক্' ডাকলে কেমন হয়? সঙ্গে সঙ্গে কিছু না ভেবেই জোরে নিশ্বাস নিয়ে মুখের দু'পাশে হাতের আড়াল দিয়ে সজোরে একটা হাঁক্ পাঠিয়ে দিলাম।

আমি বাঘের ডাক ডাকতে পারি না, তবুও ডাকটা নিস্তব্ধ জঙ্গলে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর এল না, তখন আর একবার ডাক্‌লাম। এ'বার ফল্ হলো। অনেক দূর থেকে বাঘের ডাক ভেসে এল, এবং পরের ডাকগুলো খুব জোর হতে লাগলো। মনে হলো—বাঘ শিকারীদের মাচার কাছ থেকেই ডাকছে। অনেকক্ষণ ডাকটা শোনার পর বুঝতে পারলাম—এটা বাঘের মিলন আহ্বান নয়, বাঘটা যেন বিরক্ত হয়ে বিকৃত-স্বরে ন'ক্কারজনক প্রতিবাদ জানাচ্ছে! আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। শিকারীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বন্ধুরা নতুন শিকারী, এই পরিস্থিতিতে মাচায় বসে কী করছেন ভেবে আকুল হয়ে পড়লাম

আমার বাঘের ডাক নকল করা খুবই অন্যায় হয়েছে ভেবে নিজেকে দায়ী

করলাম এবং অস্থির হয়ে পড়লাম। অথচ সেই সময় আমি গাছ থেকে নামতেও পারছিলাম না। এদিকে বাঘটা ঘন ঘন ক্রুদ্ধ গর্জনে জঙ্গল কাঁপিয়ে তুলতে লাগলো।

প্রায় ভোর হয়ে আসছে, এমন সময় ব্যাঘ্রের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার থেমে গেল; এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সু-মধুর বাজনা বেজে উঠলো সেই ভয়াবহ মুহূর্তে বরিবাদীর জঙ্গলে! সানাই, সেতার, বেহালা, বাঁশি, পাখোয়াজ, তবলা-তরঙ্গ ও আরও কত কি বাদ্যযন্ত্রের মিলিত শব্দের অপূর্ব হুল্লোড়। হ্যাঁ—মিউজিক্!

ওপারে পালামৌ, আর এপারে বরিবাদীর জঙ্গল। আমি অবাক হয়ে গেলাম, ভেবে পেলাম না—কি শুনছি! জঙ্গলে অনেক অলৌকিক্ ঘটনা ঘটে—আমার মনে হলো, আমি সেই রকম কোন ভৌতিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি! পরিষ্কার শুনলাম—হিন্দি ফিল্মের আহ্লাদে গান,—"আ যা, আ-যা পিয়া,—ঘরে আ-যা!"

আমার অবস্থা তখন কহতব্য নয়, হঠাৎ 'আ যা পিয়া' থেমে গিয়ে বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জনে বনভূমি আবার কেঁপে উঠলো। তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, আমি রাইফেলটা টেনে নিয়ে আকাশে দুম্ দুম্ করে দুটো ফায়ার করেই গাছ থেকে নেমে পড়লাম ও মাচা লক্ষ্য করে দৌড় দিলাম। আমায় দেখে বন্ধুরা মাচা থেকে নেমে এলেন, লক্ষ্য করলাম—মাচার এক-পাশ ঝুলে পড়েছে। বললাম—ব্যাপার কী? বন্ধুরা কপালে হাত ঠেকিয়ে দুর্ভাগ্যের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। দেখলাম, রাত জাগার কালিমা আর গভীর নৈরাশ্যের দাগ ওদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। ওরা ঘটনার বিবরণ শোনাতে লাগলেন, এবার ওদের জবানীতেই শুনুন—

শিরিণবাবু বলতে শুরু করলেন, সিওর্ গেম—উফ্! অল্পের জন্য সব মাটি হয়ে গেল। অনেক রাত অবধি একভাবে বসে থাকার দরুণ পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে, চোখ জ্বালা করছে—বাঘের আশা নেই দেখে যেই একটু চোখ বুঁজেছি, অমনি বাঘের ডাক ভেসে এল। তখন চাঁদ উঠেছে, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বাঘ দেখতে পেলাম না। বিপুলবাবু রাইফেল তুলে মোষের বাচ্চাটাকে তাক করে আছেন। বললুম—করছেন কী? ও-টা যে মোষের বাচ্চা! বিপুল-বাবু ফিস্-ফিস্ করে বললেন—জানি, বাঘ ওকে চাপা দিলেই ট্রিগার চেপে দেব। বাঘ খোঁজার মত অযথা পরিশ্রমে বিপুলবাবুর অনাসক্তি দেখে ওর সিদ্ধান্তের উপরই ওকে ছেড়ে দিয়ে আমি বাঘের তল্লাস করতে লাগলাম। কিন্তু শত চেষ্টা করেও বাঘের টিকিটিরও সন্ধান পেলাম না, তখন আমাদের পূর্ব

পরিকল্পনার কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল—যার ফলে বাঘটাকে আমরা কাছে টেনে আনতে পারি।

বড়দাকে বলতেই ব্যাগ থেকে টেপ্ রেকর্ডার বার করে বোতাম টিপে দিলেন, অমনি আমাদের টেপের-বাঘও ডাকতে লাগলো। জঙ্গলের বাঘটা হু'বার ডেকেই থেমে গেল, কিন্তু টেপের বাঘ একটানা ডেকেই চললো! সে যে কী থ্রীল্ বলে বোঝান যাবে না। প্রত্যেক মুহূর্তে ভাবছি—এই বুঝি বাঘ এসে গেল। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে, বন্দুকের নলে নলে ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে—কতক্ষণ যে এইভাবে কেটেছে কোন হুঁস্ নেই।

এমন সময়ই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। বিপুলবাবুর ফায়ারিং লাইনে পাশের কেঁদ গাছটার একটা ডাল এসে পড়েছিল। ডালটাকে ভাঙতে গিয়েই এই বিপত্তি, বিপুলবাবু পড়ে গেলেন। মাচার দড়ি ছিঁড়ে যেতেই তিনি ঝুলে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে বড়দা ধরে না ফেললে বিপুলবাবু 'প'পাত ধরণীতলে'। কুমারসাহেব ও আমি আর একটা হাত ধরে টানাটানি করছি. কিন্তু সেই বিপুল লাশ টেনে তোলা আমাদের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য। আমরা তিনজনে তখন প্রাণপণে টেনে তোলবার চেষ্টা করছিলাম বিপুলবাবুকে। এমন সময় টেপে ধরে রাখা বাঘের ডাক শেষ হয়ে গেল, এর পরেই টেপ্ করা ছিল বড়দার প্রিয় গান—'আ যা পিয়া, ঘরে আ যা'……। সর্বাঙ্গ বেয়ে দর্-দর্ করে ঘাম ঝ'রছে, বিপুলবাবুকে তুলতেও পারছি না—ছাড়তেও পারছি না। অথচ এদিকে শুরু হয়ে গেল—'আ যা পিয়া আ যা, ঘরে আযা'। সর্বনাশের মাথায় পা!

বাঘের ডাকের সাড়া না দিয়ে টেপ্-রেকর্ডে বেজে চললো, আ যা পিয়ার গান। ওঃ, গানের সে কী গিট্কিরি……! মোষের বাচ্চাকে পর্যন্ত একপাক টুইষ্ট করিয়ে নিল। ওঃ মাইরি, কী ব্যাড্-লাক্…! একেই বলে শিকারীর ভাগ্য, আ যা পিয়া বলে ডাক্‌লে কি আর বনের বাঘ আসে…! শিরিণবাবু আফ্‌সোষে মিডিয়ম সাইজের ভুঁড়ির হু'পাশে মৃদু মৃদু চাপড় দিতে লাগলেন, আর মুখে হায় হায় করতে লাগলেন অবশ্য সকলেই, কেবল বিপুলবাবু রইলেন মাথা হেঁট করে। ওর রাইফেলের নাইট্-সাইট্-টা হারিয়ে গিয়েছিল।

মাহাতো বললে, বাঘটা যখন ভয়ঙ্কর গর্জন করছিল ঠিক তখনই বরিবাদীর বাঘটা—যে-টা ওর গরু ধরেছিল, তীর বেগে ওদের গাছতলা দিয়ে পালামৌয়ের জঙ্গলে পালিয়ে গেল। মাহাতোর সঙ্গীরা মোটা বক্‌শিসের আশা ছেড়ে মন খারাপ করে রইলো। আমি শিরিণবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাঘের ডাক কোথায় রেকর্ড করলেন? শিরিণবাবু উত্তর দিলেন—চিড়িয়াখানায়। বাঘের

ডাকের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম মশাই—আমার কপাল মন্দ, বাঘগুলো একবারও ডাকলো না। কিন্তু—মশাই, সিংহটা থাকতে পারেনি, হাজার হোক পশুরাজ তো! খাবার দেওয়ার বহর দেখেই রাগে ঘৃণায় বন্দী পশুরাজ অহঙ্কারজনক প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, সেই গর্জনটাই টেপ্ করে রেখেছিলাম।

আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না, খুব সিরিয়াস্‌লী এই শিকার অভিযান পরিচালনা করছিলাম। গতরাত্রের ঘটনার আবর্তে তখনও আমি সুস্থ নই, আমার নার্ভের চঞ্চলতা তখনও স্থির হয়নি··· ।

রাতের নিস্তব্ধ জঙ্গলে এতটুকু শব্দ নেই—বাতাস নেই। ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় বনের দীর্ঘ ভূতুড়ে ছায়া ঘন-অন্ধকারে অসহায় মোষের বাচ্চা দড়ি টান্-টান্ করে আর্ত ভীত-চকিত দৃষ্টি বিস্ফোরিত করেছিল অরণ্যের ভয়াবহ মুহূর্তের······! আর আমি? হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ওঠা-নামার শব্দ স্তব্ধ করে দিয়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে সেই ভয়ানক মুহূর্তের কাল গুণছিলাম—এহেন সময়ে বনভূমি সচকিত ধরে বেজে উঠেছিল মিউজিক! আর—তার সঙ্গে হিন্দী ফিল্মের আহ্লাদে গান।

ওই দুর্লভ পরিবেশে একবার কল্পনা করে নিন—বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে ফিল্মের 'পিয়া' নয়, জঙ্গলের দুরন্ত বাঘ। আর শিকারী আপন বুকের স্পন্দন্ পর্যন্ত থামিয়ে দিয়ে, রুদ্ধশ্বাসে মুহূর্ত গুণছে। ঠিক সেই মুহূর্তটিতে মাচা থেকে ভেসে এল টেপ্ এ-ধরে রাখা হিন্দী ফিল্মের হিট্ করা গান, 'আ যা পিয়া আ যা,—ঘরে আ-যা······!

আমার দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে গেল, চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যেতে লাগলো শিরিণবাবুরা, মিলিয়ে গেল বরিবাদীর বনজঙ্গল—মাহাতো আর তার টোপ্। ফুটে উঠলো অনেকদিন আগে দেখা চিড়িয়াখানার সেই বুড়ো সিংহটার মুখ! পিঙ্গল চোখের কোণে পিচুটী, কেশর ছড়ান মস্ত মাথাটা থাবার উপর রেখে পিট্-পিট্ করে চেয়ে থাকতো! কেবল খাবার দেওয়ার সময়ই বেচারার আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগতো, আর ঘৃণায় বিকৃত আর্তনাদ করে উঠতো···! চিড়িয়াখানার বাইরে থেকেও সে ডাক শোনা যেত, এমন গম্ভীর আর দূরপ্রসারী···! অনেকদিন হলো সে ডাক থেমে গেছে······! বরিবাদীর ভয়াবহ জঙ্গলে বাঘের মিলন ডাক ডাকতে গিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশে প্রত্যুত্তর পেলাম আফ্রিকান্-লায়নের······।

নর্দান-রেঞ্জে বাইসন শিকার

উড়িষ্যার ঢে'ন্‌কানল্‌ জেলার সাব-ডিভিসন টাউন—আঙ্গুল। আঙ্গুলের ফরেষ্ট অফিস বাঁ-দিকে আর শিকারের স্বর্গভূমি টিকের পাড়ার পথ ডানদিকে রেখে সোজা পুব-মুখো যে রাস্তাটা গভীর বন ও পাহাড়গুলোর মধ্য দিয়ে কখনো উঁচু আর কখনো নীচু হয়ে সর্পিল রেখায় ঝর্ণাগুলো পার হয়ে গেছে—তার চল্লিশ মাইলের শেষে নাকৃচি গ্রাম। উত্তরে—পাহাড়ের পর পাহাড় মাথা উঁচু করে আছে, নর্দান রেঞ্জ ; দক্ষিণে—রামপুর রেঞ্জ। পাহাড়তলীর দু'পাশের গ্রামগুলি পেরিয়ে গেলেই চোখে পড়বে পুরু খড়ে-ছাওয়া অপূর্ব এক ডাক্‌বাংলো। পাহাড়গুলোতে প্রতিহত হয়ে দামাল্‌ বাতাস বাঁধানো কুয়োতলা আর আমবাগানের ছায়ায় গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনগুলোকে স্নিগ্ধ, মনোরম করে তোলে। দুপুরের সেই অবসরে নেমে আসে কাঠবেড়ালীরা খাবারের সন্ধানে, কুয়োতলা আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুঁড়িগুলোর আড়ালে লুকোচুরি খেলতে খেলতে হঠাৎ থমকে থেমে যায়, তারপর বুকের কাছে সামনের পা দুটো জড়ো করে মুখ উঁচু করে দেখে—তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে কি না। পর-মুহূর্তেই দেখবেন চঞ্চলী গাছের গুঁড়িতে হেঁট মুণ্ড হয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ডাকছে, —কীট্‌-কীট্‌…।

অজস্র আমগাছে ঘেরা আট-দশ বিঘা জমির উপর বাংলোটির অবস্থিতি। গাছগুলো এত পুরনো, যে দু'হাত দিয়েও এক একটার বেড় পাওয়া যায় না। আম বাগানের স্নিগ্ধ ছায়ায় অসংখ্য পাখি এসে বসে। ওদের বিভিন্ন কণ্ঠের সুরে যে ঐক্যতান ওঠে, তার কোন শ্রোতা নেই। টুক্‌টুক করে খসে পড়ে পাকা আম। ঘুঘু ডাকা সেই অলস নিস্তব্ধ দুপুর তখন অপূর্ব হয়ে ওঠে।

সেই শান্ত—নিস্তব্ধ পরিবেশে যখন কালবৈশাখী অকস্মাৎ এসে হানা দেয়, সব ওলোট্‌-পালট্‌ হয়ে যায়, তখন,—আকাশে কে যেন কালি গুলে দেয় নিমেষের মধ্যে। দূরের পাহাড়গুলো হয়ে আসে আবছা, বিদ্যুৎ লকলকিয়ে ফালা-ফালা করে দেয় আকাশের কালো বুক, তখন গুম্‌-গুম্‌ শব্দ করে ধেয়ে আসে উন্মত্ত ঝড়—পাগলা হাতির মত শুঁড় উঁচু করে বন-বাদাড় ভেঙ্গে তছনছ করে।

মড়-মড় করে গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে, ভয়ার্ত পাখিরা গাছের ডালে শক্ত করে নখ বসিয়ে দোল খেতে খেতে বাতাস কাটায়। ঝড়ের বেগে যখন ডানা খুলে যায়, তখন শূন্যে ভেসে উঠে তীরের বেগে উড়ে যায় দূরের পাহাড়ের দিকে। টুপ্‌-টুপ্‌ করে ঝ'রে পড়ে রাশি রাশি পাকা আম, ধুলো আর শুকনো পাতা আথালি-পাতালী করে। সেই ধুলি-ঝড়ের মধ্যে গ্রামের ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ী আর যুবতীরা এক অবর্ণনীয় আনন্দে ছুটে ছুটে আম কুড়োয়। কালবৈশাখী

ওদের বেসামাল করে দেয়। বুকের আঁচল সামলাতে গিয়ে পায়ে কাপড় জড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে কৌতুকে এ-ওর ঘাড়ে। কালবৈশাখী ওদের রক্তে মাতন্ জাগায়, তখন ফোকলা দাঁত বার করে বুড়োবুড়ির দল শিশুর মত হেসে ওঠে। ছোট ছেলেমেয়েরা সেই ফাঁকে ডালা ভরিয়ে ফেলে, আর আনন্দে হাততালি দিয়ে উপভোগ করে হঠাৎ আসা কালবৈশাখীর অপরিসীম দুরন্তপনা!

এ-হেন কালবৈশাখী যেমন হঠাৎ আসে—তেমনি হঠাৎই চলে যায়। ধীরে ধীরে প্রকৃতি শান্ত হয়—আবার বাতাস বয় তির-তির করে। আবার দেখা দেয় সূর্য, সোনালী আলোয় পাহাড়ের মাথায় ভেসে বেড়ায় তুলোর মত হাল্কা সাদা সাদা মেঘ। তখন ডাক-বাংলোর খোলা বারান্দায় আরামচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে যদি দু'চারটে ছারপোকার কামড় সহ্য করতে পারেন, তা'-হলে সোজা চোখ তুলে দেখবেন—আপনার সামনে ঘন অরণ্যময় ঢেউখেলানো পাহাড়ের শ্রেণী, অপরূপ ভঙ্গিমায় আকাশের বুকে এক রমণীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছে। মনে হবে আড়াই-হাজার ফুট উঁচু ঘন সবুজ কার্পেটে মোড়া অপূর্ব এক স্থির তরঙ্গ, কী উন্মাদনায় আকাশের বুকে মুখ রেখে যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। পাঁচ-ছয় মাইল দূর থেকে আপনার দৃষ্টি ওর অভ্যন্তরে পৌঁছবে না। যদি পৌঁছত—তাহলে দেখতে পেতেন, সেই আসন্ন সন্ধ্যায় ঘন সবুজ কার্পেটের আড়ালে রয়েছে—রুক্ষ-পাথর, ভাঙ্গাচোরা ভয়াবহ গহ্বর আর র‍্যাভাইনস্। বুনো লতাপাতা আর আমগাছের ঝোপঝাড়ে ভরা কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম অরণ্য...!

দেখতে পেতেন—বন্য ব'রাহ দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, ভালুক বুনো আম খেতে খেতে অবাধ্য বাচ্চাদের ধমকাচ্ছে, আর কোট্‌রা হরিণ অনেকদূরে দাঁড়িয়ে কান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিঃশব্দে বনের শব্দ শুনছে! ভালুক চলে গেলে ও চুপি চুপি এগিয়ে যাবে আমের আঁটীগুলোকে চাটবে বলে। হাতির পাল শব্দ করে বনের ডালপালা ভেঙ্গে খাচ্ছে। হাতি যখন হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন বদ্-হজমের দরুণ ওদের পেটের ভিতর থেকে একরকম অদ্ভুত শব্দ বের হয়—খল্-খল্, গুরুর-গুরুর।

দিনের শেষে গোধূলির আলো ছড়িয়ে যখন অস্তগামী সূর্য পশ্চিম পাহাড়ের আড়ালে নেমে যায়, তখন তাল তাল অন্ধকার নিঃশব্দে এসে জমা হয় ঝোপ-ঝাড়গুলোর তলায়। ক্রমে আঁধারের যবনিকায় সব একাকার হয়ে যায়—বন-প্রান্তর। আকাশের সেল্যুলয়েডে পাহাড়ের অস্পষ্ট মাথাগুলো বিচিত্র রূপ

ধারণ করে। মৌন অরণ্য তখন রাত্রিকে স্বাগত জানায়। সেই অখণ্ড নৈশ স্তব্ধতা ব্যাহত করে অকস্মাৎ ভেসে আসে হাতির বৃংহতির শব্দ—হাতির পাল চরতে আসে পাহাড়তলীর সমভূমিতে। বাংলোয় বসেই হাতির দূরাগত ডাক শোনা যায়—ঝর্ণার জলে স্নান করবার সময় বাচ্চাদের শাসন করে শাঁখের মত তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে—ক্যাঁক-কোঁ-ও-ও! সেই তীক্ষ্ণ আওয়াজ পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে নৈশ-স্তব্ধতা খান্-খান্ করে দেয়। তারপর—আবার সব স্তব্ধ, শব্দহীন অন্ধকার অরণ্য··! সেই ঘোর অন্ধকার আড়াল করে চুপি চুপি ভালুক আসে বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে আম খেতে। ভালুক বে-পরোয়া প্রাণী, নিঃশব্দে হাঁটতে পারে না। তবুও তার আনা-গোনা বোঝা যায় না, যতক্ষণ না সে খাদ্যের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দেয় সঙ্গিনী বা বাচ্চাদের ধমক দিয়ে।

সেই সময় বনের পথে নিঃশব্দে শিকারের সন্ধানে ফেরে বাঘ। ঝর্ণার ধারের সঙ্কীর্ণ শুঁড়ি-পথ ধরে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায় ধূর্ত চিতাবাঘ আর ক্ষুধার্ত হায়না। বাঁশের বনে শুনবেন—কে যেন চাবুক মারছে, সপাং-সপাং করে। ভুলেও নাক্ বাড়াবেন না, নিশুতীরাত্রে ভয়াবহ গহন্ অরণ্যকে কেউ-ই তখন শাসন করছে না। বাইসন বাঁশের কচি-শিষ টেনে নিয়ে যখন ছেড়ে দেয় তখনই ওই রকম শব্দ হয়—সাঁই-সাঁই...

পাহাড়ের গভীর অঞ্চলে বাইসনের বাস, ঘন অরণ্য ছাড়া ওরা থাকে না। বাইসনের এক একটা পালের সংখ্যা আট-দশটা, কখনও বা তার উর্ধ্বে। এরা অত্যন্ত ভীরু (shy), গভীর রাত্রি না হলে সচরাচর ফাঁকায় আসে না। সন্দেহ প্রবণতা খুবই প্রকট। উত্তেজিত বাইসনের আক্রমণ অত্যন্ত ভয়াবহ। বাইসনের পাল হঠাৎ আক্রমণ করে বসলে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া একরকম অসম্ভব। অত্যন্ত ভারী প্রায় পৌনে এক টন ওজনের একটা ক্রুদ্ধ জানোয়ারকে থামান সম্ভব নয়।

একঠিয়া (single) বাইসন অর্থাৎ দলত্যাগী বাইসন সব সময়ই চড়া মেজাজে থাকে, দলের প্রাধান্য হারিয়ে জখমের যন্ত্রণা নিয়ে দুনিয়ার সব কিছুকেই সে শত্রু মনে করে। অনাবশ্যক আক্রমণ করতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করে না। চক্রধরপুরে একবার বাইসনে মারা একটা মড়ি দেখেছিলাম, মাংস-পিণ্ডটা যে একটা মানুষের দেহ প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে শুনলাম —দেহটা গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে মাটির সঙ্গে পিষে ফেলেছিল, তারপর খুর দিয়ে সেটাকে খণ্ড খণ্ড করেও তার রাগ পড়েনি। শেষে শিংয়ের ঝট্কা মেরে

খণ্ডগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। পরের দিন সকালে মৃতের আত্মীয়রা খণ্ডগুলোকে কুড়িয়ে একটা কাপড় বেঁধে লাঠির মাথায় ঝুলিয়ে স্টেশনে এনেছিল। মৃতলোকটির অপরাধ—বাইসন ওর ক্ষেত নষ্ট করেছিল বলে সে একটা লাঠি নিয়ে বাইসনটাকে তাড়াতে গিয়েছিল। এ থেকেই বুঝতে পারছেন, বাইসন রেগে গেলে কী সাংঘাতিক কাণ্ড করতে পারে।

রামপুর রেঞ্জে—ব্রাহ্মণী গ্রামে গত বছর একটা বাইসন ক্ষেত নষ্ট করছিল, অনেক তাড়া দেওয়া সত্ত্বেও বাইসনটা ক্ষেত থেকে নড়লো না। তখন একজন সাহসী গ্রামবাসী তীর-ধনুক নিয়ে মাচায় উঠলো। ফসল রক্ষা করবার জন্য ওরা ক্ষেতের মাঝখানে বাঁশের তৈরী টোঙ্গের উপর পোয়াল বিছিয়ে পাতার আড়ালে বসে পাহারা দেয়। গ্রামবাসীটি ওই-রকম একটা টোঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে একদিন সন্ধ্যার পর বেশ সাহসের সঙ্গে উঠে বসলো। ওর-বন্ধু-বান্ধবরা তখন অত্যাচারী বাইসনটা কিভাবে তীর বিদ্ধ হয়ে মারা পড়ে—দেখবার জন্য অদম্য কৌতূহল আর দমবন্ধ করা উত্তেজনা নিয়ে গ্রামের ধারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। ক্রমে রাত্রি গভীর হলো—তখনও বাইসন আসেনি, এমন সময় ক্ষেতের ধার থেকে একটা হরিণ হঠাৎ ডাকতে ডাকতে ফিরে গেল। ভীত হরিণটার কর্কশ ডাকটা থামতেই সমস্ত অঞ্চলটা আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়লো, এরপর আর কোন সাড়া-শব্দ নেই।

দীর্ঘ সময় কেটে গেল, হঠাৎ ওরা দেখলো—বাইসনটা নিঃশব্দে কখন ক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়েছে। বিশাল কালো চেহারা অন্ধকারে যেন একটা চলমান্ পাহাড় বলে মনে হচ্ছিল। গ্রামবাসীরা রুদ্ধশ্বাসে দেখলো, বাইসন ফসল খেতে খেতে ক্রমেই টোঙ্গটার কাছে এগিয়ে আসছে। বাইসনটা তখন এত কাছে এসে পড়েছে, তবুও তীরবিদ্ধ হচ্ছে না কেন—ভেবে ওরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। আর ঠিক তখনই শুনলো টোঙ্গের উপর থেকে শব্দ হলো:—সাঁই-ই, তীরটা ছিলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাইসনের বিশাল কালো মাংসল দেহে তীরবিদ্ধ হওয়ার শব্দও হলো—চ'প্। তারপর যে ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা হলো—তা ওদের কল্পনার অতীত!

বাইসনটা বিদ্যুতের বেগে ঘুরে দাঁড়াল, আর ক্রুদ্ধ হয়ে মুখ তুলে দেখতে পেল আততায়ীকে টোঙ্গের উপর। তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কায় সোলার মত ভেঙ্গে পড়লো মাচা। হতবুদ্ধি গ্রামবাসীটি তখন ক্ষেতে ফসলের উপর লাফিয়ে পড়লো। তারপর সেই ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ জানোয়ারটার হাত থেকে বাঁচবার জন্য যেই ধড়ফড় করে উঠবার চেষ্টা করেছে, ঠিক তখনই মূহূর্তের মধ্যে ক্রুদ্ধ বাইসন

ছুটে এসে ওর বুকে আমূল শিং ঢুকিয়ে দিয়ে ঠেসে ধরলো মাটিতে। তারপর রক্তের ঘ্রাণ পেয়ে গাঁ-গাঁ করে শব্দ করে উঠলো ভয়ঙ্কর আক্রোশে, খুর দিয়ে মাটি আঁচড়ে তছনছ করে ফেললো জায়গাটা। মানুষটার আর্তনাদ থেমে যেতেই ক্ষিপ্ত বাইসনটা শিংয়ের এক ঝট্‌কায় শূন্যে ছুঁড়ে দিল দেহটাকে, তারপর দেহটা মাটি স্পর্শ-করতে না-করতেই তীব্রবেগে ধেয়ে গেল সেইদিকে। গুঁতিয়ে গুতিয়ে আর ধারাল খুর দিয়ে খণ্ড-খণ্ড করে দেহটার যখন আর বিশেষ কিছু রইলো না, মাটির সঙ্গে মিশে একটা মাংসের চাব্‌ড়ায় পরিণত হলো—তখনই তার রাগের উপশম হলো।

বাইসনটা এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল, যে তার নাকের ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দটা বহুদূর থেকেও শোনা গিয়েছিল। সেই বীভৎস কাণ্ড দেখে আতঙ্কিত সঙ্গীরা কোন-গতিকে দৌড়ে ঘরে খিল তুলে দিয়েছিল। পরের দিন সকালে যথেষ্ট রোদ্দুর না ওঠা পর্যন্ত ওরা ঘর থেকে বের হতে সাহস করেনি। ১৯৭০ সালের এপ্রিলের এই সন্ধ্যার সেই খুনী বাইসনটাকে মাটিতে দাঁড়িয়ে মাত্র ছয় হাত দূর থেকে দেখেছি—তীরের বাইরের অংশটা ভেঙ্গে গেছে, আর—ক্ষতস্থান থেকে রস গড়াচ্ছে। এরপর খুনীটা আরও একটা মানুষকে হত্যা করে। বন-বিভাগ থেকে তখনও তাকে 'রোগ' (rogue) বলে ঘোষণা করা হয়নি বলেই—বাইসনটা আমার উদ্যত রাইফেলের সামনে থেকে ফিরে যেতে পেরেছিল। বাইসনের ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি যথেষ্ট তীক্ষ্ণ, বিশাল দেহ নিয়েও সে যথেষ্ট চট্‌পটে। তিন চার হাত চওড়া খানাখন্দ অনায়াসে লাফিয়ে পার হয়ে যায় এবং বাইসনের অসম্ভব গতিবেগও অবিশ্বাস্য। একটা গুরুতর আহত বাইসনকে অনুসরণ করে আমি ও আমার শিকারী-সঙ্গী শিবানী পাল চৌধুরী ও শ্রীঅনিল দাস ষোল মাইল পথ পাহাড় ডিঙ্গিয়েও দেখেছি আহত বাইসন একই বেগে হেঁটেছে, এবং তার চলায় কোন খুঁত ছিল না। দু'পাশের গাছ-পালায় প্রচুর রক্তের চিহ্ন রেখে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলেছে তার গোপন আশ্রয়ে। একটা ৪৫০।৪০০ আর একটা ৪২৩ বোরের হার্ড-নোজ গুলি হজম করেও আহত বাইসন এতটা দুর্গম পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে, চড়াই-উৎরাই কোথাও তার পা এতটুকু হড়কায়নি। এর থেকেই অনুমান করা যায় তার জীবনীশক্তি কী প্রচণ্ড……!

বাইসনটাকে অনুসরণ করতে করতে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলাম, যেখানে আহত বাইসনটার সঙ্গে একটা বড় দলের সাক্ষাৎ হয়েছিল, এবং মস্ত দলটা কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে ছোটাছুটি ক'রে অনেক গাছপালা ভেঙ্গে

জায়গাটা প্রায় চ'ষে ফেলেছিল। এই উত্তেজনার কারণ অনুমান করলাম—গুলি খাওয়া বাইসনটা ওদের মধ্যে এসে দাঁড়াতেই ওর দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। বিচরণরত বাইসনের দলটা হঠাৎ ওকে দেখে মুখ তুলে গন্ধ শুঁকলো। রক্তের ঘ্রাণ পেয়েই ওরা মুহূর্তের মধ্যে ভীষণ ক্ষেপে উঠলো। এবং অদৃশ্য শত্রুর মোকাবিলা করবার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে শিং বাগিয়ে ধরলো। যখন কোন বিপদ হ'লো না—তখন ওরা ধরে নিল, রক্তাক্ত বাইসনটা ওদের বিপদ ডেকে আনতে পারে। তখন বাচ্চাদের নিরপত্তার আশঙ্কা করে আর আত্মরক্ষার সহজাত প্রেরণায়, অশুভ 'একঠিয়া' প্রাণীটাকে ওদের শত্রু মনে করে চারধার থেকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করে বসলো। তারপর গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ওকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে এল অন্যদিকে।

লক্ষ্য করলাম, বাইসনটা অনেকটা রক্ত ঝরিয়ে সেখান থেকেই পথ পরিবর্তন করেছে, এবং অসংলগ্নভাবে হেঁটেছে দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। হাতি বা ভালুক আহত হ'লে সঙ্গী তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বিচরণরত দলটা ওকে এমনভাবে তাড়িয়ে দেওয়ার কারণ—বোধহয় ও 'একঠিয়া' বলে। যাই হোক—বাইসনটাকে অনুসরণ করা ত্যাগ করে দিনের শেষে আমরা ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলাম। কল্পনা করলাম—কখনও হয়তো নিঃসঙ্গ আহত বাইসনটা হাঁটছে, সে হাঁটা যে কখন আর কোথায় শেষ হবে জানি না…। একটা আহত চলমান বাইসনকে দুর্গম পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে মাইলের পর মাইল অনুসরণ করা হয়তো কোন রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়……!

উড়িষ্যার জঙ্গলে দীর্ঘদিন হাতি ও বাইসন শিকার বন্ধ থাকার ফলে এদের অত্যাচার যেমন বেড়েছে, তেমনি সংখ্যা-বৃদ্ধিও হয়েছে প্রচুর। হাতি ও বাইসনের পাল ক্ষেতে নেমে ফসল নষ্ট করায় গরীব চাষীদের প্রায় অনাহারে দিন কাটাতে হয়। তাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বনবিভাগ যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও প্রতিকারের কোন সু-ব্যবস্থা হয়নি। সুখের কথা—বাইসন শিকারের অনুমতি তখন দেওয়া শুরু হয়েছিল। নর্দান-রেঞ্জে এই রকম অত্যাচারের অনেক রিপোর্ট জমা হওয়ায় বাইসন শিকারের একটা পারমিট আমরা সংগ্রহ করলাম। আমার এ অঞ্চলে আসার ঠিক একমাস পূর্বে একটা পুরুষ-বাইসন হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে একটা ট্রাক আক্রমণ করে উল্টে দেয়, আর একটা ভালুক রাস্তা পার হ'তে গিয়ে জীপের ধাক্কায় মারা পড়ে। মরবার সময় ভালুকটা এমন প্রচণ্ড জোরে ঠেলে ওঠে—যার ফলে জীপ

গাড়িটাও উল্টে যায়, কোন লোক অবশ্য এতে হতাহত হয়নি।

এই রকম চমকপ্রদ ঘটনাগুলো ঘটবার ঠিক একমাস পরে আমরা এসে ক্যাম্প ফেললাম। জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জঙ্গল দেখবার জন্য। সঙ্গে ছিল শিকারী অনিল দাস আর ঘনশ্যাম। ভদ্রেশ্বর গাড়ী চালাচ্ছিল, জঙ্গলে গাড়ী চালাতে আর শিকারের জন্ত ধাওয়া করতে ওর জুড়ী নেই। আমি ৪২৩ বোরের রাইফেলটা কোলের উপর রেখে জঙ্গল দেখছিলাম, এমন সময় জীপ হঠাৎ ব্রেক্ কষে থেমে গেল। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার পূর্বেই ঘনশ্যাম হাত বাড়িয়ে বার' বোরের বন্দুকটা এগিয়ে দিয়ে বললো—সাপ! তাড়াতাড়ি নেমে দেখি আমার বাঁ-দিকের জঙ্গলে একটা সাপ চলে যাচ্ছে। সাপটা আমাদের সাড়া পেয়ে তখন দ্রুতবেগে বনের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করছিল। আমি সাপটার পিছু নিলাম।

প্রায় কুড়ি-হাত যাওয়ার পরই দ্রুতগতি সাপটাকে মারবার মত একটা সুযোগ এল, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলাম। সাপটার মাথাটা তখন ঝোপের আড়ালে। ল্যাজ থেকে তিন-হাত উপরে আর মাথা থেকে দু'হাত নীচে গুলিটা লাগতেই সাপটা দু-টুকরো হয়ে গেল! কাটা অংশটা স্প্রীং-য়ের মত লাফিয়ে একটা ডালে জড়িয়ে গেল। সাপটা তখন বাকি দু'হাত দেহ নিয়ে অতিকষ্টে টেনে-হিঁচড়ে এগিয়ে চললো। বন্দুকে মাত্র একটি গুলি ভরা ছিল, আর আমার পকেটে রাইফেলের গুলি—অগত্যা একটা শুক্‌নো ডাল খুঁজছিলাম সাপটাকে পিটিয়ে খতম্ করবো বলে। এমন সময় ঘনশ্যাম এল। ওর হাতে বন্দুকটা দিয়ে একটা ছোট ডাল কুড়িয়ে যেই সাপটার মাথা লক্ষ করে মারতে যাব, অমনি সাপটা আমার দিকে ঘুরে ফোঁস্ করে দাঁড়াল—সেই কাটা দেহটার মাত্র এক বিঘতের উপর ভ'র্ করে। ঘনশ্যাম ততক্ষণে বন্দুকে একটা চার নম্বর ভ'রে নিয়েছে.—সাপটার উদ্যত ফণাটা এক গুলিতে চূর্ণ করে ফেললো।

সাপটা মারা পড়তেই আমরা নিঃশব্দে হাত মেলালাম। যাঁরা জিম করবেটের কাহিনী পড়েছেন—তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, জঙ্গলে প্রবেশ করে প্রথমেই একটা সাপ মারতে পারার অর্থ কী! সাপটা ছিল লম্বায় পাঁচ-হাত, মেটে রং-য়ের উপর সবুজ-ছিট এবং তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট মোটা। আমার ধারণা হলো—সাপটা পাহাড়ী বোড়া সাপ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি সামান্য বলে নিশ্চয় করে বলতে পারলাম না—সাপটা কি জাতের।

বাইসনের ট্র্যাক খুঁজতে খুঁজতে প্রায়ই হাতি ও বাঘের পায়ের ছাপ চোখে পড়তো। দুটো প্রাণীই বর্তমান সংরক্ষিত। হাতির নাদি-তে লাথি মেরে দেখেছি, তখনও ধোঁয়া বের হচ্ছে। এ অঞ্চলে একটা বদ মেজাজের পুরুষ-হাতি ছিল, মানুষ-জন এমন কী কাঠ কাটার লরী দেখলেও তেড়ে আসতো। সে হাতিটাও মারা পড়েছে সেই একমাস আগে,—যখন বাইসন আর ভালুকের ঘটনাগুলো ঘটেছিল। হাতিটার দাঁত দুটো ফরেষ্ট অফিসে দেখেছিলাম। ওদের ধারণা কোন বিষক্রিয়ায় হাতিটা মারা পড়েছে। আর না হয় হাতির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গ্রামবাসীরা বিষমাখা তীর মেরেছে! গ্রামবাসীরা বলে—শঙ্খচূড়ে কেটেছে। উড়িষ্যার জঙ্গলে দশ-বারো হাত থেকে ষোল হাত লম্বা শঙ্খচূড় সাপ দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের থাকাকালীন সময়ে বামুরের জঙ্গলে এক ফরেষ্ট গার্ড শঙ্খচূড়ের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসে একটা ঝর্ণার ধারে দাঁড়ায়। হাতের টাঙ্গিটা নামিয়ে রেখে ঝর্ণার জলে পা ডুবিয়ে যেই আঁচলা ভরে জল খেতে যাবে, অমনি একটা দেড় ফুট ব্যাসের ময়াল তার পা দু'টোকে জড়িয়ে ধরলো। আতঙ্কিত ফরেষ্ট-গার্ড জলের মধ্যে গড়িয়ে পড়তেই ক্ষুধার্ত ময়ালটা মস্ত হাঁ করে ওকে গিলতে এল। ফরেষ্ট-গার্ড সাহসে ভর করে ময়ালের হাঁ-করা মস্ত মাথা বাঁ-হাত দিয়ে ধরবার চেষ্টা করলো, আর ডান হাত দিয়ে সাপটার প্যাঁচ্ খোলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বিদ্যুৎগতি সাপটার কাছে পরিশ্রান্ত ফরেষ্ট-গার্ড ক্রমশই হেরে যাচ্ছিল। এমন সময় ময়ালটা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বাঁ-হাতটা প্রচণ্ড কামড়ে ধরলো।

মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে হতবুদ্ধি ফরেষ্ট-গার্ড ওর ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করলো। তখন ওর ভিতর থেকে গর্জন করে বেরিয়ে এল অতীতের সেই আদিম বুনো মানুষটা, যে যন্ত্র সভ্যতার ভয়ে শতাব্দীর অন্ধকার আড়ালে মুখ লুকিয়েছিল। চীৎকার করে ফেটে পড়লো ময়ালটার ঘাড়ের উপর। তারপর সেই ডাল-ভাত খাওয়া দুর্বল দাঁত বসিয়ে দিল ময়ালের গলায়। ফরেষ্ট-গার্ড আমাদের বলেছিল—বিশ্বাস করুন বাবু, আমি জানি-না—কি তখন করেছি···!

তারপর শুরু হয়ে গেল সাপে-মানুষে জীবন-মরণের এক বিচিত্র লড়াই! সাপটা হয়তো সেই পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরী ছিল না—কিম্বা এতকালের ঘুমিয়ে পড়া সেই আদিম বুনো-মানুষটার হঠাৎ সাড়া পেয়ে কামড় শিথিল করলো; তারপর সেই ভয়ঙ্কর 'অজগর পাশ' খুলে তড়িৎগতিতে জলের তলায় আত্মগোপন করলো। ফরেষ্ট-গার্ড টল্‌তে টল্‌তে উঠে এল পথে, তারপর

টাঙ্গিটা কুড়িয়ে নিয়ে মরীয়া হয়ে ছুটতে লাগলো বস্তি-বাড়ি লক্ষ্য করে। ওর হাত থেকে তখন ঝর্ ঝর্ করে রক্ত ঝরে পড়ছিল। সন্ধ্যার সময় হাতে ঔষধ্ লাগিয়ে আমাদের এই ঘটনা শোনাল সে। শিবাণী আকৃষ্ট হয়ে সেই ময়ালটাকে মারবার জন্য কয়েকদিন ঘোরা-ফেরা করলো, কিন্তু ময়ালটাকে আর দেখা গেল না।

এ হেন ভয়াবহ জঙ্গলে বাইসনের সন্ধানে আমরা দিনের পর দিন ঘুরতে লাগলাম। দুর্গম বন-জঙ্গল ভেঙ্গে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গিয়েও বাইসনের হদিস্ করতে পারলাম না। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে আকাশ থেকে তখন যেন অগ্নি-বৃষ্টি হচ্ছে, পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে—উত্তপ্ত রাইফেল খালি হাতে ধরা যায় না—এমনি সময়ে বাইসনের খবর এল। পাহাড়ের প্রাচীর বেষ্টিত ঘন-উপত্যকায় অসংখ্য বাঁশের ঝাড়, স্যাঁৎ-স্যাঁতে মাটি, লম্বা ঘাসের জঙ্গলের কোল্ ঘেঁসে বয়ে গেছে এক পাহাড়ী ঝর্ণা—এই হলো বাইসনের বিচরণ-ক্ষেত্র। আমি স্থান নির্বাচন করে এমন এক জায়গায় মাচা বাঁধলাম—যেখান থেকে বাইসনের পুরো দলটাকেই বাতাস কাটিয়ে কোণাকুণিভাবে পাওয়া যাবে। খুব একটা ফাঁকা জায়গায় বস্‌তে সাহস হলো না, কেননা—বাইসনের ঘ্রাণ-শক্তি প্রখর। তাছাড়া—আহত হলে আক্রমণ করতে পারে, কিম্বা দলটা পালাবার সময় ধাক্কা দিয়ে গাছও ফেলে দিতে পারে। আমি দেখেছি—বাইসনের ধাক্কায় মাঝারি আকারের শালের গুঁড়ি সোলার মত ভেঙ্গে পড়তে।

বাইসনের সন্ধানে যে আদিবাসীটা আমার সঙ্গে ছিল, তার নাম কোমারু। এই বন-পাহাড় আর নিজেকে নিয়ে ও যে ধারণা গ'ড়ে তুলেছে—সেখানে ও সুখী, তা-না হ'লে রঙ্গ-তামাশা আর শিকার নিয়ে এমন মেতে থাকতে পারতো না। কোমারু খুরের অস্পষ্ট চিহ্নগুলো দেখে বললে—বাইসনের যে ঝাঁকটা এখানে চরতে আসে তাদের সংখ্যা ছয় কিম্বা সাত। পুরুষ বাইসনটা যথেষ্ট বড় এবং সব থেকে ছোটটা একটা বড় বাছুরের মত।

সন্ধ্যা ছ'টায় আমি, শিবাণী আর কোমারু মাচায় এসে বসলাম। গভীর জঙ্গল—নিস্তব্ধ প্রহর। আসন্ন সন্ধ্যায় পাহাড়ের গাছপালা ক্রমশই আবছা অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগলো। আঁধারের যবনিকা নেমে আসার পূর্বে একটা হনুমান পাহাড়ের মাথা থেকে হঠাৎ ডাকতে শুরু করলো। বার কয়েক ডেকে হনুমানটা থেমে যেতেই একটা কোট্‌রা হরিণ সেই ডাকটা তুলে নিল, তারপর সেই ভয়ার্ত ডাকটা ডাকতে-ডাকতে দূরে মিলিয়ে গেল। অনুমান করলাম—চিতাবাঘ বেরিয়েছে। চিতাটা কোনদিকে আছে বুঝবার পূর্বেই অন্ধকার এত

ঘন হয়ে উঠলো, যে মাচার তলাটা পর্যন্ত আর ভাল করে দেখা গেল না। নীরব, নিস্পন্দ। একটা সূচ পড়লেও বুঝি তখন শোনা যায়—এমনি মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করছিল তখন সেই অন্ধকার উপত্যকায়।

সেই নৈশ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে অকস্মাৎ ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক শুরু হলো। সেই একটানা সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যখন অন্যান্য পোকা-মাকড়রাও সাড়া দিতে আরম্ভ করলো, তখন আকাশের সব তারা ফুটে উঠেছে। পাহাড়ী অঞ্চলে রাত্রি গভীর হ'লে তারার আলো বেশী উজ্জ্বল বলে মনে হয়। উপত্যকার অনেকটাই তখন পরিষ্কার দেখা যেতে লাগলো। এমন কী ঘাসের বনে ঝর্ণাটাও আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। আমরা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম—কতক্ষণে বাইসন আসবে। এমন সময় মাচার খুব নিকট থেকে একটা ভালুক আচম্‌কা ডেকে উঠলো। ওর বাচ্চাটা অনেক পিছনে পড়েছিল। প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে আমাদের মাচার পাশ দিয়ে উঠে গেল গ্রামের দিকে পাকা আম খাওয়ার লোভে। মন্দিরের পাশে ডুমুর গাছেও আমি ওদের নখের আঁচড় দেখেছি।

আবার সেই স্তব্ধতা, কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। শুধু ঝিঁ-ঝিঁ পোকারা একটানা ডেকে চলেছে। একটা হায়না আমাদের সামনে দিয়ে চোরের মত পা টিপে টিপে চলে গেল। ওর নখের অস্পষ্ট খস্‌-খস্‌ আওয়াজটা মিলিয়ে যেতেই পাহাড়ের মাথায় গাছ-পালার একটা শব্দ শুনে আমরা চম্‌কে উঠলাম। ওই একবারই শুধু শুনলাম, তারপর সব চুপচাপ—আর কোন শব্দ নেই। উত্তেজনা তখন চরমে উঠেছে। আমরা রুদ্ধশ্বাসে মিনিট গুণতে লাগলাম, আর প্রার্থনা করতে লাগলাম—বাইসন যেন আমাদের গায়ের গন্ধ না পায়। প্রায় তিরিশ পর্যন্ত গোনা শেষ হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়লো একটা বিশাল কালো ছায়া দাঁড়িয়ে আছে! এত নিঃশব্দে অতবড় জন্তুটা এসে দাঁড়াল—যে আমরা ধারণা করতে পারলাম না, কখন আর কোনদিক থেকে এল সেই বিরাট ছায়ামূর্তি……!

কয়েকটা মুহূর্ত অভিভূতের মত দেখলাম, পাথরের মত স্তব্ধ, অনড় হয়ে থাকা সেই বিশাল মূর্তি। তারপর ধীরে ধীরে রাইফেল তুলে নিয়ে কোমারুকে ইঙ্গিত করলাম—আলো ফেল্‌বার জন্য।

হাওড়ার বিখ্যাত শিকারী শিবাণীর জন্যই এই বাইসন শিকারের ব্যবস্থা করেছিলাম। শিবাণী ৪৫০।৪০০ বোরের দো-নলা রাইফেলটা সেট্‌ করতেই কোমরু বাইসনের চোখে আলো ফেললো। আলো পড়তেই বিশাল এক-

জোড়া শিং তুলে বাইসন মাচার দিকে তাকাল। চোখদুটো উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করছিল। ঘোর বাদামী রং-য়ের উপর আলোটা যেন পিছলে যেতে লাগলো। অপরূপ সে দৃশ্য—শ্বাস রোধ করে উপভোগ করবার মত। মুহূর্তের মধ্যে ৪৫০।৪০০-এর চারশো গ্রেনের একটা সলিড্ গুলি প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে ছুটে গেল বাইসনটার কাঁধ লক্ষ্য করে। পরক্ষণেই আমার ৪২৩-র একটা গুলি ওর দেহে আরও একটা ক্ষতের সৃষ্টি করলো। একজোড়া রাইফেলের গুলি খেয়ে প্রকাণ্ড বাইসনটা হুড়মুড় করে চার পায়ে ভেঙ্গে পড়লো, আর উঠতে পারলো না। তারপর পা দুটো টান-টান করে স্থির হয়ে পড়ে রইলো। গলা দিয়ে ঘড়-ঘড়ে আওয়াজ বের হতেই ভস্ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। দুটো কান-ফাটানো আওয়াজ হওয়ার পর সমস্ত জঙ্গল আবার নীরব নিস্পন্দ হয়ে গেল। আমরা প্রবল উত্তেজনা দমন করে নিঃশব্দে বসে তখন বাইসনটার মৃত্যু দেখছিলাম……!

শিবাণী আরও একটা গুলি করতে চেয়েছিল, আমি নিষেধ করলাম—ওর শেষ হয়ে আসছে। যদি উঠবার চেষ্টা করে, তা'হলে গুলি করো। এই দুর্মূল্যের দিনে গুলির অপচয়ের কথা চিন্তা না করলেই বোধহয় ভাল হোত, অন্ততঃ পরবর্তী দুর্ভোগ থেকে রেহাই পাওয়া যেত। আমরা উভয়েই রাইফেল নামিয়ে রাখলাম। এমন সময় আমাদের অবাক করে দিয়ে মৃতের মত পড়ে থাকা বাইসনটা ধড়ফড় করে উঠে মুহূর্তের মধ্যে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটে গেল—যে আমরা রাইফেল তোলবারও সময় পেলাম না। তারপর ভোর হওয়া মাত্রই আহত বাইসনের রক্তের চিহ্ন ধরে অনুসরণ করতে করতে মাইলের পর মাইল হেঁটেছি, সাতটা পাহাড় অতিক্রম করেছি, প্রতিমূহূর্তে আহত বাইসনের প্রচণ্ড আক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথ ধরে হেঁটেছি, রুদ্ধশ্বাসে মিনিটের পর মিনিট রাইফেল উঁচিয়ে অপেক্ষা করেছি। তারপর সেই কাঠ-ফাটা রৌদ্রে ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপেক্ষা করে ভয়ঙ্কর চড়াই-উৎরাই ভাঙ্গার কথা কাহিনীর শুরুতেই বলেছি…।

একটা নিশ্চিত শিকার হারিয়ে নৈরাশ্যবোধ করতে লাগলাম। গুলির মায়া না করলেই হোত—একটা ৪৫০।৪০০, আর একটা ৪২৩ বাইসনের পক্ষে কী যথেষ্ট নয়! তবুও শিবাণীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা বোধ হলো। ওর প্রথম বাইসন শিকার এমন এক তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে শুরু হলো—যা কোনদিন ও ভুলতে পারবে না। মনে মনে ঠিক করলাম—যেমন করেই হোক, ওর জন্য আর একটা বাইসনের ট্র্যাক্ সন্ধান করবো। অক্লান্ত

পরিশ্রমে বাইসনের নতুন ট্র্যাকের সন্ধান করে মাচা বেঁধে ফেললাম। তারপর শিবাণী ও কোমারুকে তুলে নিয়ে নির্দেশ দিলাম—যতক্ষণ না বাইসন নিঃশেষে মরে যাচ্ছে, ততক্ষণ গুলি চালিও। ওর সাহায্যের জন্য পঞ্চাশ গজ দূরের একটা গাছে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে রাত গভীর হলো। সেই একই অন্ধকার আর মৃত্যুর স্তব্ধতা। সেই নৈশ স্তব্ধতা ব্যাহত করছিল শুধু একটা রাতচরা পাখি। পাখিটা ডানা ঝট্‌পট্‌ করে পাহাড়ের কোলে উড়ে-উড়ে পোকা ধরছিল। এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। নীরব নিস্পন্দ বনে অকস্মাৎ অনেকদূর থেকে হাতির ডাক ভেসে এল। এরপর মাত্র দশ মিনিট চুপ করে বসে ছিলাম, এমন সময় রাইফেলের শব্দ হলো—গুড়ুম। পর মুহূর্তেই শুনলাম, জঙ্গল তোলপাড় করে বনবাদাড় ভেঙ্গে বাইসনের পাল পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে। পরক্ষণেই আবার রাইফেলের আওয়াজ হলো, এই দ্বিতীয় আওয়াজটা শুনেই আমি নিশ্চিন্ত হলাম। প্রতি এক-মিনিট অন্তর পাঁচবার রাইফেলের শব্দ হলো!

পাঁচটা আওয়াজ শুনে সেই নৈশ অন্ধকারে আমি ও ভদ্রেশ্বর প্রাণ ভ'রে হেসেছি আর উপভোগ করেছি—ওর ব্যথা কোথায়! প্রত্যেকটি আওয়াজ শুনে তখন আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারতাম—কেন এই আওয়াজটা হলো। আমি আমার সমস্ত শিকারী মন নিয়ে সেই মুহূর্তে তরুণ শিকারীকে সমর্থন করেছিলাম। কোন শিকার আজ আর ওকে ধোঁকা দিতে পারবে না, ওর সার্থকতায় আমার মন কাণায় কাণায় ভ'রে উঠলো—তখন খুশী মনে একটা সিগারেট ধরালাম।

তারপর এক সময় শিবাণীর সাড়া পেয়ে গাছ থেকে নেমে এলাম। ওকে মাচা থেকে নামিয়ে বাইসনের কাছে নিয়ে গেলাম। মস্ত বাইসন, বিশাল এক-জোড়া শিং-এর মুকুট পরে সর্বাঙ্গে গুলি-বিদ্ধ হয়ে শুয়ে আছে। রাত্রির সেই শেষ-প্রহরে আমাদের ফিরে আসতে দেখেই বাংলোর সঙ্গীরা আনন্দে স্বাগত জানালো। তারপর চা আর হাসিতে কখন যে ভোর হয়ে গেল—কেউ জানলো না।

প্রথম গুলিটা ঘাড়ে আর দ্বিতীয় গুলিটা শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো বাইসন—সেই প্রথমবারের মত। আগের বাইসনটা পালিয়ে যাওয়ায় শিবাণীর যত না আফশোষ হয়েছিল, তার চেয়েও বেশী আশাভঙ্গ হয়েছিল কোমারুর। আমাদের রাইফেলগুলোর উপর তেমন আর আস্থাও ছিল না, তাই ও মতলব করেছিল—সমস্ত গুলি ফুটিয়ে বাইসনকে নিঃশেষে

শেষ করা।

এতক্ষণে বাইসনটা মারা গেল। শিং-এর গার্থ (girth) বারো ইঞ্চি, লম্বা একুশ ইঞ্চি করে—জোড়ায় বিয়াল্লিশ ইঞ্চি, টিপ্-টু-টিপ্ আট ইঞ্চি। মোট—পঞ্চাশ ইঞ্চি। রং ঘোর বাদামী।

শিকারের স্বর্গভূমি থেকে আমাদের বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা গ্রামবাসীরা এসে খবর দিল, বামুরের গ্রামে একজন স্ত্রীলোককে ভালুক আক্রমণ করেছে। স্ত্রীলোকটি জঙ্গল থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে ফিরে আসছিল, এমন সময় ভালুকটার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। স্ত্রীলোকটি ভয়ে চিৎকার করতে করতে কাঠের বোঝা ফেলে প্রাণপণে দৌড়তে লাগলো গ্রামের দিকে। যখন গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তখন ফিরে দেখে ভালুকটা ঠিক তার পিছনে মাত্র কয়েক হাত দূরে মাটির উপর দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। বিনা-প্ররোচনায় ভালুকটা স্ত্রীলোকটিকে আক্রমণ করে বসলো। পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ের পাশে কামড় বসিয়ে দিল, তারপর থাবা দিয়ে স্তন, বুক ও পেট চিরে ফেললো।

স্ত্রীলোকটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে, গ্রামের ধারে যারা ওর আর্তনাদ শুনে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে এই দৃশ্য দেখছিল—হৈ-চৈ করে তখনকার মত ভালুকটাকে তাড়িয়ে দিল। এরপর গ্রামের চা'ওলা (চায়ের দোকানের মালিক) পায়খানা যাওয়ার সময় পথে হঠাৎ ভালুকটার খপ্পরে পড়ে যায়। বেচারী লোটা ফেলে দৌড়ে একটা পুকুরে ঝাঁপিয়ে না পড়লে, ভালুকের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পূর্বের স্ত্রীলোকটির মত হাসপাতালে পড়ে থাকতো। ভালুকটার এই বদ্-মেজাজের কারণ কী জানতে চাইলে ওরা বললো—ফরেষ্ট-গার্ড জানে। তখন ফরেষ্ট-গার্ডকে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠালাম। ইত্যবসরে দেখি ফরেষ্ট-গার্ড নিজেই দৌড়ে আসছে। ভালুকের তাড়া খেয়ে বেচারা এত জোরে দৌড়েছে যে দম ফুরিয়ে কথা ব'লার শক্তিটুকুও তখন নেই। কোন গতিকে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো—ভালুকটা মারুণ আজ্ঞা!

আমার ধারণা হয়েছিল—ভালুকটাকে কেউ তীর মেরেছে, অথবা গুলি করে জখম করে দিয়েছে—কারণ খুব জোরে সে দৌড়তে পারতো না। পরে জেনেছিলাম—ওর বদ্-মেজাজের কারণ অন্য। ফরেষ্ট-গার্ড ওর বদ্-মেজাজের একটা ঘটনা শোনাল। একদিন গভীর রাত্রে পিছনের আমবাগানে ভালুকের ঝগড়া শুনে ফরেষ্ট-গার্ড জানালা খুলে দেখে—বামুরের গুণ্ডা ভালুকটা চমৎকার একটা সঙ্গিনী জুটিয়েছে। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে সঙ্গিনী সেই

মুহূর্তে ওকে বরদাস্ত করতে পারছিল না। ফলে গুণ্ডা ভালুকটা ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড চিৎকার করে ওদের ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। বিরক্ত সঙ্গিনী তীব্র আওয়াজ করে এমন প্রচণ্ড জোরে আঁচড়ে কামড়ে দিল—যে পুরুষ ভালুকটা পরিত্রাহী চিৎকার করতে করতে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। সেই থেকে নিঃসঙ্গ ভালুকটার মেজাজ যেন সব সময়ই সপ্তমে চ'ড়ে ছিল। মানুষজন দেখলেই অকারণে তাড়া করে আসে, বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের ···।

ভালুকটাকে মারা দরকার—চিন্তা করে আমরা জীপ নিয়ে বের হ'লাম। রাত্রি তখন আটটা। ঘণ্টা দুই ঘোরা-ফেরা করেও ভালুকটার দেখা পাওয়া গেল না। তখন ঠিক করলাম পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় পায়ে হেঁটে ভালুকটার সন্ধান করবো। এই ভেবে ফেরার সময়, গ্রামের ধারে একটা ফাঁকা চাষের ক্ষেতে হঠাৎ দেখা গেল ভালুকটা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের জীপ থেকে দূরত্ব মাত্র কুড়ি হাত। ভালুকটার চোখে গাড়ীর তীব্র আলো পড়তেই মুখ সরিয়ে নিল, তারপর মস্ত রোমশ শরীরটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। মাটি কামড়ে ঠিক চিতাবাঘের মত গুড়ি মেরে আক্রমণের ভঙ্গিতে অগ্রসর হতে লাগলো—আর চোখের কোণ দিয়ে পিট্ পিট্ করে শয়তানি দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো, এ আপদ্ আবার কোথেকে এল···!

ভালুকটার এই অদ্ভুত আচরণ দেখে আমি রাইফেল তুলে নিলাম, আর শিবাণীকে সতর্ক করে দিলাম—নিশ্চয় হয়ে গুলি করতে। ভালুকটা তেড়ে আসতে পারে, ওর মেজাজ ক্রমশই চ'ড়ে যাচ্ছিল—এমন সময় শিবাণী ওকে গুলি করলো। একটা নিখুঁত গুলি লাগতেই অতবড় ভালুকটা নিঃশব্দে ম্যালেরিয়া রুগীর মত থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে গজরাতে লাগলো, তারপর ওর নাক-মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত বের হতে হতে শেষ হয়ে গেল। সকালে ভালুকটার চামড়া ছাড়াবার সময় মেপে দেখলাম পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, নখ অল্প-অল্প ক্ষয়ে গেছে, পিঠে কতকগুলো পুরণো ক্ষতের চিহ্ন। ওর বদ্-মেজাজের কারণও সেই সময় আবিষ্কার করা গেল, ক্রুদ্ধ সঙ্গিনীর তীক্ষ্ণ ন'খরাঘাতে ওর পুরুষ অঙ্গের হাড়টা সাংঘাতিকভাবে জখম হয়ে ঝুলে পড়েছিল।

ভালুকটা মারার পরের দিন ৪২৩ বোরের রাইফেলটা ঘাড়ে নিয়ে পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা চিহ্ন দেখে থেমে গেলাম। একটা বাইসন বিচরণ করতে করতে সেই জায়গায় এসে রোজ শুয়ে বিশ্রাম করে। চিহ্নটা খুবই স্পষ্ট

আর নতুন। বাইসনটাকে মারার মতলব করে কতকগুলো শুকনো ডাল জোগাড় করে বসবার জায়গা ঠিক করে ফেললাম। তারপর সন্ধ্যার সময় কোমারুকে সঙ্গে নিয়ে মাচায় উঠে পড়লাম। আমার দুর্ভাগ্য সেই সময় হঠাৎ বাতাস ঘুরে গেল। বাতাসের গতির যদি পরিবর্তন না হয়, তা'হলে বাইসন আসবে না—অনর্থক রাত জাগাই সার হবে। শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখবার আশায় অপেক্ষাই করতে লাগলাম। অন্ধকার জঙ্গল, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই—এমন সময় অনেকদূর থেকে একটা চিতাবাঘের ডাক শোনা গেল। নতুন কিছু আর ঘটলো না, সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি…।

রাত গভীর হ'তে চললো, তখনও পর্যন্ত বাইসনের খবর নেই। আসবে কি আসবে না, তাও বুঝতে পারছিলাম না। এমন সময় পশ্চিমের পাহাড় থেকে তিনটে কালোছায়া নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল। তারার আলোয় পরিষ্কার দেখলাম, দুটো বড় আর একটা ছোট। পুরুষটা একটু তফাতে একাকী দাঁড়িয়ে আছে, মাদীটা বাচ্চা নিয়ে মাচার অত্যন্ত নিকটে দাঁড়িয়ে কান নাড়ছে। আমার সন্দেহ হলো—মাদী বাইসনটা আমার গায়ের গন্ধ পেয়েছে। আমি আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে অত্যন্ত সন্তর্পণে রাইফেলটা তুলে নিয়ে, কোমারুকে ইসারা করলাম দূরে পুরুষ বাইসনটার উপর আলো ফেলতে।

মাদী বাইসনটা প্রায় মাচার তলায় ছিল বলে কোমারু নার্ভাস হয়ে পড়লো। আলো ফেলতে ওর দেরী হচ্ছে দেখে আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। ওর নজর তখন মাচার তলায় মাদীটার উপর। আমি ওকে কনুইয়ের গুঁতো মারলাম, কোমারু তখন আলো ফেললো। আলোটা প্রথমে ডাইনে, তারপরে বাঁয়ে পড়ে পরক্ষণেই পুরুষ বাইসনটার দেহের উপর স্থির হয়ে রইলো। আমি চওড়া সোল্‌ডার-বোণ্‌ লক্ষ্য করে ট্রিগার চেপে দিলাম। বাইসনটা গাঁক্ করে একটা শব্দ করে ঘুরে দাঁড়াতেই ওর হৃৎপিণ্ডে আমার দ্বিতীয় গুলিটা ঢুকে গেল। তৃতীয় গুলিটা চেম্বারে ঠেলতে-ঠেলতে দেখলাম—বাইসনটা তিনপায়ে কয়েক কদম মাত্র গেল, তারপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল। বাইসনটা পড়ে যেতেই একটা ঝোপের আড়াল পড়ায় আর দেখতে পেলাম না।

তখন তৃতীয় গুলিটা লোড করা হয়ে গেছে, আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম—যদি বাইসনটা উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। তখন আমি ধরে নিলাম বাইসনটা মরে গেছে। এতক্ষণ পরে আমার খেয়াল হলো—মাদী বাইসনটা বাচ্চা নিয়ে কোথায় গেল? আলো ঘুরিয়ে চতুর্দিকে দেখলাম, কোথাও তার বা বাচ্চার

চোখ জ্বলে উঠলো না। তখন মাচা থেকে নেমে পড়লাম মরা বাইসনটাকে দেখার জন্যে। এমন সময় দৈবাৎ নজর পড়লো মাদী বাইসনটা ওর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। তখন আর গাছে উঠবার সময় ছিল না, কোমারুর হাত ধরে উল্টো-মুখো দৌড়তে শুরু করলাম।

প্রায় আধ-মাইল ঘুরে রাস্তাটার কাছে ফিরে এলাম। সকালে বাইসনের খোঁজে আসবো ঠিক করে বাংলোর পথে হাঁটা দিলাম। এমন সময় একটা ট্রাক প্রচুর আলো জ্বেলে তীব্রবেগে ছুটে আসছিল। সেই আলোতে আবার দেখলাম, মাদী বাইসনটা নিঃশব্দে অনুসরণ করে পথের ধারে আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। আমি রাইফেল তুলে ধরতেই ট্রাকটা প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে কাছে এসে পড়লো। তখন মাদী বাইসনটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। সেই সুযোগে আমি ও কোমারু দৌড়ে রাস্তাটা পার হয়ে এলাম।

মাদী বাইসনটা আমাদের আক্রমণ করবার জন্য দু-দু'বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দৈব-সহায়ে আমরা তার অতর্কিত আক্রমণ থেকে বেঁচে গেলাম। যদি বাইসনটাকে আমি সময়-মত দেখতে না পেতাম, বা ট্রাক-টা ঠিক সময়ে এসে না পড়তো, তা'হলে সে-রাত্রে আমাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল। এই বাইসনের মাপ আগের মরা বাইসনটারই মত। মোট মাপ—পঞ্চাশ ইঞ্চি, গার্থ এগার ইঞ্চি, রং ঘোর বাদামী।

বাইসন শিকার অত্যন্ত কঠিন, পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে বাইসনের সন্ধান করতে হয়। যথেষ্ট দৈহিক যোগ্যতা আর কষ্টসহিষ্ণু না হলে বাইসন-শিকারী উৎসাহী হওয়া উচিৎ নয়। জীপের স্পট্-লাইটেও পাহাড়ের রাস্তায় বাইসন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ভাল স্মারক সংগ্রহ করতে হলে পায়ে-হাঁটা ছাড়া গতি নেই। প্রচণ্ড সূর্য-তাপে যখন কণ্ঠ তালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, অবসাদে চোখে কালো কালো রিং দেখা হয়—তখন বাইসন-শিকারের নেশা আপনা হতেই কেটে যায়। কয়েক আউন্স ওজনের একটা শিষের টুকরো ওই বিশাল যমদূত সদৃশ অসীম শক্তিধরকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিতে পারবে—এ বিশ্বাস আর থাকে না।

বাইসন অতি অপূর্ব দেখতে, পায়ে সাদা মোজা পরা ঘোর মসৃণ রং—বিশাল চওড়া কাঁধ ও বুক, যেন পাথরে খোদাই করা। কোমর অল্প ছিনে, শিং-য়ের মুকুট পরে পুরুষ বাইসন যখন দৃপ্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়ায় সে রূপ আর ভোলা যায় না। সব অবসাদ, সব ক্লান্তি দূর হয়ে দেখা দেয় এক অনাস্বাদিত বিচিত্র তৃপ্তি……!!

শ্রেষ্ঠ ট্রফি

ছোটনাগপুর অঞ্চলের এক অখ্যাত ষ্টেশনের ততোধিক অখ্যাত এক গণ্ডগ্রাম, নাম—গোঁড়। অরণ্যের কোলে গ্রামখানি ছোট হলে কি হবে, শিকারের মরসুমে শিকারীদের জীপের আনাগোনায় মুখর হয়ে ওঠে গোঁড়ের নির্জন পথ-ঘাট। আর ব্যস্ত হয়ে পড়েন স্থানীয় শিকারী মাধবানন্দ বীটারদের তদ্বির-তদারকে,—চলে শিকারের সন্ধান। গোঁড়ের চেহারা যায় তখন বদলে।

মাধবানন্দ শিকারী, আমার পুরণো বন্ধু। আমরা জঙ্গলের গহনে একসময় অনেকগুলো সুখের দিনে একসঙ্গে কাটিয়েছি। সে সব অতীতের কথা। তখন জঙ্গলের যে রূপ দেখেছিলাম, তা মনের পর্দায় শুধু আঁকা রয়েছে। তেমন জঙ্গল এখন আর দেখি না। সভ্যতা জঙ্গলকে গ্রাস করে আজ অনুশোচনায় বলছে—'দাও, ফিরে দাও সেই অরণ্যানী।' হায় অরণ্য—তোমার মত আমিও আজ জীর্ণ, অবহেলিত। আমাদের সে কাল গিয়েছে। এখন শুধু অক্ষমের স্মৃতি রোমন্থন করা। সেই স্মৃতির পাতায় যারা এখনও ভীড় করে আসে—মাধবানন্দ একটি না-ভোলা নাম। শিকারী মাধবানন্দ আর ঘরোয়া মাধবানন্দ—আমি শিকারী মাধবানন্দকেই চিনি, ঘরোয়া মাধবানন্দ হীরু শিকারীর আপনজন। মাধবানন্দের শেষ অথবা জীবনের 'শ্রেষ্ঠ ট্রফি' নিয়েই এই কাহিনী—আমার বিশ্বাস হয়নি। হীরু শিকারী বুক ঠুকে বলেছিল —শুধু মাধবানন্দ নয়, এ তোমার আমার সব দুর্ধর্ষ শিকারীর অন্দরমহলের গোপন কথা…।

শিকারী মাধবানন্দকে বাদ দিয়ে এ অঞ্চলে শিকার হয় না। তাই গোঁড়ের খেতে না পাওয়া জংলী মানুষ শিকারের মরশুমে মাংসের লোভে মাধবানন্দের সদরে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করে। শিকারের সংগৃহীত মাংস ওরা রৌদ্রে শুকিয়ে সারা বছর ধরে খায়, পেটের আগুন নেভায়। সৌখিন শিকারীরা নিছক জীবহত্যা করেই সন্তুষ্ট, মাংসের লোভ কম। কিন্তু স্থানীয় চোরাই শিকারীরা শুধু মাংসের লোভেই শিকার ক'রে বন উজাড় করে দেয়।

কোথায় কোথায় শিকার জমা হচ্ছে, কোন্ কোন্ ক্ষেতে নিত্য হরিণ সম্বর নামছে—মাধবানন্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর সংগ্রহ করেন। ভালুক, বরা, বাঘ

ও চিতাবাঘের খবর শুনে মিটি মিটি হাসেন মাধবানন্দ। চমক দেওয়ার মত খবর বটে! কিন্তু আধুনিক শিকারীদের মনের শেষ খবর জানা ছিল মাধবানন্দের, তাই হাসেন। এই হাসিটা তাঁর বড়ই বিচিত্র। হরিণ-সম্বরের পর শিকারের আগ্রহটা কেমন যেন ঝিমিয়ে আসে, জীবন সংশয় হতে পারে তেমন শিকারে অগ্রসর হতে মন চায় না। আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে শিকারটা এক-তরপাই হয় বেশী. ফিফ্‌টী-ফিফ্‌টী বিশেষ হয় না। সকলেই কিন্তু আসেন দারুণ বাঘ-শিকারী সেজে। মাধবানন্দ তের'টা বাঘ মারবার পর জেনেছেন—বাঘ মারা কি জিনিষ!

সে বছর বর্ষা শেষ হতে-না-হতেই শরতের মেঘ ভেসে বেড়াতে লাগলো আকাশে, আর উত্তরের বাতাসে এসে গেল হিমের আমেজ। মাধবানন্দের মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক হুইস্‌লিং-টীল উড়ে গেল শিষ দিতে দিতে। পাখীগুলো যেন শীতের দূত। প্রত্যেক বছরেই ওরা আসে, আর কুয়াশা-–ভ'রা সন্ধ্যার আকাশে কাকলী ছড়িয়ে এমন করে মন কেড়ে নিয়ে যায়। মাধবানন্দ মুগ্ধ দৃষ্টি ফেরাতে পারেন না, মনের-মরমে যেন বন্ধনহীন নিরুদ্দেশের এক অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনতে পান—'হেথা নয়, আর কোথা—অন্য কোনখানে'···! হয়তো কোনখানেই নয়, কোথাও নয়—চিরকালের অন্তহীন এক পথ বেয়ে মনের গান গেয়ে যাওয়া!

এমন সময় খবর এল, কুটুম এসেছে। মাধবানন্দের চমক্ ভেঙ্গে গেল। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ফিরতেই গৃহিণী একটা ফর্দ হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—যেমন করে পার জিনিষগুলো যোগাড় করে নিয়ে এস, নইলে মান থাকে না। মাধবানন্দ ভেবে পেলেন না, এই আসন্ন সন্ধ্যায় গৌড়ের মত জায়গায় কি করে কি করবেন, অথচ···! মাধবানন্দ বাঘ শিকারী—৫০০ বোরের কর্ডাইট রাইফেল কাঁধে নিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে গভীর বনে-জঙ্গলে সারা জীবন একা একা ঘুরে বেড়িয়েছেন। লোকে বলে মানুষটার দুটো কল্‌জে। বাঘ মেরে মেরে জীবনের সব ভয় দূর করেছিলেন। দুর্দান্ত শিকারী। 'কিন্তু'······যাক্ গে সেই ঘরোয়া 'কিন্তু'র কথা এখন। অদ্ভুত-কর্মা পুরুষ, ভীরু শিকারী অন্তত তাই বলে!

সেই অসময়ে গৌড়ের মত জংলা জায়গায় আবার একবার অসাধ্য সাধন করে দেখিয়ে দিলেন গৃহিনীকে। তিনি বাঘ-শিকারী—ধৈর্যের খেলায় শিকারীর অসাধ্য কিছু নেই। ঝড়ের বেগে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যোগাড় করে এনে তুলে দিলেন গৃহিনীর হাতে। অভাব রইলো শুধু

মাংসের। হীরু শিকারী কথা দিয়েছে, কাল সকালেই পাওয়া যাবে। বলেছে—তুমি ভেবুনি দাদা, হীরু শিকারী থাকতে মাংসের যোগাড় হবে না এই জঙ্গলের দেশে বাস করেও, সে-কি একটা কথা হলো দাদা! মাধবানন্দের মনে হলো—প্রশংসা পাওয়ার মত কাজ তিনি করেছেন। গৃহিণীর গোল-পানা মুখের দিকে আড়চোখে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে মাথার ঘাম মুছে এক গ্লাস জলই খেয়ে ফেললেন ঢক-ঢক করে। তারপর বিড়ি ধরিয়ে পর পর দুটো লম্বা সোঁ সোঁ টান দিয়ে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বললেন ; এই অসময়ে গোঁড়ের মত জংলা জায়গায়—হেঁ-হেঁ হেঁ—হাসিটাকে হঠাৎ থামাতে হলো। চোখের সামনে তখন একটা স্বপ্ন যেন ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে চাইছে……!

গৃহিনীর ফালতু কথায় তখন কান দেওয়ার অবসর ছিল না। বিড় বিড় করে দ্রুত ফর্দ মেলাতে মেলাতে হঠাৎ এক সময় হাঁপিয়ে চোখ কপালে তুলে আঁৎকে উঠলেন—সেই ঘোর অসময়ে। এ দৃশ্য তার বহু পরিচিত, তবুও কুটুমের উপস্থিতিতে কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। সেই বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে যেন এতটুকু হয়ে গেলেন। তাঁর শিকারী সত্তা কখন কোন ফাঁকে যে আত্মগোপন করেছে বুঝতেই পারলেন না। তখন মনের পর্দায় ধীরে ধীরে তাঁর অবচেতন মন ফুটিয়ে তুললো—একদা দেখা সেই ছবি!

সেই পরিপূর্ণ চোখ, স্থির অচঞ্চল, ব্যঞ্জনাময় গভীর অন্তর্ভেদী জ্বালাময়ী ভয়ঙ্করী দৃষ্টির মোহিনী আকর্ষণ,—স্থির সঙ্কল্পে অতর্কিত আক্রমণের সুনিশ্চিত পূর্বাভাস। তুলনাটা এতই নিখুঁত, যে শিকারী মাধবানন্দের শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। অভ্যাস-বশে মনে মনে হাতড়াতে লাগলেন—আত্মরক্ষার জন্য তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত নির্ভরশীল প্রিয় রাইফেলটাকে। বাঘিনীর চোখে তখন রণ-রঙ্গিণীর ইঙ্গিত! গুরুর নিষেধ—এত কাছ থেকে ফায়ার করা উচিৎ নয়, ভাইট্যাল্-পয়েন্ট পেলেও অবশ্যম্ভাবী চার্জ থেকে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। বিচক্ষণ শিকারী তখন রুদ্ধশ্বাসে অবস্থার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো—লাল-পাথর বসানো নাকছবি পরা নাসিকাগ্রের দু'পাশের ঈষৎ কুঞ্চিত স্ফীত অংশটুকু দু'বার যেন বিজাতীয় ঘৃণায় ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠলো, তৃতীয়বার কাঁপবার মুহূর্তেই প্রচণ্ড রোষে ফেটে পড়লো সেই ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। গৃহিনী হেঁকে উঠলেন, মাংস আননি? খেতে দেব কি! ছি-ছি-ছি, শিকারীর বাড়িতে এসে এক-টুকরো মাংস জুটবে না—বনের হরিণ কি সব শেষ হয়ে গেছে! অহমিকার মাথায় প্রচণ্ড লগুড়াঘাত হলো।

বিহ্বল শিকারীর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো গত ফাল্গুনের কথা। পাতাল-

কোঁড়ের বাঘিনাও বস্তীর ধারে এসে মাংসের জন্য এমনি হুঙ্কার ছাড়তো। বস্তীবাসীরা ভয়ে কাঁপতো, কেউ কেউ ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতো। মাধবানন্দের অজ্ঞাতে হাতখানা কখন বুকে উঠে এসেছিল। সহসা অনুভব করলেন——ধুক-ধুকে স্পন্দনটুকু কখন যেন থেমে গেছে। গলার মধ্যে কি যেন একটা শক্ত হয়ে চেপে রয়েছে, খুক্ খুক্ করে কেশে শুকনো গলাটা পরিষ্কার করতেই হলো। সুন্দরবনের শিকারী 'আর্জান-সর্দার' না-কি বাঘিনীর সামনে পড়ে সমানে পাল্টা হুঙ্কার ছাড়তো। মায়া হলো বেচারার জন্য। বন্দুকটা নিয়ে একবার দেখ না,—বলে মনের উত্তাপ ঢেলে শেষ আল্‌টিমেটাম্ দিয়ে সবেগে আঁচল দুলিয়ে কক্ষান্তরে প্রস্থান করলেন গৃহিনী।

সেই একই দৃশ্য। ধনাইয়ের বাঘিনীও শিকার মুখে তুলে নিয়ে বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তিনি অসহায়ের মত দেখেছিলেন—ডোরা কাটা ভয়ঙ্কর দোদুলামান লেজ ধীরে ধীরে কেমন মিলিয়ে যাচ্ছিল। মাধবানন্দের জানা আছে, এমন নিরালায় বসে চলবে পরম তৃপ্তিতে চর্বিতচর্বণ…।

মাধবানন্দ নিজে হরিণ শিকার করেন না। বন্দুক ও দুটো এল. জি. গুলি হাতে তুলে নিয়েই মনে মনে বললেন, এই তার শেষ হরিণ শিকার। বন্দুকের স্পর্শ যে কি জিনিস—এক শিকারী ছাড়া সে কথা আর কেউ বুঝবেন না। জঙ্গলে প্রবেশ করতেই মাধবানন্দের দেউলিয়া মেজাজটা পাখীর মত হাল্কা হয়ে গেল। একটা বিড়ি ধরিয়ে রহস্যময় নির্মল আকাশটার বুক লক্ষ্য করে একমুখ ধোঁয়া ছুঁড়ে দিলেন, তারপর গুন-গুণিয়ে উঠলেন পাখীর মত। কোথা থেকে এত খুশী হঠাৎ এসে উপ্‌চে পড়তে লাগলো, শিকারী মাধবানন্দ তার হদিস্ জানেন না। বন্দুকে গুলি দুটো ভরে কল্পিত শিকারের উপর নিশানা নিয়ে নিঃশব্দে আকর্ণ বিস্তারে হেসে উঠলেন সেই নির্জন জঙ্গলে—দুরন্ত বাঘ শিকারী মাধবানন্দ।

নখ-দর্পণে চেনা এই জঙ্গল। বনের গভীর অঞ্চলে যেতে যেতে একটা ঝর্ণার ধারে সহসা থমকে দাঁড়ালেন। একটা বিচিত্র বর্ণের পাহাড়ী সাপ জল খাচ্ছিল। পায়ের সাড়া পেয়ে সাপটা মুখ তুলে দেখলো, তারপর লম্বা জিভটা বার করে ঠোঁট পুঁছে সর্-সর্ করে বনের মধ্যে চলে গেল। এমন বাহারে সাপ আর কখনও দেখেননি। ঝর্ণাটা পার হয়ে কাঁকরে-জমিটা পাশে রেখে উঠে পড়লেন বাঁ-দিকের পথটায়, তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার আশ-পাশটা দেখে নিয়ে বড় মহুয়া গাছটার কাছে চলে এলেন। এমন সময়, এক ঝাঁক

টিয়া ডাকতে ডাকতে মহুয়া গাছটার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। মাধবানন্দ পিছনে ফিরে দেখলেন—পশ্চিমের আকাশে ঢ'লে পড়া সূর্য গাছপালার আড়ালে নেমে পড়েছে। দ্রুত অনুসন্ধানে হরিণ চলাচলের একটা পথ খুঁজে বার করে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে পড়লেন। এই সামান্য পরিশ্রমেই মনে হচ্ছিল—বুকে যেন হাঁপ ধরেছে। মাধবানন্দ মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, গত আষাঢ়ে তিনি পঞ্চাশ পার হয়েছেন।

ঘন অন্ধকার আর একটু পরেই নেমে আসবে অরণ্যে। এক পাখীর ডাক্ ছাড়া আর কোন সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো—একটা বন-মোরগ ঠ্যাং তুলে এক পায়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার সঙ্গিনী একপাল ছানা নিয়ে তখনও দিনের শেষ দানা খুঁট্‌তে ব্যস্ত। হঠাৎ কি হলো—মোরগটা ডেকে উঠতেই তার সঙ্গিনী ছানাদের নিয়ে চোখের পল্‌ক ফেলতে না ফেলতেই অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন গর্বিত মোরগটা লম্বা লম্বা পা ফেলে তার অনুসরণ করলো। মাধবানন্দ এর কারণ অনুসন্ধানে চোখ ফেরাতেই দেখতে পেলেন—একটা চিতাবাঘ গোয়েন্দার মত পা টিপে টিপে গা আড়াল দিয়ে সরে পড়েছে। চিতাটা দেখামাত্রই বন্দুক তুললেন, কিন্তু পরক্ষণেই নামিয়ে রাখলেন হরিণের কথা ভেবে।

ধীরে ধীরে বনের রূপ গেল বদলে, ঘোর অন্ধকারে সব একাকার হয়ে গেল। খুট্ খুট্ শব্দ ভেসে আসতে লাগলো, ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকতে লাগলো, আর একটা ভারি সর্-সর্ শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। এমন সময় ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগলো, একটা পঁ্যাচা ঠিক মাথার উপর একটা ডালে বসে কর্কশ স্বরে বার-কয়েক ডেকে সবে চুপ করেছে—কি একটা বড় জন্তু অন্ধকারে দুড়-দাড় শব্দ করে বন-বাদাড় ভেঙ্গে ছুটে গেল। রাতের অরণ্য জেগেছে তখন—মাধবানন্দ কালো চাদরটা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে উবু হয়ে বসেছিলেন, বন্দুকটা তাঁর ডানদিকে মাটিতে লম্বা করে শোয়ান—হাতের নাগালের মধ্যে! এমন সময় অনেকদূর থেকে চিতাটার ডাক শোনা গেল। মাধবানন্দ কান খাড়া করে কি একটা শব্দ শোনবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় বনের অখণ্ড স্তব্ধতা খান্-খান্ করে কর্কশ স্বরে ডেকে উঠলো একটা কোট্‌রা হরিণ। মাধবানন্দ সচকিত হয়ে বন্দুকটার উপর একবার দ্রুত হাত রাখলেন, কিন্তু কোট্‌রাটাকে কোথাও দেখতে পেলেন না। বনের মধ্যে কোট্‌রাটার চলারও কোন শব্দ পেলেন না। পিছনের বড় শিমূল গাছটার মাথা ডিঙ্গিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ায় সমস্ত বনটা যেন তাঁর সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠলো। একটা হরিণ

টাউ-টাউ করে তার সঙ্গিনীকে ডাকছিল, সেই দূরাগত ডাকটা শুনতে শুনতে ভাবলেন—রাত কত হলো!

অকস্মাৎ ভীষণ চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। দৃঢ় আলিঙ্গনে কে যেন তাঁকে পিছন থেকে বেঁধে ফেলেছে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে এতটুকু নড়াচড়া করতে পারলেন না, দারুণ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন—দম্ বন্ধ হয়ে আসছিল। নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে মাধবানন্দ অতিকষ্টে মাথা ঘুরিয়ে সেই ঘোর অন্ধকারে আঁতকে উঠে দেখলেন, এক ভীষণদর্শন কালো রোমশ ভালুক তাঁকে বজ্র পেষণে নিষ্পেষিত করবার চেষ্টা করছে। হাত দুটোও সেই ভীষণ আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে গেছে। মুক্তির আর কোন উপায় নেই, মৃত্যুর শীতল স্পর্শ যেন অনুভব করতে লাগলেন। চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে সব যেন কোন রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে। মাধবানন্দের চেতনা লোপ পেতে লাগলো। ভালুকটার মস্ত হাঁ মাথার উপর ভয়ঙ্কর দাঁত বার করে যেন হাঁপাচ্ছিল, আর মুখ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছিল। ভালুকটা তাঁকে কামড়েছে কি-না সে বোধ তখন তাঁর ছিল না, ভালুকটা মাঝে মাঝে চাপা গর্জন করছিল।

ভালুকের লালায় এত জ্বালা মাধবানন্দের জানা ছিল না, বন্দুকটা তিনি অনেকক্ষণ ধরেই তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু পিস্তল্-গ্রীপ্টা কিছুতেই হাতের মুঠোয় ধরা সম্ভব হচ্ছিল না। বাঁচবার আশায় শেষবারের মত একবার শুধু আকুলি-বিকুলি করে উঠলেন, গুলিভরা বন্দুকটা তখনও হাতের নাগালের বাইরে। এমন সময় ভালুকটা তার কানের কাছে এমন জোরে ডেকে উঠলো, যে তার তুলনা হয় না। মাধবানন্দ সম্বিৎ হারিয়ে ফেললেন—কিছুই আর তখন মনে পড়ছিল না, অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগলেন। জীবনের যখন আর কোন আশা ছিল না, তখনই এগিয়ে এল শিকারীর ভাগ্য!

ভালুকের বিপুল চাপে বন্দুকটা অপ্রত্যাশিতভাবে হাতের মুঠোয় উঠে এল। মাধবানন্দ মুহূর্তের মধ্যে শক্তিটুকু সঞ্চয় করে রিস্টের এক প্রচণ্ড মোচড়ে বন্দুকটা সোজা দাঁড় করিয়ে ফেলে দিলেন কাঁধের উপর। বন্দুকের নলটা আচমকা নাকের ডগায় এসে পড়ায় ক্রুদ্ধ ভালুকটা তাকে গ্রাস করবার মতলবে সজোরে বসাল এক কামড়। আর যায় কোথায়—সেই সুযোগের আশাই তো মাধবানন্দ এতক্ষণ ধরে করছিলেন, মুহূর্তে দুটো ঘোড়াই টিপে দিলেন একসঙ্গে। কানের পাশে জোড়া গুলির আওয়াজ আর ভালুকটার কান-ফাটানো চিৎকারে কালা হয়ে গেলেন, বন্দুকটাও ছিট্কে গেল হাত থেকে।

তারপর আর মনে নেই, জ্ঞান ফিরে আসতে দেখলেন—সেই নির্জন অন্ধকার বনে তিনি পড়ে আছেন একা। ভালুকটা নেই। মাধবানন্দ উঠবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। সর্বাঙ্গে অসম্ভব ব্যথা, পা দুটোও সম্পূর্ণ অসাড়। ক্ষতস্থানগুলো জ্বালা করছিল। দুটো গুলিই সঙ্গে এনেছিলেন, দুটোই ফায়ার হয়ে গেছে। আহত মাধবানন্দ সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় সেই গহন বনের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে পড়ে রইলেন একা। এমন সময় দূর থেকে আলো ও মনুষ্য কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলেন--তাঁর উদ্ধারের জন্যই হয়তো ওরা আসছে।

অনেক ডাকাডাকি অনেক খোঁজা-খুঁজির পর উদ্ধারকারীরা মাধবানন্দকে আবিষ্কার করে টেনে তুললেন। বন্দুকটা তুলে দেখলেন দুটো গুলিই ফায়ার হয়ে গেছে। ক্ষতস্থান বেঁধে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল বাড়িতে। আঘাত এমন কিছু মারাত্মক ছিল না, তবু মাধবানন্দ আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলেন! ফেরার পথে দেখা গিয়েছিল ভালুকটা হাত-পা ছড়িয়ে মরে পড়ে রয়েছে। সেটাকেও তুলে আনা হলো।

রাত্রি গভীর হতে যখন সকলেই প্রস্থান করলেন, তখন পায়ে পায়ে দেখা দিলেন গৃহিণী। এতক্ষণ পরে মাধবানন্দের মনে পড়লো তিনি কেন বনে গিয়েছিলেন। গৃহিনীর চোখে চোখ রেখে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে মনের ডুবুরী নামিয়ে দিলেন সন্তর্পণে, পঞ্চাশ বছরের ঘোলাটে দৃষ্টি তখনও ঝাপসা হয়েছিল—একি দেখলেন মাধবানন্দ! গৃহিণীর থম্‌থমে্ মুখের পানে তাকিয়ে অবাক হওয়ার আর অবধি রইলো না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাঘ-শিকারী জিঁম করবেটও একবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখেছিলেন—আক্রমণ-রত ক্রুদ্ধ বাঘিনীর এক অবিশ্বাস্য দুর্লভ হাসি! বিচিত্র শিকারীর অভিজ্ঞতা! আহত মাধবানন্দ নিজের সন্ধানী দৃষ্টি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়লেন। ক্রুদ্ধ বাঘিনীর জ্বলন্ত দৃষ্টিকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন, এক পলকের জন্যও চোখ সরাননি, কিন্তু আর এক জোড়া চোখ?

বিচিত্র মানব চরিত্র, বিচিত্র এর গতি-প্রকৃতি! যে চোখের সামনে সর্বশক্তি হারিয়ে কি অজ্ঞাত কারণে আজীবন 'কিন্তু' হয়েছিলেন, আর আজ! এই মুহূর্তে সেই বিশাল আয়ত চক্ষু বেয়ে দর্-দর্ করে এ কোন উৎস গড়িয়ে পড়ছে! দুর্লভ এ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে রইলেন মাধবানন্দ। কি এক দুর্দমনীয় লোভে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন, এ যে ধারণাতীত।

ধীরে ধীরে গৃহিনীর মাথায় আল্‌তোভাবে একখানা হাত রাখলেন, যেমন

প্রত্যেকবারেই শিকার করা বাঘিনীর মসৃণ পিঠে আদরের হাতখানা রাখতেন। স্পর্শমাত্র এক অদম্য উচ্ছ্বাসে অভিমানিনী ভেঙ্গে পড়লেন মাধবানন্দের বুকের উপর। অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া দু-কুল উপছিয়া, লোকচক্ষু উপেক্ষা করিয়া, লাজ-লজ্জা ও সরমের তরঙ্গে করতালি দিয়া—ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া অভিমানিনী নারী-হৃদয়ের এক বিচিত্র গোপন দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া—শিকারী মাধবানন্দকে পুলকিত, চমকিত, শিহরিত করিয়া এমন স্তব্ধ করিয়া দিল, যে মাধবানন্দের মনে হলো—ইহজীবনে তাঁর কিছুই জানা হয় নাই! আজীবন শুধু জঙ্গলই ভালবাসিয়াছেন। চিনিয়াছেন শিকারের পশু-পক্ষিদের—যারা তাঁর ধ্যানে-জ্ঞানে দিবা-রাত্রি পরমানন্দে বিচরণ করিত। হৃদয়ের কারবারে যে বে-হিসেবীটুকু আজ ধরা পড়লো, যে মরমী-মনের পরিচয় আজ ধরা দিল—সে মহিমা আজ এতকাল পরে কোথায় কেমন করে এই দেউলিয়া মনে গেঁথে রাখি···! গ্রীষ্মের অসহ্য উত্তাপে হঠাৎ বৃষ্টি আসার মত সেই স্নিগ্ধ—সুরভিত না-ভোলা ক্ষণটুকু নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলেন শিকারী।

অভিজ্ঞতা বলে—অনেক সময় গুলি খেয়ে মৃতের মত পড়ে থাকা বাঘিনী হেঁটে জঙ্গলে ফিরে গেছে, অথবা শিকারীকে হঠাৎ আক্রমণ করে বসেছে। এই 'কিন্তুর' সমস্যা অতিক্রম করা যেন এক দায়! সদুর চোখের জলে ভেজা ট্রিগার টানা সেই প্রিয় আঙ্গুলটা শূন্যে তুলে এক অদ্ভুত আবেশে বলে উঠলেন, জীবনের 'শ্রেষ্ঠ ট্রফি' লাভ করলাম আজ...!

হীরু শিকারীকে আড়ালে ডেকে বলেছিলেন—ভাই হীরু, শুধু বাঘ নয়, জীবনের সব আকাঙ্খার কথা—যতক্ষণ না মর্মস্থান (vital point) স্পর্শ করছো, আঘাত হেনে যেও। শিকারের সেই অমোঘ বিধান—shoot to kill!
